মনোরমার জীবন-চিত্র

প্রথম খণ্ড

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা

ত প্যাম্বন

কলিকাতা-১২

প্রকাশক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ঘোষ
'অধ্যয়ন'
২০/এ, গোবিন্দ সেন লেন
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—ডিসেম্বর ১৯৬০।

মুদ্রক
শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ
সুশীল প্রিণ্টার্স
২, ঈশ্বর মিল বাই লেন
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

'মনোরমার জীবন-চিত্র' গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। পূর্বের মতো এবারেও সমগ্র গ্রন্থ একসঙ্গে প্রকাশিত না হইয়া দুই খণ্ডে বাহির হইতেছে।

কথাটার একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক।

গ্রন্থখানির লেখক স্বনামধন্য মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। 'মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা' আজ একটি বিস্মৃত নাম, কিন্তু এক সময় ছিল যখন এই নামটি কেবল বঙ্গদেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে সুপরিচিত ছিল। মনোরমা ছিলেন তাঁহার সহধর্মিণী—এক অসামান্যা মহীয়সী মহিলা। প্রচলিত অর্থে তিনি শিক্ষিতা ছিলেন না—মনোরঞ্জনের ভাষায় তিনি ছিলেন 'নিগ্রন্থা'। কিন্তু এই নিগ্রন্থা কুলবধূর সঙ্গে অ্যানি বেসান্তের মতো জগদ্বরেণ্যা বিদুষী দার্শনিকও দোভাষীর সাহায্যে পূর্ণ একঘণ্টা-কাল আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলেন। চিত্ত শুদ্ধ এবং দৃষ্টি স্বচ্ছ থাকিলে এক অশিক্ষিতা কুলবালারও ধর্মনিষ্ঠা, নীতিনিষ্ঠা, আদর্শনিষ্ঠা যে কত উচ্চগ্রামে উঠিতে পারে মনোরমার জীবনে তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ রহিয়াছে। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উক্তি করিয়াছিলেন, "একটি কুলবধূ সংসারধর্ম পালন করিয়া নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাট ও অভাবের মধ্যে কেমন করিয়া ধর্মলাভ করিতে পারে, মনোরমা তাহারই দৃষ্টান্ত দেখাইতে আসিয়াছিলেন। পৃথিবীতে কোটিতে কদাচিৎ এইরূপ একটি জন্মে। মনোরমার জীবনদ্বারা লক্ষ লোকের উপকার হইবে।"

মনোরমার দেহাত্যয়ের পর কোনো কোনো সাহিত্যিক মনোরমার জীবনচরিত লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মনোরঞ্জন অন্য কাহাকেও লিখিতে না দিয়া স্বয়ং সে-ভার গ্রহণ করেন। রাজরোষে পতিত হওয়ায় মনোরঞ্জনের কিছুকাল নির্বাসনদণ্ড ভোগ করিতে

হইয়াছিল। এই সময়েই তিনি পত্নীর জীবনচরিত রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। নির্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিলে ১৯১০ সালে জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যরঞ্জনের উদ্যোগে 'মনোরমার জীবন-চিত্র' গ্রন্থের মুদ্রণকার্য আরম্ভ হইল। দৈবনির্বন্ধে অকস্মাৎ সত্যরঞ্জনের জীবনদীপ নিবিয়া গেল। গ্রন্থের এক ফর্মা মাত্র ছাপা হইয়াছিল—পাণ্ডুলিপি প্রেসেই পড়িয়া থাকিল। ধার্মিক পুত্রের অকাল-প্রয়াণে মনোরঞ্জন শোকাভিভূত, ভগ্নস্বাস্থ্য, ভগ্নোদ্যম। বন্ধুবর্গের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তিনি পুস্তক প্রকাশে মনোযোগী হইলেন বটে, কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যেও সম্পূর্ণ গ্রন্থের মুদ্রণ সম্ভব হইল না। আত্মীয়-স্বজনের আগ্রহাতিশয়ে অগত্যা তিনি গ্রন্থের অর্ধাংশ অর্থাৎ প্রথম খণ্ড ১৯১৪ সালে প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় আরও চারি বৎসর পরে ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে। এই খণ্ডের ভূমিকায় লেখক নিবেদন করিতেছেন—

"'নব্যভারত' লিখিয়াছিলেন যে, 'এই পুস্তকের বিশ-হাজার খণ্ড মুদ্রিত করিয়া বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে বিতরণ করা কর্ত্তব্য ছিল।' একথা দ্বারা শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদকমহাশয় মনোরমার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও আমার প্রতি যথেষ্ট অনুকম্পা দেখাইয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞাপালনের উপযুক্ত সুযোগ যদি কখনও উপস্থিত হয়, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।"

লেখকের সে-সুযোগ হয় নাই। মাত্র আটমাসের মধ্যেই, ১৯১৯ সালের ৩১শে মে, তিনি দেহরক্ষা করিলেন। সুতরাং 'মনোরমার জীবন-চিত্র' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ আর হইল না। স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থকারকে জানাইয়াছিলেন, "এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমি উপকার ও শান্তি লাভ করিয়াছি।" মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত লিখিয়াছিলেন, "তোমার পুস্তক একটি অমৃতভাণ্ড।" জমিদার সাহিত্যিক দেবকুমার রায়চৌধুরী মন্তব্য করিয়াছিলেন, "এই বই প্রতি ঘরে একখানি করিয়া থাকা দরকার।" কিন্তু অমৃতভাণ্ড এই বই প্রতি ঘরে পৌঁছিতে পারে নাই।

কিছুকাল যাবৎ শ্রীমান্ যতীন্দ্রকুমার ঘোষ দুষ্প্রাপ্য সদ্‌গ্রন্থ প্রচারে ব্রতী আছেন। ৫৫।৫৬ বৎসর পরে তিনি জীর্ণ কীটদষ্ট দুই খণ্ড বই খুঁজিয়া পাইয়াছেন। লিপিকর-সাহায্যে প্রেস-কপি তৈরি করিয়া ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে রক্ষিত পুস্তকের সঙ্গে মিলাইয়া তিনি এই গ্রন্থ পুনরায় লোকচক্ষে ধরিয়া দিতেছেন। কিন্তু 'মনোরমার জীবন-চিত্র' আবার ছাপা হইতেছে জানিয়া মনোরঞ্জন ও মনোরমার কোনো কোনো অনুরাগী ভক্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া প্রকাশককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাঁহাদের জীবদ্দশায় গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে তো! মানুষের জীবন আজ আছে কাল নাই—বিশেষতঃ যাঁহারা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন তাঁহারা অনেকেই বর্ষীয়ান্। এরূপ অবস্থায় আবার ক্ষোভের সম্মুখীন হইতে না হয় সেইজন্য প্রকাশক পূর্বের মতোই গ্রন্থখানিকে দুই খণ্ডে প্রকাশ করিতেছেন।

পুনর্মুদ্রণ-ব্যাপারে দুই-একটি কথা পাঠকের গোচর করা দরকার। মূলগ্রন্থের ভাষা, বানান ও ছেদচিহ্ন যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে, কোনো প্রকার সংস্কার-সাধনের চেষ্টা হয় নাই—কেবল যেগুলিকে স্পষ্ট ছাপার ভুল বলিয়া ধারণা হইয়াছে, সেইগুলিকেই সংশোধন করা হইয়াছে। একালের পাঠকের কাছে এই বর্ণবিন্যাস ও ছেদ-পদ্ধতি কিছু অদ্ভুত ঠেকিবে, সন্দেহ নাই। লেখকের নিজ রচনা অপরিবর্তিত থাকিলেই তাঁহার রুচি ও বৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে পাঠক নিঃসন্দেহ হইতে পারেন এই কথা মনে রাখিয়া সম্পাদক সবপ্রকার হস্তক্ষেপ হইতে বিরত রহিয়াছেন। তবে ইহাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, কারণ মূলগ্রন্থ-মুদ্রণে একাধিক প্রুফ-সংশোধকের হস্তচিহ্ন সুপ্রকট—ফলে পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই, স্থানে স্থানেই অসঙ্গতি দেখা যায়। তথাপি সেযুগের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির মোটামুটি কিছু পরিচয় ইহাতে পাওয়া যাইবে। ইতি—

কলিকাতা

শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

২৫ ডিসেম্বর ১৯৭২

হইয়াছিল। এই সময়েই তিনি পত্নীর জীবনচরিত রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। নির্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিলে ১৯১০ সালে জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যরঞ্জনের উদ্যোগে 'মনোরমার জীবন-চিত্র' গ্রন্থের মুদ্রণকার্য আরম্ভ হইল। দৈবনির্বন্ধে অকস্মাৎ সত্যরঞ্জনের জীবনদীপ নিবিয়া গেল। গ্রন্থের এক ফর্মা মাত্র ছাপা হইয়াছিল—পাণ্ডুলিপি প্রেসেই পড়িয়া থাকিল। ধার্মিক পুত্রের অকাল-প্রয়াণে মনোরঞ্জন শোকাভিভূত, ভগ্নস্বাস্থ্য, ভগ্নোদ্যম। বন্ধুবর্গের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তিনি পুস্তক প্রকাশে মনোযোগী হইলেন বটে, কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যেও সম্পূর্ণ গ্রন্থের মুদ্রণ সম্ভব হইল না। আত্মীয়-স্বজনের আগ্রহাতিশয়ে অগত্যা তিনি গ্রন্থের অর্ধাংশ অর্থাৎ প্রথম খণ্ড ১৯১৪ সালে প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় আরও চারি বৎসর পরে ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে। এই খণ্ডের ভূমিকায় লেখক নিবেদন করিতেছেন—

"'নব্যভারত' লিখিয়াছিলেন যে, 'এই পুস্তকের বিশ-হাজার খণ্ড মুদ্রিত করিয়া বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে বিতরণ করা কর্ত্তব্য ছিল।' একথা দ্বারা শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদকমহাশয় মনোরমার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও আমার প্রতি যথেষ্ট অনুকম্পা দেখাইয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞাপালনের উপযুক্ত সুযোগ যদি কখনও উপস্থিত হয়, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।"

লেখকের সে-সুযোগ হয় নাই। মাত্র আটমাসের মধ্যেই, ১৯১৯ সালের ৩১শে মে, তিনি দেহরক্ষা করিলেন। সুতরাং 'মনোরমার জীবন-চিত্র' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ আর হইল না। স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থকারকে জানাইয়াছিলেন, "এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমি উপকার ও শান্তি লাভ করিয়াছি।" মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত লিখিয়াছিলেন, "তোমার পুস্তক একটি অমৃতভাণ্ড।" জমিদার সাহিত্যিক দেবকুমার রায়চৌধুরী মন্তব্য করিয়াছিলেন, "এই বই প্রতি ঘরে একখানি করিয়া থাকা দরকার।" কিন্তু অমৃতভাণ্ড এই বই প্রতি ঘরে পৌঁছিতে পারে নাই।

কিছুকাল যাবৎ শ্রীমান্ যতীন্দ্রকুমার ঘোষ দুষ্প্রাপ্য সদ্‌গ্রন্থ প্রচারে ব্রতী আছেন। ৫৫।৫৬ বৎসর পরে তিনি জীর্ণ কীটদষ্ট দুই খণ্ড বই খুঁজিয়া পাইয়াছেন। লিপিকর-সাহায্যে প্রেস-কপি তৈরি করিয়া ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে রক্ষিত পুস্তকের সঙ্গে মিলাইয়া তিনি এই গ্রন্থ পুনরায় লোকচক্ষে ধরিয়া দিতেছেন। কিন্তু 'মনোরমার জীবন-চিত্র' আবার ছাপা হইতেছে জানিয়া মনোরঞ্জন ও মনোরমার কোনো কোনো অনুরাগী ভক্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া প্রকাশককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাঁহাদের জীবদ্দশায় গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে তো! মানুষের জীবন আজ আছে কাল নাই—বিশেষতঃ যাঁহারা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন তাঁহারা অনেকেই বর্ষীয়ান্। এরূপ অবস্থায় আবার ক্ষোভের সম্মুখীন হইতে না হয় সেইজন্য প্রকাশক পূর্বের মতোই গ্রন্থখানিকে দুই খণ্ডে প্রকাশ করিতেছেন।

পুনর্মুদ্রণ-ব্যাপারে দুই-একটি কথা পাঠকের গোচর করা দরকার। মূলগ্রন্থের ভাষা, বানান ও ছেদচিহ্ন যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে, কোনো প্রকার সংস্কার-সাধনের চেষ্টা হয় নাই—কেবল যেগুলিকে স্পষ্ট ছাপার ভুল বলিয়া ধারণা হইয়াছে, সেইগুলিকেই সংশোধন করা হইয়াছে। একালের পাঠকের কাছে এই বর্ণবিন্যাস ও ছেদ-পদ্ধতি কিছু অদ্ভুত ঠেকিবে, সন্দেহ নাই। লেখকের নিজ রচনা অপরিবর্তিত থাকিলেই তাঁহার রুচি ও বৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে পাঠক নিঃসন্দেহ হইতে পারেন এই কথা মনে রাখিয়া সম্পাদক সবপ্রকার হস্তক্ষেপ হইতে বিরত রহিয়াছেন। তবে ইহাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, কারণ মূলগ্রন্থ-মুদ্রণে একাধিক প্রুফ-সংশোধকের হস্তচিহ্ন সুপ্রকট—ফলে পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই, স্থানে স্থানেই অসঙ্গতি দেখা যায়। তথাপি সেযুগের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির মোটামুটি কিছু পরিচয় ইহাতে পাওয়া যাইবে। ইতি—

কলিকাতা

শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

উৎসর্গ

গুরুদেব,

'মনোরমার জীবন-চিত্র' আপনার শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম। এইরূপ অভয়-ধাম ও নিরাপদ্-স্থান আর কোথায় পাইব? কেইবা ইহাকে আপনার মতন স্নেহের চক্ষে দেখিবে? মনোরমার জীবন আপনারই অপার করুণার নিদর্শন। যেরূপ ভাবে লোকেরা সৃষ্ট-বস্তুর সৌন্দর্য্য-বর্ণনা দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার অর্চ্চনা করে, সেইরূপ ভাবেই আপনার চরণ-কমলে অসঙ্কোচে ইহা অর্পিত হইল।

শ্রীচরণাশ্রিত
মনোরঞ্জন

নিবেদন

আপনার গুপ্তরত্ন কেহ কাহাকেও দেখায় না, কিন্তু যদি সে রত্নটী খোয়া যায়, তবে উহার নাম করিয়া সর্ব্বসমক্ষে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া থাকে, আমার অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছে। মনোরমা ২২ বৎসরকাল আমার গৃহিণীরূপে পৃথিবীতে বাস করিয়াছিলেন, এখন মনে হয়,

—না জানি কি কর্ম্মফলে, এসেছিলে ধরাতলে,
না জানি কি পুণ্যবলে, আমি অভাজন
দীন হয়ে, পেয়েছিনু দুর্ল্লভ রতন।

প্রায় আঠার বৎসর হইতে চলিল, সেই দুর্ল্লভ-রত্ন দুরন্ত কাল চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে, একটি অমূল্য রত্ন বাঁধা ছিল, রত্নটি খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে, ন্যাকড়াখানি লোকের পদতলে দলিত হইতেছে, মনোরমাকে হারাইয়া আমার অবস্থাও এই জীর্ণ-বস্ত্রের ন্যায় শোচনীয় হইয়াছে। মনোরমাকে পাইয়া মনে করিতাম, আমার অপেক্ষা সুখী জগতে আর কেহই নাই। তুমি রাজা হও, বিদ্বান্ হও, যশস্বী হও, আমার অপেক্ষা সুখী হইতে পারিবে না।

—দরিদ্রের পর্ণগৃহ গোময়-লেপিত
মাটির প্রাচীরে ঘেরা তৃণ আচ্ছাদিত,
(তাতে) একটি ঘৃতের বাতি, জ্বলেছিল দিবারাতি
সুস্নিগ্ধ আলোকে গন্ধে সে ক্ষুদ্র কুটীর
ছিল পরিপূর্ণ, যেন দেবতা-মন্দির।

কিন্তু,

—কোথা হ'তে অকস্মাৎ দম্‌কা বাতাসে
নিভে গেল সে দেউটী, কালের নিশ্বাসে;
আচম্বিতে অন্ধকারে, রুদ্ধশ্বাস একেবারে
অভাগা গৃহস্থ মূর্চ্ছামগ্ন ধরাতলে
শিশুগুলি কাঁদিয়া উঠিল কোলাহলে।

এই ত হইল সংসারের অবস্থা, হৃদয়ের অবস্থা তদপেক্ষাও শোচনীয়।

এই মর্ত্ত্যধামে এরূপ বিয়োগ-দুঃখ অনেকের অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে, সেজন্য কবি

কাব্য লিখিতে পারেন, কিন্তু ইহা লইয়া স্ত্রীর জীবন-চরিত লিখিতে যাওয়া সঙ্গত নহে। তবে আমি লিখিলাম কেন?

'মনোরমার জীবন-চিত্র' আমার স্ত্রী-বিয়োগের কাহিনী নহে। শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিয়াছিলেন, "মনোরমার জীবন দ্বারা লক্ষ লোকের উপকার হইবে", "পৃথিবীতে কোটীতে কদাচিৎ এইরূপ একটী জন্মে", "পাহাড়ে পর্ব্বতে এইরূপ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর", "একটী কুলবধূ সংসারধর্ম্ম করিয়া নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাট ও অভাবের মধ্যে কেমন করিয়া ধর্ম্মলাভ করিতে পারে, মনোরমা তাহারই দৃষ্টান্ত দেখাইতে আসিয়াছিলেন", "মনোরমার সম্পূর্ণ নির্ভরের অবস্থা", "মনোরমার পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা", "মনোরমার সমাধির অবস্থায় তাঁহাকে যে দেখিবে তাহার আত্মজ্ঞান জন্মিবে" ইত্যাদি।

এই অপ্রগল্‌ভা মহিলাকে দেখিয়া অনেকে ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এখন ত আর সে সুবিধা নাই, তাই গুরুভ্রাতাদিগের এবং বহু বন্ধুবান্ধবের ক্রমাগত ১৭ বৎসরের আন্তরিক অনুরোধে এই জীবন-চিত্র প্রকাশিত হইল।

প্রিয়তম বন্ধু ক্ষণজন্মা স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৫ই ফাল্গুন, ১৩২০) লিখিয়াছেন, "যে দেবীর সঙ্গে তুমি গ্রথিত তাঁহার কথা মনে হইলে আর এক লোকে উপস্থিত হই। 'বড় কপালে' না হ'লে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতে না। তুমি নাকি তাঁর একখানা জীবন-চরিত লিখেছ? উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রহিলাম, পাবো কবে? আমরাও কপা'লে যে তাঁর শ্রীচরণ দর্শন ক'রেছি। কর্ত্তার কি দয়া!" আরও লিখিয়াছেন, "আমি যে তাঁহাকে 'দেবী' লিখিলাম, তাহা কিন্তু তোমাদের আজকালকার ধরণের দেবী নহে।"

মনোরমার জীবন-চরিতের জন্য এইরূপ শত শত সাধুপুরুষের আগ্রহ, সুতরাং আমাকে সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। আমি তাঁহার স্বামী বলিয়া এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, তাঁহার পুণ্যময় জীবন-কাহিনী প্রকাশ করিতে পারিব না?

ইহা সত্য কথা, কিন্তু স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর জীবনচরিত লেখা বড় সহজ কার্য্য নয়। কোন কথা ঢাকিয়া চাপিয়া লেখাও দোষ, ফেনাইয়া তোলাও দোষ, স্বামীর পক্ষে এই উভয় সঙ্কট হইতে রক্ষা পাওয়া—এইরূপ ক্ষুরধারের উপর দিয়া গমন করা—কতদূর কঠিন কার্য্য, সকলেই বুঝিতে পারেন।

আর এক সঙ্কট। কোন মহিলার জীবন-চরিত লিখিতে হইলে তাঁহার

স্বামীর বিবরণ পরিত্যাগ করা যায় না, সেরূপ করিলে গার্হস্থ্যচিত্র একান্তই অসম্পূর্ণ থাকে। সাধারণ লোকের জীবনে ভালমন্দ কার্য্য থাকেই, আমার জীবনেও সেরূপ না থাকা অসম্ভব, কাজেই আমাকে আত্মকথা বলিতে এমন কি আত্মপ্রশংসাও লিখিতে হইবে। একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "নিজের কথাগুলি চাপিয়া যাওয়া অধিকতর যশোলিপ্সার কার্য্য, কেননা 'পাছে লোকে কিছু বলে' এই ভয়টাও যশোলিপ্সারই প্রকারান্তর মাত্র। কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া সিংহবিক্রমে লিখিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।" কিন্তু আমার 'সিংহবিক্রম' নাই, সুতরাং আমি সশঙ্কিত রহিলাম।

পাণ্ডুলিপি পড়িয়া আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণের মধ্যে অনেকে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মত এই যে, 'মনোরমার জীবন-চিত্র' আরও উজ্জ্বল ও বিস্তৃত হওয়া উচিত ছিল; তাঁহারা যাহা দেখিয়াছেন, 'জীবন-চিত্রে' তাহা ফুটিয়া উঠে নাই। যাঁহারা দীর্ঘকাল এক পরিবারস্থ হইয়া আমাদের সঙ্গে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা বলিলেন যে, এইরূপ একটী ক্রটিশূন্য জীবন তাঁহারা কখনও দেখেন নাই। একজন লিখিয়াছিলেন "তাঁহার (মনোরমার) দেবত্ব সম্বন্ধে আমরা কিছুই ধারণা করিতে পারি নাই কিন্তু তাঁহাতে যে মনুষ্যত্ব দেখিয়াছি, তাহা আর কোথাও দেখিব বলিয়া আশা নাই" ইত্যাদি। এই জীবন-চরিত প্রকাশ করিতে যাইয়া শুধু স্বামী বলিয়াই আমাকে এতটা দীর্ঘ কৈফিয়ত দিতে হইল।

আরও কিছু বক্তব্য আছে। মনোরমার পিতৃদেব, বিক্রমপুরের ভূষণস্বরূপ ৺কালীকুমার দত্ত মহাশয় সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে 'দাতা-কালীকুমার' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন; এমন কি 'কলিতে কালীকুমার' এইরূপ একটা প্রবাদবাক্য পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। এই উপলক্ষে তাঁহার কথা কিছু লিখিব, ইহাও আমার একান্ত প্রলোভনের বিষয়। সুযোগ্য বাঙ্গালা-লেখক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর, বি, এ, বিদ্যাবিনোদ (ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্) মহাশয় নিজে সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া 'দাতা-কালীকুমার' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ১৩০৪ সালে 'প্রদীপে' প্রকাশিত করিয়াছিলেন। আমি সেইটী উদ্ধৃত করিয়া তৎসঙ্গে অল্প কিছু বিবরণ সংযুক্ত করিয়া দিয়াছি। এজন্য কর মহাশয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম।

আর একটী বিশেষ কথা আছে। শ্রীশ্রীগুরুদেব ৺পুরীধামে দেহরক্ষা করিলে কিছুদিন পরে আমি 'নব্যভারতে' 'মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী' শিরোনাম দিয়া

কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করি। যদিও প্রবন্ধগুলিতে লেখকের নাম ছিল না, তথাপি অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, আমিই সেসকল লিখিয়াছি। ইহার পরে প্রায় অধিকাংশ গুরুভ্রাতা এবং অন্যান্য সুশিক্ষিত বহু বন্ধুগণ আমাকে শ্রীশ্রীগুরুদেবের একখানা জীবন-চরিত লিখিতে অনুরোধ করেন। আমি এতদিন সাহস করি নাই। আমার ইচ্ছা ছিল, 'মনোরমার জীবন-চিত্রে' কৌশলক্রমে শ্রীশ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু জানি, সমস্তই যথাসাধ্য প্রকাশিত করিব এবং তাহাতেই আমার জীবন সার্থক হইবে, লোকেরও উপকার হইবে। কিন্তু সাধ্যাতীত হইলেও ধর্ম্মবন্ধুদিগের বিশেষ আগ্রহে সংপ্রতি আমি বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে অভিলাষ করিয়াছি সুতরাং এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে যে যে ঘটনা আসিতে পারে, শুধু সেইগুলিই লিখিত হইল। অবশিষ্টাংশ লেখা অদৃষ্টে আছে কি না, ভগবান্ জানেন।

বাঙ্গালাদেশের একাধিক সুবিখ্যাত লেখক মনোরমার জীবন-চরিত লিখিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু আমি তাহা অনুমোদন করি নাই। কেননা লিখিতে হইলে এই জীবন-চরিত আমারই লেখা কর্ত্তব্য, অন্য কেহ ইহা লিখিতে পারেন না, এ কথার অর্থ কি, পুস্তক পাঠ করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

আমি নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিলে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, সত্যরঞ্জন এই পুস্তক ছাপিতে দিলেন। মাতার জীবন-চরিত এক ফর্ম্মা মুদ্রিত হওয়ার পরেই ধার্ম্মিক পুত্র, আমাদের সংসারের অমূল্য রত্ন, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মাতার নিকট চলিয়া গেলেন। সেই হইতে আজ তিন বৎসরের অধিককাল পুস্তকখানি নানা কারণে মুদ্রাযন্ত্রের কবলেই রহিয়াছে। অথচ জীবন-চরিতের অর্দ্ধেকের অধিক মুদ্রিত হয় নাই; দোষটা শুধুই ছাপাখানার নহে। এদিকে আমার শরীরও ভগ্ন, অথচ অনেকে পুস্তক চাহিয়া পাঠাইতেছেন, তাই যতদূর মুদ্রিত হইয়াছে তাহাই 'প্রথম খণ্ড' রূপে প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য বিশেষ বিশেষ ঘটনা রহিয়া গেল।

পরিশেষে আমার গুরুভ্রাতা ও ধর্ম্মবন্ধুগণের নিকট সানুনয় প্রার্থনা এই যে, আমি যদি তাঁহাদের আদরের ও শ্রদ্ধার পাত্রীকে তাঁহাদের মতন করিয়া চিত্রিত করিতে অক্ষম হইয়া থাকি, তজ্জন্য তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। তাঁহাদের ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা আমি কোথায় পাইব? আমি যে তাঁহাকে 'স্ত্রী' রূপে দেখিয়াছি।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা

মনোরমার জীবন-চিত্র

প্রথম খণ্ড

পরিচয়

মনোরমার পিতৃদেব ৺কালীকুমার দত্ত মহাশয় পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় 'দাতা-কালীকুমার' নামে পরিচিত। সুলেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর, বি, এ, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ মহাশয় ১৩০৪ সনের 'প্রদীপ' নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্রের প্রথম ভাগে 'দাতা-কালীকুমার' নামক প্রবন্ধে মনোরমার পিতার যে পরিচয় দিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল, ভরসা করি বাঙ্গালাদেশের একজন পুণ্যশ্লোক পুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবন পাঠ করিতে পাঠক পাঠিকা ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না।

দাতা-কালীকুমার

(সুলেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর, বি, এ, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ কর্ত্তৃক লিখিত ও ১৩০৪ সালের প্রথম ভাগ 'প্রদীপে' প্রকাশিত।)

'দাতা-কালীকুমার' নাম শুনিয়া পাঠক মনে করিতে পারেন আমরা কোনও গল্প লিখিতে বসিয়াছি। বস্তুতঃ বর্ত্তমান সময়ের চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার একজন মধ্যবিৎ গৃহস্থের সন্তান দাতা নাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ৩০ বৎসর গত হইল তিনি মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম কালীকুমার দত্ত; কিন্তু 'দাতা-কালীকুমার' নামেই সমধিক পরিচিত। পূর্ব্ববঙ্গে যুবক বৃদ্ধ অনেকেই তাঁহার নাম জানেন; সকলে বংশের উপাধি অবগত নহে। কালীকুমার কি প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং কিরূপ কার্য্যের দ্বারা এমন অসাধারণ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তৎসম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব।

পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব নিকেতন রত্নপ্রসূ বিক্রমপুর পরগণার কেন্দ্রস্থিত এক ক্ষুদ্র পল্লী কুকুটিয়া গ্রাম কালীকুমারের জন্মস্থান। এই গ্রাম মুন্সিগঞ্জ মহকুমার,

শ্রীনগর থানার অন্তর্গত। ভূতপূর্ব্ব জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ ৺নীলকান্ত সরকার কুকুটিয়ার একজন আধুনিক পরিচিত সন্তান কিন্তু কালীকুমারের নাম হইতেই কুকুটিয়ার প্রতিষ্ঠা। কালীকুমার অধিক দিনের লোক নহেন। প্রবন্ধের আরম্ভেই ইহার আভাস দিয়াছি। বয়ঃক্রম ৫০ বৎসর পূর্ণ না হইতেই তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। আনুমানিক ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তথাপি একথা স্বীকার্য্য যে কালীকুমারের সময়ে বিক্রমপুর ও কলিকাতা আট দিনের পথ ব্যবধান ছিল, এবং সেই সময়েই মধ্যবঙ্গের পরিহাস-রসিক নাটককার বিক্রমপুরের বিদ্রূপাত্মক চিত্র প্রকাশ করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। কালীকুমার কিছু দিন পরে জন্মগ্রহণ করিলে নিশ্চয় তাঁহার যশঃখ্যাতি পশ্চিমবঙ্গেও ছড়াইয়া পড়িত; এবং তাহা হইলে তাঁহার জীবন-কাহিনী লইয়া 'প্রদীপে' এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিবার প্রয়োজন হইত না।

সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ৪০/৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর অতিথি-সৎকার, স্বজন-প্রতিপালন, দরিদ্র-পোষণ প্রভৃতি সদ্‌গুণ বড়ই অধিক ছিল। তখন জীবন-সংগ্রাম এত কঠোর ছিল না। লোকের স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা প্রভৃতিও বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা অনেক অল্প ছিল। ধনবান্ ও উপার্জ্জনশীল লোকদিগের অন্তঃকরণ সাধারণতঃ অনুদার ছিল না। ঐ সময়ে যাঁহারা অর্থোপার্জ্জনজন্য বিদেশে যাইয়া বিষয়কর্ম্ম করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই সৎকার্য্যে প্রচুর ব্যয় ছিল। দেশের লোক কর্ম্মস্থলে গেলে ইহারা তাহাদিগকে আন্তরিক আদর যত্ন ও অকাতরে অন্নদান করিতেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে অনেকে ইহাদের নিকট পাথেয়, পরিধেয় প্রভৃতি পাইত। বঙ্গের এমন ভদ্র পল্লী অতি অল্পই আছে, যেখানে আজিও এইরূপ মুক্তহস্ত দু'এক ব্যক্তির স্মৃতি জীবিত নাই। কালীকুমার এই শ্রেণীর একজন শীর্ষস্থানীয় লোক ছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কালীকুমার মধ্যবিৎ গৃহস্থের সন্তান। সংসারের অধিকাংশ খ্যাতিমান্ ব্যক্তিই ত মধ্যবিৎ গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে দরিদ্রতার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে, সম্পদের উপেক্ষা অনাদরের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতে করিতে ইহারা উন্নত মস্তকে জীবনপথে অগ্রসর হন। পৌরুষ ও অধ্যবসায়ের বলে কমলা অল্পকাল মধ্যেই ইহাদের বশ্যতা স্বীকার করেন। শেষে সদুপায়ে অর্জ্জিত অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া ইঁহারা সংসারে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া যায়েন।

কালীকুমার কুকুটিয়ার দত্ত উপাধিধারী কায়স্থবংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ রামজয় দত্তের তিন পুত্র; রামলোচন, রাজকিশোর ও নন্দকিশোর। কালীকুমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রামলোচনের বংশধর। বাল্যকালে নিজের যত্নে কালীকুমার বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। শেষোক্ত ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান জন্মিয়াছিল। এই ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন বলিয়া তাঁহার নাম মুন্সি হইয়াছিল। কালীকুমার প্রথম জীবনে সামান্য বেতনে ঢাকায় এক বকসীর পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। কয়েক বৎসর এই কার্য্য করিয়া তিনি আদালতের কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং সেকালের ওকালতী পরীক্ষা দেন। প্রথমে মুন্সেফের উকীল হইয়া, শেষে সদর আমীনি আদালতের উকীল হয়েন। এই অবস্থাতে ইনি ময়মনসিংহে আসেন এবং এখানে আসিয়া বাপের অনুমতি লইয়া জজ্ আদালতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন।

ময়মনসিংহেই কালীকুমারের জীবনের উজ্জ্বলতম অংশ যাপিত হয়। এখানেই তাঁহার উপার্জ্জন অত্যন্ত অধিক হইত এবং অর্জ্জিত অর্থ তিনি সৎকার্য্যে মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেন। দ্বাদশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল তাঁহার দানস্রোত অবিরল ধারায় বহিয়াছিল, এবং তাহাতে অসংখ্য নরনারী উপকৃত হইয়াছিল। তাঁহার ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি ও চরিত্র সম্বন্ধে ময়মনসিংহের বিজ্ঞ ও প্রাচীন উকীল শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দপ্রসাদ বসু মহাশয় বলেন, "কালীকুমার আদর্শচরিত্র উকীল ছিলেন। আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ও ধর্ম্মভীরুতা তাঁহার বড়ই অধিক ছিল। জীবনে তিনি দুইবার মাত্র কালেক্টরী ও ফৌজদারী কাছারীতে গিয়াছিলেন; একবার এক নামজারী, আর একবার হত্যাপরাধঘটিত ফৌজদারী মোকদ্দমার উপলক্ষে। প্রথম মোকদ্দমায় তিন সহস্র ও দ্বিতীয় মোকদ্দমায় একদিনে এক সহস্র মুদ্রা পাইয়াছিলেন। এই দুই মোকদ্দমাতেই দুই প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী পক্ষ ছিলেন এবং তাঁহারাই অনুরোধ করিয়া কালীকুমারকে আনেন। কালীকুমার তাঁহাদের দেওয়ানী আদালতের উকীল ছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায়, দেওয়ানী আদালতে তাঁহার কেমন পসার ছিল। ফলতঃ সে সময়ে ময়মনসিংহে কালীকুমারের প্রতিদ্বন্দ্বী উকীল কেহ ছিলেন না। কালীকুমার যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি তেমনই সদ্বক্তা ছিলেন।" কালীকুমারের বুদ্ধিবৃত্তি ও বক্তৃতাশক্তির প্রশংসা করা প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার অর্থাগম কেমন ছিল, ইহাই দেখাইবার

নিমিত্ত, আমরা শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ বসু মহাশয়ের কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি। গোবিন্দবাবু কালীকুমারের সময়ে নূতন উকীল ছিলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথাই জানেন। এখন তিনিই পলিত-কেশ।

কালীকুমারের দান-প্রবৃত্তি ও অতিথি-সৎকার সেকালের দিনেও অসাধারণ ছিল। অসাধারণ না হইলে তিনি 'দাতা' নাম অর্জ্জন করিলেন কেমন করিয়া? কালীকুমারের বাসায় প্রত্যহ শতাধিক লোক আহার পাইত। সাধারণতঃ প্রতিদিন এক মণ দুগ্ধই লাগিত; ইহাতেই বুঝা যাইবে আহারের ব্যয় কত ছিল। দরিদ্র বিদ্যার্থী বা অসহায় কর্ম্মপ্রার্থী যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পারিত। * কোন কোন দিন তিন চারি শত অতিথি আসিত। ফলতঃ আহার অথবা অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহার দ্বারস্থ হইলে কাহাকেও বিমুখ হইতে হইত না। শুনিলে প্রাণ আনন্দিত হয় যে, সকল লোক একই ভাবে আহার পাইত এবং কালীকুমার স্বয়ং অতিথি আগন্তুকের পার্শ্বে বসিয়া তাহাদেরই একজনের ন্যায় আহার করিতেন। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় কর্ত্তার জন্য ভাল চাউল, আর অন্যের জন্য মোটা চাউল, অন্যের বাটীতে দুধ অল্প, একটি আম, আর কর্ত্তার বাটীতে দুধ বেশী, দুইটী আম, এ ব্যবস্থা কালীকুমারের বাসায় ছিল না। রাত্রিতে কালীকুমার কাযকর্ম্ম সারিয়া প্রায়ই সকলের শেষে আহার করিতেন। একবার জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন রাত্রিতে আহারে বসিয়া দেখিলেন, তাঁহার দুধের বাটীতে চারিটি আম রহিয়াছে। এক নবাগত ভৃত্য উহা রাখিয়াছিল। কালীকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন; "আজ কি সকলেই চারিটি করিয়া আম পাইয়াছে?" ভৃত্য উত্তর করিল, "না, উহাদের একটি করিয়া দিয়াছি।" কালীকুমার তৎক্ষণাৎ তিনটি আম তুলিয়া রাখিয়া কহিলেন, "এমন অখাদ্য আর কখনও আমার সম্মুখে আনিও না।" কালীকুমারের বাসায় সর্ব্বদা আট দশ জন ভৃত্য থাকিত এবং ইহারা যেমন কালীকুমারের, তেমনই সমাগত লোকদিগেরও সেবা করিত। অতিথি অভ্যাগত কাহারও যত্নের ত্রুটী হইলে কালীকুমার বড়ই দুঃখিত হইতেন এবং অনেক সময়ে ভৃত্যদের দোষ নিজে সংশোধন করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেন।

---

* বিদ্যার্থীগণের আহার, বেতন, পুস্তক ও বস্ত্রাদি সমস্তই দেওয়া হইত। উমেদারদিগের পরিজনদিগকে পূজার সময়ে বস্ত্র এবং তাহাদের বাড়ী যাওয়ার পাথেয় দেওয়া হইত। তিনি বলিতেন, "কেমন করিয়া ইহারা খালি হাতে বাড়ী যাইবে?"

কালীকুমার বড়ই মিষ্টভাষী ছিলেন। আগন্তুকদিগের মধ্যে যাহাতে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকেরা উপেক্ষিত না হয়, তিনি তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী প্রভৃতি সম্বন্ধে কালীকুমারের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল। সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের জন্য তিনি বাসার এক পৃথক্ খণ্ড নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এমন দিন ছিল না, যখন সেখানে দু'চারিজন লোকও না থাকিত। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহার যেরূপ আহারে অভিরুচি কালীকুমার তাহাই সংগ্রহ করিয়া দিতেন। একাদশীর দিনে কোন ব্রাহ্মণ অতিথি আসিলে তাঁহার জলপানের প্রচুর আয়োজন হইত। যাঁহারা নিরম্বু উপবাসী তাঁহাদিগকে পরদিন থাকিয়া পারণা করিয়া যাইতে হইত। অতিথিভক্তি কালীকুমারের কেমন মজ্জাগত ছিল, নিম্নলিখিত ঘটনাটি তাহার পরিচায়ক। কালীকুমারের স্বগ্রামস্থ বৃদ্ধ হরমোহন গাঙ্গুলি মহাশয়ের মুখে ইহা শুনিয়াছি। গাঙ্গুলি মহাশয় কালীকুমারের বাসায় থাকিতেন। ইনি ময়মনসিংহ রোড্‌সেছ্‌ আফিসে কর্ম্ম করিয়া সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"একবার একাদশীর দিনে মধ্যাহ্নসময়ে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া কালীকুমারের বাসায় অতিথি হয়েন। কালীকুমার সেই সময়ে জ্বরে শয্যাশায়ী ছিলেন। ব্রাহ্মণকে দেখিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি জল খাইবেন কি না। অতিথি জল খাইবেন বলিয়া উত্তর করেন। ইহার কিছুকাল পরেই কালীকুমারের শরীরে জ্বর অত্যন্ত প্রবল হয়, রাত্রি অর্দ্ধ প্রহর পর্য্যন্ত তিনি প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় থাকেন। শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, ঐ সময়ে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমেই পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করেন, "সেই একাদশী করা ঠাকুরটির জলপানের কি উদ্যোগ হইয়াছিল?" অন্যান্য লোকের সহিত অতিথি ব্রাহ্মণও তখন কালীকুমারের শয্যাপার্শ্বে ছিলেন। এ অবস্থায় এমন প্রশ্ন শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। আর সেই অপরিচিত ব্রাহ্মণ হৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসের সহিত কহিয়া উঠিলেন, "ধন্য আপনার ব্রাহ্মণভক্তি! কায়স্থ-কুল-তিলক আপনি। আপনার ন্যায় মহাপুরুষ দর্শনেও পুণ্য।"

আমরা এখানে আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। এটীও গাঙ্গুলি মহাশয় বলিয়াছেন। একবার পূজার পরে কার্ত্তিক মাসে কালীকুমার বাড়ী হইতে ময়মনসিংহ আসিয়াছেন। নৌকা হইতে সমস্ত জিনিসপত্র তখনও বাসায় উঠে নাই। এমন সময়ে প্রায় তিনশত ব্রাহ্মণ অতিথি আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। সেই সময়ে মুক্তাগাছার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারিণী, মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের মাতা লক্ষ্মী দেবী বিপুল ব্যয়ে বাড়ীতে মহাভারত পাঠ করাইতেছিলেন। দেশ দেশান্তর হইতে ব্রাহ্মণগণ আসিয়া দান লইয়াছিলেন। ইঁহাদেরই একদল ব্রাহ্মণ ময়মনসিংহে কালীকুমারের বাসায় আসিয়া উঠিয়াছিলেন। কালীকুমারের অবস্থা দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ যেন কিছু অপ্রস্তুত হইলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন কহিলেন, "বড় অসময়ে আমরা আপনার এখানে আসিয়াছি।" কালীকুমার যথাসাধ্য তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের কথার উত্তরে করজোড়ে কহিলেন, "আপনাদের আগমন সুসময়েই হইয়াছে। বাড়ী হইতে আসিয়াই এতগুলি ব্রাহ্মণ অতিথি পাইয়াছি, এবার আমার বৎসরটী ভাল যাইবে। অদ্য আমি সমুচিত আয়োজন করিতে পারিব না, তথাপি যথাসাধ্য আপনাদের আহার ও বিশ্রামের উদ্যোগ করিয়া দিতেছি।" ব্রাহ্মণ শুনিয়া নিরতিশয় প্রীতি সহকারে কহিলেন, "সার্থক নাম দাতা-কালীকুমার! অনেক দিন হইতে নাম শুনিয়াছি, আজ দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিলাম। আমাদের উদ্যোগ আমরাই করিয়া লইতেছি।" বলা বাহুল্য ব্রাহ্মণগণ পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিয়াছিলেন।

কালীকুমারের জীবনে ঘটনা অনেক আছে। একটি প্রবন্ধে সকলগুলির সমাবেশ হওয়া সম্ভবপর নহে। কালীকুমার অন্য স্থানে বা অন্য সময়ে জন্মগ্রহণ করিলে হয়ত এতদিনে তাঁহার বিস্তৃত জীবনী প্রকাশিত হইত। ইচ্ছা থাকিলেও সম্পূর্ণ জীবনী সংগ্রহ করি এমন শক্তি, অবসর ও অধ্যবসায় আমার নাই। ময়মনসিংহে আসা অবধি গত তিন বৎসর ধরিয়া অনেক বিশ্বস্ত ও পদস্থ লোকের মুখে কালীকুমারের অসাধারণ গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া আসিতেছি। অন্তঃকরণের অকৃত্রিম ভক্তির উচ্ছ্বাসেই আমরা তাঁহার জীবনের দু'চারিটি স্থূল স্থূল কথা লিপিবদ্ধ করিলাম।

একদিন একজন নূতন কর্ম্মপ্রার্থী দেশ হইতে আসিয়া সন্ধ্যার সময়ে কালীকুমারের বাসায় উপস্থিত হয়। রাত্রিতে আহারাদি করিয়া সে কালীকুমারের শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে। পথশ্রমে ক্লান্ত ছিল বলিয়া অতি শীঘ্রই তাহার নিদ্রাবেশ হয়। কালীকুমার আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে একজন ভৃত্য দেখিল আগন্তুক তাহার প্রভুর শয্যায় শয়ান রহিয়াছে; ভৃত্য তাহাকে তুলিতে গেল। তাহার "উঠুন উঠুন" শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র

কালীকুমার জিজ্ঞাসা করিয়া কারণ অবগত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কহিলেন "উহাকে উঠাইবার কোনও প্রয়োজন নাই। উহার জন্য যে শয্যা প্রস্তুত করিতে হইত তাহাই আমাকে দাও। আমি তাহাতে শুইয়া থাকিব। উহাকে নিদ্রা হইতে তুলিলে উহার কষ্ট হইবে।"

কালীকুমারের আর্থিক দান সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কিছু বলা হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রার্থী তাঁহার নিকট কখনও বিফলমনোরথ হইত না। কালীকুমার অনেক সময়েই যে যাহা চাহিত, তাহাকে তাহাই দিয়া দিতেন। তাঁহার মনের ভাব এইরূপ ছিল যে, প্রার্থীকে যেন অন্যের দ্বারস্থ না হইতে হয়। মুক্তহস্ত ছিলেন বলিয়া সর্ব্বদা তাঁহার হস্তে অধিক অর্থ থাকিত না। কালীকুমার অনেক সময়ে অনেককে বাসায় বসাইয়া রাখিতেন এবং আহার দিতেন, পরে হাতে অর্থ আসিলে তাহাদিগকে অর্থ দিয়া বিদায় করিতেন। একবার একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার নিকট কন্যাভারের দায় জানাইয়াছিলেন। কিছুদিন বাসায় থাকিয়া একদিন ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমার প্রার্থনা পূরণ করিলে আমি বাড়ী যাইতে চাই।" কালীকুমার বুঝিলেন ব্রাহ্মণকে অনেক দিন রাখা হইয়াছে। কাছারী যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন, "অদ্য যাহা পাইব তাহা আপনার।" ব্রাহ্মণের ভাগ্যক্রমে কালীকুমার সেই দিন পাঁচশত টাকা পাইয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে তিনি সহর্ষে সেই অর্দ্ধসহস্র মুদ্রা ব্রাহ্মণকে দান করিলেন।

কালীকুমারের এক পিসতুতো ভাই তাঁহার বাসায় থাকিতেন। তিনি এই দানের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহ যাহাতে মোটামুটি রকমে হইতে পারে, সেই পরিমাণ অর্থ দিলেই চলিত।"* কালীকুমার বলিলেন, "এ টাকাই আমার নহে, ব্রাহ্মণের। প্রত্যহ আমি পাঁচশত টাকা পাই না, আজ কেবল ব্রাহ্মণের ভাগ্যে পাইয়াছি।" কালীকুমারের ভাগিনেয় ময়মনসিংহের জেইলার (Jailor) শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত বসু এই ঘটনাটী বলিতে বলিতে বলেন, "মামা মধ্যে মধ্যে প্রায়ই অকৃত্রিম বিশ্বাসের সহিত কহিতেন, 'আমি যে এত পয়সা পাই, সে কেবল দশজনকে দুটি অন্ন দেই, আর কিছু কিছু সাহায্য করি বলিয়া। যে দিন আমি ইহা করিতে ক্ষান্ত হইব,

* পাঠক মনে রাখিবেন তথনকার পাঁচশত টাকা এখনকার দুইহাজার টাকার সমান। তখন টাকায় ১৴ মণ চাউল পাওয়া যাইত।

ভগবান্ সেই দিন আমার প্রাপ্তি অর্থ বন্ধ করিয়া দিবেন।' " অর্থপ্রধান বর্ত্তমান যুগে এমন বিশ্বাস উপেক্ষিত হইতে পারে, কেন না জগতের দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক অর্থবান্ এবং উপার্জ্জনশীল লোক কালীকুমারের পথে না চলিয়াও আপনাপন সঞ্চয় হইতে বঞ্চিত হন না। রজনীবাবুর মুখেই শুনিয়াছি, কালীকুমারের বাড়ীতে দুর্গোৎসব এক মহা ব্যাপার ছিল। বৎসরান্তে বাড়ী যাইয়া এই সময়ে তিনি লোককে অকাতরে অন্ন বস্ত্র দান করিতেন। চারি পাঁচশত লোক তাঁহার নিকট নূতন বস্ত্র পাইত। এতদ্ভিন্ন অনেক দরিদ্র সন্তানকে তিনি ছাতা জুতা প্রভৃতিও দিতেন। সংসারে দাতা নাম কি সহজে উপার্জ্জন করা যায়? জীবনে বিপুল অর্থরাশি অর্জ্জন করিয়াও পূর্ণ উন্নতির সময়ে ৪৭।৪৮ বৎসর বয়সে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কালীকুমার যখন দেহত্যাগ করেন, তখন তাঁহার সঞ্চিত অর্থ দুই সহস্রও ছিল না। কালীকুমারের শেষজীবনে তাঁহার ওকালতি লইয়া একটু গোলমাল বাধিয়াছিল। কালীকুমার যখন উকীল হয়েন, তখন ওকালতীর বিশেষ বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। কেহ কেহ সামান্যরূপে পরীক্ষা দিয়া সনন্দ পাইতেন। কেহ বা জজের অনুমতি লইয়া ব্যবসায় করিতেন। বরিশালের একজন উকিলের সনন্দ ছিল না বলিয়া তর্ক উপস্থিত হওয়ায় হাইকোর্ট সমস্ত সনন্দহীন উকিলের কৈফিয়ত তলব করেন। জজ আদালতের সনন্দ না থাকায় কালীকুমারকেও এই কৈফিয়ত দিতে হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে কালীকুমার স্বয়ং কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বারিষ্টার মন্টি ও সাহেব তাঁহার কৈফিয়ত লিখিয়াছেন, এবং স্বনামখ্যাত জজ লুইস জ্যাকসন সাহেব কালীকুমারের পরীক্ষা লইয়া তাঁহাকে সনন্দ প্রদান করেন। এই সময়ে ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতা গমন, আজকালকার ন্যায় সহজ ছিল না। কলিকাতায় যাত্রা করিবার সময়ে কালীকুমার বাসাস্থ সমস্ত লোককে একত্র করিয়া তাঁহাদের হস্তে তিনশত টাকা দিয়া যায়েন, এবং কহিয়া যায়েন, "যদি সনন্দ না পাই, তবে আর ময়মনসিংহে ফিরিব না। তাহা হইলে এই আমার শেষ সাহায্য। আর যদি সনন্দ পাই, তোমরা আমার অনুপস্থিতি সময়ে এই টাকা দিয়া চালাইবে, আমি ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় বন্দোবস্ত করিব।"* ফিরিয়া আসিয়া কালীকুমার দু'তিন বৎসর

* তৎকালিক ঢাকার প্রসিদ্ধ জমিদার ও নীলকুঠীয়াল মিঃ ওয়াইজ সাহেব এই সময়ে মাসিক এক হাজার টাকা বেতনে তাঁহার ম্যানেজারী করিতে অনুরোধ করেন। দত্ত মহাশয় বলেন, "যদি সনন্দ না পাই তবে কাশীধামে যাইয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ কাটাইব, কাহারও চাকুরি করিব না।"

মাত্র জীবিত ছিলেন। ময়মনসিংহ সিটি ইনষ্টিটিউসনের (Institution) সুযোগ্য হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এ, এই ঘটনাটি বলিতে বলিতে কহেন, "কালীকুমার যখন এই টাকা দিয়া যান, তখন আমি ময়মনসিংহ স্কুলে পড়িতাম। আমার সহাধ্যায়ী কেহ কেহ কালীকুমারের বাসায় থাকিতেন এবং তাঁহার অন্নে উদরপোষণ ও তাঁহার অর্থে অধ্যয়ন করিতেন।" ধন্য কালীকুমার! নিজের উপর এমন বিপদ্, আপনার বিষয়কর্ম্ম লইয়া টানাটানি, ইহাতেও তুমি আশ্রিতজনকে ভুলিয়া যাও নাই। যিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, নিশ্চয়ই তুমি তাঁহার অজস্র আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছ। জগতে কয়জনে তোমার অবস্থায় তোমার পদাঙ্কানুসরণ করিতে সমর্থ?

কালীকুমারের পারিবারিক ও নৈতিক জীবন সম্বন্ধে দু'চারিটি কথা বলিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কালীকুমারের পিতৃব্য স্বর্গীয় নন্দকিশোর দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু রেবতীমোহন দত্ত, এল, এম, এস, বর্ত্তমান সময়ে ময়মনসিংহে ডাক্তার ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্। রেবতীবাবু বলেন, "কালী-কুমারের ন্যায় স্নেহময় পবিত্র হৃদয় জগতে দুর্ল্লভ। বাসায় কালীকুমারের পুত্র তারকচন্দ্র, আমার অগ্রজ এবং আমি থাকিতাম। কখনও বুঝিতে পারি নাই যে, আমাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য আছে।" অবশেষে রেবতীবাবু অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে কহিলেন—"আমাদের সংসারে তিনি যে স্নেহের বাঁধ বাঁধিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মৃত্যুর পর ষোল সতর বৎসর পর্য্যন্ত আমরা একত্রে ছিলাম। পাশ্চাত্য শিক্ষার যে খরস্রোত বঙ্গের শত শত পরিবারের ঐক্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, তাহারই আঘাতে ১৪।১৫ বৎসর হইল কুকুটিয়ার দত্ত পরিবার পৃথক্ হইয়াছেন। আজকাল অনেক শিক্ষিত লোকের ধারণা যে, একান্নবর্ত্তী পরিবার অশেষ দোষের আকর। দেশে এই কুপ্রথা প্রচলিত থাকায় আমরা দিন দিন মনুষ্যত্ব হারাইতেছি। এই পাপ প্রথার মূলোচ্ছেদ না-হইলে বাঙ্গালীর উন্নতি নাই। অধুনা অনেকে নিজের জীবনে অন্যের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পরিবারস্থ সকলকে আত্মাবলম্বন শিক্ষা দিয়া দেশের উপকার করিতেছেন, ইহাও আমরা জানি। একই সময়ে একই ভবনে উপার্জ্জনশীল ভ্রাতা কর্ত্তৃক অগ্নারের আলোশোভিত সুসজ্জিত গৃহে লুচি মাংসের সদ্ব্যবহার হইতেছে, আর অর্থহীন সহোদর কক্ষান্তরে মৃৎপ্রদীপ সম্মুখে রাখিয়া রুটি গুড়ে কথঞ্চিৎ জঠরজ্বালা নিবারণ করিতেছেন, এ দৃশ্য এখন বিরল নহে। একান্নভুক্ত পরিবার শুদ্ধ গুণেরই আকর,

ইহাতে কুফল কখনও ফলে না, আমরা এমন কথা বলিতেছি না। গৃহের অধিষ্ঠাতৃগণের মনের সঙ্কীর্ণতা নিবন্ধন, ইহাতে অনেক সময়ে হলাহল উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু এই প্রাচীন প্রথা প্রচলিত থাকায় দেশে যদি একজন কালীকুমার দত্তেরও জন্ম হয়, তাহা হইলে আমরা কোনক্রমেই ইহার মূলোচ্ছেদের পক্ষপাতী নহি। পল্লীগ্রামে একান্নভুক্ত পরিবারে লালিত পালিত বলিয়াই কালীকুমার, কালীকুমার হইতে পারিয়াছিলেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কালীকুমার কোন দিনই পরিবার শব্দের আধুনিক সঙ্কীর্ণ অর্থ গ্রহণ করেন নাই। আজকাল যেমন "মহাশয় পরিবার আনিয়াছেন, আপনার পরিবারের অসুখ হইয়াছে" বলিলে কোন জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির গৃহলক্ষ্মী বা গৃহের অলক্ষ্মীকেই লক্ষ্য করা হয়, কালীকুমারের সময়ে অনেকেই পরিবার শব্দ এ অর্থে প্রয়োগ করিতেন না। কালীকুমারকে কেহ কর্ম্মস্থলে পরিবার আনিতে অনুরোধ করিলে তিনি কহিতেন, "আমার পরিবারে অনেক লোক। সকলকে এখানে আনা সম্ভব নহে। একজনকে ছাড়িয়া আর একজনকে আনিব, ইহাও হইতে পারে না।" বস্তুতঃ কালীকুমার কোনদিনই বাসায় তাঁহার স্ত্রী কিম্বা পিতৃব্যপত্নী প্রভৃতি কাহাকেও আনান নাই। বাড়ীতে সকলেই একরূপ বস্ত্র, অলঙ্কার পরিধান করিতেন, ইহা বলিবার প্রয়োজন আছে কি? কালীকুমারের স্ত্রীর অন্তঃকরণ, তাঁহার স্বামীর ন্যায় সরল ও উদার ছিল। সূতার কাপড় ভিন্ন অন্য কোন মূল্যবান্ কাপড় তিনি ভালবাসিতেন না। একবার এক আত্মীয় একখানি স্বর্ণের অলঙ্কার উপঢৌকন দিয়াছিলেন। "গৃহে আর কাহারও এইরূপ অলঙ্কার নাই, আমি ইহা কেমন করিয়া ব্যবহার করিব?" বলিয়া তিনি উহা প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। এমন না হইলে তিনি কালীকুমারের সহধর্ম্মিণী হইবেন কেন? কালীকুমারের নৈতিক জীবনও অতিশয় উচ্চ ছিল। তিনি স্বধর্ম্মনিরত, পরম বিশ্বাসী আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন। ময়মনসিংহের বৃদ্ধগণ একবাক্যে কহেন, কালীকুমারের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় পুরুষ সংসারে অল্পই দেখা যায়। উকীল গোবিন্দ-প্রসাদ বসু মহাশয় বলেন, "কোন অসৎ স্বভাবের পুরুষ কিম্বা নারী কালীকুমারের সম্মুখীন হইতে সাহস করিত না। কালীকুমারের বাসার নিকট দিয়া ব্রহ্মপুত্র, স্নান করিতে যাইবার পথ ছিল। কোন কোন বারবনিতা এই পথ দিয়া স্নান করিতে যাইত। কালীকুমার বাসায় থাকিলে ইহারা প্রায়ই ঘাটের পথে বাহির হইত না। কদাচিৎ তাঁহার সম্মুখে পড়িলে দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিত।"

এমন লোক যে সাধারণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অসীম ভক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহাতে বিচিত্র কি? ময়মনসিংহ সহরে তাঁহার সম্মান ও প্রভুত্ব অসাধারণ ছিল। একবার কতকগুলি পুলিশ-কনেষ্টবল সহরের এক বিপণীকারের সহিত বিবাদ করিয়া বিনামূল্যে তাহার দোকানের কতকগুলি জিনিষ লুইয়া যায় এবং তাহাকে প্রহার করে। ঘটনা শুনিয়া কালীকুমার বিপণীকারের পক্ষ হইয়াছেন, এই সংবাদ পাইবামাত্র অত্যাচারী লোকগুলি তাঁহার শরণাপন্ন হয় এবং তাঁহার আদেশমত বিপণীকারের ক্ষতি পূরণ করিয়া দেয়। সকলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতেন বলিয়া এখনও অনেক দরিদ্র কালীকুমারের নাম স্মরণ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কালীকুমারের জীবনের দু-চারিটী স্থূল কথা ভিন্ন 'প্রদীপে'র প্রবন্ধে স্থান হওয়া অসম্ভব। কালীকুমার অমর রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন। রাজা রায়বাহাদুর উপাধি পাইবেন, ভবিষ্যৎ বংশে নাম থাকিবে এই উদ্দেশ্যে তিনি দান করিতেন না। কেহ তাঁহার জীবনী লিখিবে এই আশা তিনি করেন নাই। মৃত্যুর ত্রিশ বৎসর পরে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র লোকের দুর্ব্বল লেখনী ক্ষীণস্বরে তাঁহার গুণগান করিবে, এ কথা অবশ্য কোন দিনই তাঁহার মনে ছিল না। তবে সাত্ত্বিক দানের এমনি মহিমা যে আজিও কালীকুমারের যশঃসৌরভ পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থান আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় 'দাতা-কালীকুমার' নাম সর্ব্বত্রই পরিচিত। বৃদ্ধ হরমোহন গাঙ্গুলী মহাশয় বলেন, "কালীকুমার কায়স্থের সন্তান, কিন্তু বিক্রমপুরের অনেক ব্রাহ্মণ এখনও বলিয়া থাকেন যে প্রাতঃকালে কালীকুমারের নাম করিলে দিনটী ভাল যায়।" ময়মনসিংহে কালীকুমারের স্মৃতি কেমন ভাবে আদৃত আমরা তাহা লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না। এ নগরে পূর্ব্ববঙ্গের প্রৌঢ়, বৃদ্ধ যত আছেন, কালীকুমারের কথা উঠিলে প্রত্যেকেই অকৃত্রিম ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখাইয়া থাকেন। কালীকুমার যেন তাঁহাদের সকলের আপনার লোক। সকলের মুখেই একই কথা, "তেমন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ আর হইবে না।" অত্রত্য জজ্ আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বলেন, "কালীকুমারের মৃত্যুর ১২।১৩ বৎসর পরে আমি এখানে ওকালতি করিতে আরম্ভ করি। তখনও একটী চলিত কথা ছিল, 'কলিতে কালীকুমার'। ইহার অর্থ এ যুগে এমন মানুষ দুর্ল্লভ।" মানুষ কতদূর পূজিত

হইলে ভাষায় এমন কথা প্রচলিত হইতে পারে পাঠক স্বয়ং তাহা বিবেচনা করিবেন। কালে কালীকুমারের কীর্ত্তি বিস্মৃতির গর্ভে লীন হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু তাঁহার তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কি? পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি যে, এই শ্রেণীর সৎপুরুষেরা পার্থিব প্রশংসার প্রত্যাশা রাখিয়া সৎকার্য্য করেন না। ইঁহাদের পুরস্কার পরলোকে। কালীকুমারের এই অসম্পূর্ণ জীবনী লিখিয়া আমরা তাঁহার গৌরব কিছুমাত্র বর্দ্ধন করিলাম তাহা নহে, পরন্তু তাঁহার পুণ্যনাম কীর্ত্তন করিয়া স্বয়ং ধন্য হইলাম ইহাই আমাদের বিশ্বাস। প্রবন্ধ লিখিত হইবার পরে দেখিলাম, বর্ত্তমান মে মাসের 'মহিলা' পত্রিকায় 'সংসারের সুব্যবস্থা কিরূপে হয়?' ইতি শীর্ষক প্রবন্ধে দৃষ্টান্তস্বরূপ কালীকুমার ও তাঁহার গৃহিণী সম্বন্ধে কয়েকটী কথা লিখিত হইয়াছে। লেখক সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের উদারতা ও বদান্যতার প্রশংসা করিয়াছেন কিন্তু কাহাকেও কালীকুমারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পরামর্শ দেন নাই। যে কালীকুমার সর্ব্বদা বলিতেন যে, আপনার আত্মীয় কুটুম্ব ও দেশস্থ দশজনের সাহায্য করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীবনবীমা, বর্ত্তমান সময়ের গৃহিণী-সর্ব্বস্ব গহনা-কাগজ-বীমাগত-প্রাণ গৃহস্থদিগকে আমরা কোন্ সাহসে তাঁহার পথে চলিতে বলিব? তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত অনেকে জ্ঞাতব্য বলিয়া মনে করিতে পারেন, সেই সাহসেই আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ 'প্রদীপে' পত্রস্থ করিলাম। বঙ্গের খ্যাতিমান্ লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই 'প্রদীপে' নিয়মিতরূপে তৈল দান করিতেছেন। 'প্রদীপ' বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের অগ্রণীদিগেরও অধিকাংশের হস্তে যাইয়া থাকে। কালীকুমারের এই সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া যদি প্রদীপ-পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়, তাঁহার বিস্তৃত জীবনী জানিবার জন্য ঔৎসুক্য জন্মে, তাহা হইলে আমরা কালীকুমারের জীবনের সম্পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহের ভার কোনও মহত্তর হস্তে ন্যস্ত করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর মহাশয় আমাকে লিখিয়াছিলেন, "যখন দাতা-কালীকুমারের জীবন-চরিত সংগ্রহ করি তখন আমি জানিতাম না যে আপনার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, আশা করি তাঁহার জীবন-চরিত সংগ্রহ বিষয়ে আপনি আমাকে সাহায্য করিবেন।" আমি

তাঁহাকে উত্তরে জানাইয়াছিলাম, "উক্ত মহাত্মার জীবন-সম্বন্ধে আমি অনেক ঘটনা সংগ্রহ করিয়া কোনো বঙ্গীয় সুলেখককে দিয়াছিলাম, তিনি সেসমস্ত হারাইয়া ফেলিয়াছেন। আমি সেসকল আর সংগ্রহ করিতে পারি নাই।" কর মহাশয় আমাদের ধন্যবাদের পাত্র, কেন না তিনি অন্ততঃ একটি প্রবন্ধ লিখিয়াও দাতা-কালীকুমারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।*

কয়েকটী ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। একদিন একজন নূতন চাকর (এই ব্যক্তি পূর্ব্বে কোনো জমিদারের চাকর ছিল) দত্ত মহাশয়কে পাণ দিতে যাইতেছিল, বাসাস্থ একজন উমেদার উক্ত চাকরকে শীঘ্র তামাক দিতে বলায় সে উত্তর করিয়াছিল যে, সে কর্ত্তার জন্য পাণ লইয়া যাইতেছে, এখন কিরূপে তামাক দিবে? কথাটি কর্ত্তার কাণে গেল, চাকর পাণ লইয়া উপস্থিত হইলে কর্ত্তা তাহাকে বলিলেন, "রাখিয়া দাও এবং গোমস্তাকে ডাকিয়া লইয়া আইস।" চাকর তাহাই করিল, গোমস্তা উপস্থিত হইলে কর্ত্তা তাহাকে বলিলেন, "এই ব্যক্তির বেতন দিয়া ইহাকে বিদায় করিয়া দাও।" চাকর করজোড়ে তাহার অপরাধের কারণ জানিতে চাহিলে কর্ত্তা মিষ্ট বাক্যে বলিলেন, "তুমি যখন কর্ত্তা এবং বাসার অন্য লোকের মধ্যে প্রভেদ করিয়া চলিতেছ, তখন আর তোমার এখানে কাজ করার সুবিধা হইবে না।"

দাতা-কালীকুমার বাল্যকালে শোল মৎস্যের ডিম খাইতে ভালবাসিতেন। একবার পূজার সময়ে দিঘী হইতে মাছ ধরা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে শোল মৎস্য ছিল। দত্ত মহাশয়ের খুড়ীমাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ইচ্ছা হইল যে, তাঁহাকে উক্ত মৎস্যের ডিম খাওয়াইবেন; কিন্তু তিনি বহু লোকের সঙ্গে একস্থানে আহারে বসিয়াছেন, কিরূপে তাঁহাকে উহা দেওয়া যাইতে পারে? তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী বিধবা, দত্ত মহাশয়

---

*সংপ্রাতি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র সেন গুপ্ত তাঁহার বিক্রমপুরের ইতিহাসে সংক্ষেপে কথঞ্চিৎ লিখিয়াছেন।

তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসেন ও মান্য করেন; পরামর্শে স্থির হইল, তিনিই তাঁহার ভ্রাতাকে শোল মাছের ডিম খাওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিবেন। ডিম যথেষ্ট নাই, সকলের হইবে না। কালীকুমার স্নেহময়ী ভগ্নীর অনুরোধে মাছের ডিম খাইতে স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু যখন তাঁহার পাতে দেওয়া হইল, তখন বলিলেন, "দিদি, সকলকে কিছু কিছু দাও, নহিলে যে আমার খাইতে প্রবৃত্তি হয় না"। ভগ্নী বলিলেন "ডিম অত্যল্প, সকলকে দিলে তোমায় কি খাওয়াইলাম? বিশেষতঃ এই বস্তু সকলেরই কিছু প্রিয় নহে, তুমি ভালবাস বলিয়াই তোমাকে দিতে আসিয়াছি।" উত্তরে কালীকুমার বলিলেন, "দিদি, সকলকে না দিলে আমি উহার আস্বাদ কিছুই পাইব না, অধিকন্তু আমার অত্যন্ত ক্লেশ হইবে।" তখন দিদি অভিমানে ডিমের বাটি ফেলিয়া রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে চলিয়া গেলেন, উপস্থিত সকলেই অবাক্ হইয়া রহিল। দিদির বাসনা পূর্ণ করিতে না পারিয়া কালীকুমার ক্লেশ পাইলেন, কিন্তু কি করিবেন? তিনি কি এই অখাদ্য ভক্ষণ করিতে পারেন? একস্থানে আহারে বসিয়া সকলকে না দিয়া যাহা খাওয়া হয়, তাহা যে অখাদ্য। বলা বাহুল্য যে, সকলের সঙ্গে ভোজনভিন্ন তাঁহার একাকী ভোজনের কোন বন্দোবস্ত ছিল না। মাছের ডিমের এই কথাটী আমি দত্ত মহাশয়ের খুড়ীমায়ের মুখে শুনিয়াছি।

কোন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাদের এক বন্ধুর নিকট বলিয়াছেন, তিনি যখন পুলিসে কার্য্য করিতেন তখন একদিন শ্রীহট্ট জেলার এক গ্রামে ব্রাহ্মণগণকে নদীতীরে শিবপূজা করিতে দেখিয়া, তাহাদের একসঙ্গে এরূপভাবে শিবপূজা করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং উত্তরে জানিলেন, "দরিদ্রের মা বাপ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের পোষণকর্ত্তা দাতা-কালীকুমারের ওকালতনামা গিয়াছে; যাহাতে তিনি পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হন, সেইজন্য গ্রামবাসী ব্রাহ্মণগণ উপবাসী থাকিয়া শিবার্চ্চনা করিতেছেন।" এই ঘটনায় বুঝা যায়, কত দূরদূরান্তরের লোকেরা

তাঁহাকে কিরূপভাবে দেখিত। তাঁহার স্বর্গারোহণের পরে ময়মনসিংহে হাহাকার উঠিয়াছিল, সাধারণের মুখে একই কথা—"ময়মনসিংহ অনাথ হইল।"

স্থানীয় রাজপুরুষদিগের নিকট তাঁহার অত্যন্ত প্রতিপত্তি ছিল। যখন তাঁহার সনদ গেল, তখন ময়মনসিংহের জমিদারগণ ও জজ্ কালেক্টার প্রভৃতি রাজপুরুষগণ সকলেই তাঁহাকে সনদ দেওয়ার জন্য হাইকোর্টে প্রশংসাপত্র পাঠাইয়াছিলেন, কোন কোন শ্বেতাঙ্গ জজ্ লিখিয়াছিলেন যে, দত্ত মহাশয়ের ন্যায় উকীল থাকাতে তাঁহারা সুবিচার বিতরণের সাহায্য পাইয়াছেন।

আর একটি ঘটনাও তাঁহার প্রতিপত্তির পরিচয় দিতেছে। সিপাহীযুদ্ধের সময়ে সহরে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল যে, রাত্রি ৮টার পরে কেহ রাস্তায় বাহির হইতে পারিবে না। কেবল দাতা-কালীকুমারের বাসার লোকদিগের সম্বন্ধে ভিন্ন বিধি ছিল, কেননা বাহিরের অনেক লোক তাঁহার বাসায় আহার করিত এবং রাত্রি দশটার পূর্ব্বে তাহারা ঘরে ফিরিতে পারিত না, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব আদেশ করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি দত্ত মহাশয়ের বাসার নাম করিবে পুলিশ তাহাকে ধরিবে না।

দাতা-কালীকুমার স্থাবর অস্থাবর যাহা কিছু সম্পত্তি করিয়াছিলেন, তাহা সমানাংশে তাঁহার পুত্রকে এবং খুল্লতাত ভ্রাতাদিগকে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। কিছু রৌপ্য বাসন ছিল, সেসকলেরও সমান ভাগ হইয়াছে, পরিবারস্থ অন্যান্য বালকদিগের সহিত তাঁহার পুত্র কন্যা সমান অংশ পাইয়াছে। তাঁহার হৃদয় এতই স্নেহপ্রবণ ছিল যে, ভাগিনেয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এবং তাহা হইতেই রক্ত বমন হইয়া তাঁহার বিষম পীড়ার উৎপত্তি হয়। বৈদ্যকুল-চূড়ামণি ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় কুকুটীয়া গ্রামে গিয়া তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দত্ত-পরিবারের লোকেরা কালীকুমারের কথা রামায়ণের কথার ন্যায় ব্যাকুলভাবে

সাশ্রুনয়নে আলোচনা করেন। এখনও পথিকগণ অঙ্গুলিনির্দ্দেশে কালীকুমারের বাড়ী দেখাইয়া বলে, "ঐ মহাপুরুষের বাড়ী।" দাতা-কালীকুমারের গৃহিণী তাঁহার অনুরূপই ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে কিম্বা পোষাক পরিচ্ছদে কেহ বুঝিতে পারিত না যে, তিনি সেই বিপুল পরিবারের কোনও বিশেষ ব্যক্তি। পরিবারস্থ অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে তিনি পালা করিয়া রান্না ও পরিবেশন করিতেন। এ বিষয়ে তিনি কাহারও নিকট হার মানিতেন না। স্বার্থত্যাগ, সমদর্শিতা প্রভৃতি সৎগুণই তাঁহার অলঙ্কার ছিল, স্বর্ণালঙ্কার ছিল না। তাঁহাকে সকলে 'সোনাবউ' বলিয়া ডাকিত। দত্ত-পরিবারের লোকেরা অদ্যাপি 'সোনাবউ' নাম করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে। একটি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া দাতা-কালীকুমার স্বর্গারোহণ করেন। পুত্রের নাম তারকচন্দ্র এবং কন্যার নাম মনোরমা।

বাল্যকাল

বাল্যকাল হইতে মনোরমা সকলেরই আদরের সামগ্রী ও স্নেহের পাত্রী ছিলেন। তাঁহার যখন আড়াই বৎসর বয়স তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইল; পূর্ব্ববঙ্গের গৌরবরবি অকালে মধ্যাহ্নগগনে অস্তমিত হইল, ৪৫ বৎসর বয়সে দাতা-কালীকুমার ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে কেবল যে তাঁহার পুত্রকন্যা পিতৃহীন হইলেন, অথবা আত্মীয়গণ অনাথ হইলেন, এরূপ নহে; দেশদেশান্তরের শত শত লোক পিতৃহীন ও বান্ধবহীন হইল। দত্ত-পরিবারের ত কথাই নাই, তাঁহাদের সুখস্বপ্ন জন্মের মত ভাঙ্গিয়া গেল। এক মহাবৃক্ষের পতনে শাখাশ্রিতা লতা ও পাদাশ্রিত গুল্ম-তরু যেমন ছিন্নভিন্ন ভগ্ন ও নিষ্পেষিত হইয়া যায়, এক মহাপুরুষের মৃত্যুতে দত্ত-পরিবার সবান্ধবে সেইরূপ হইল! কিন্তু পক্ষিণী যেমন দুর্য্যোগের দিনে তাহার শাবক-দিগকে বিশেষ যত্নে পক্ষপুটে আবরিয়া রাখে, দত্ত-পরিবারের মহিলাগণ

সেইরূপ এই দুঃখের দিনে তারকচন্দ্র ও মনোরমাকে সমধিক যত্নে প্রতিপালন করিয়াছিলেন এবং গ্রামস্থ সর্ব্বশ্রেণীর নরনারীর স্নেহদৃষ্টি তাহাদের উপর পতিত হইয়াছিল।

দাতা কালীকুমার দত্ত মহাশয়ের এক সহোদরা জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। বিক্রমপুরে সাড়েতিন ঘর প্রসিদ্ধ কায়স্থের বাস, * ইহাদের মধ্যে একঘর পারুলদীয়ার ঘোষ, এই ঘোষবংশে দত্তসহোদরার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি একটি কন্যাসন্তান প্রসব করিয়া বিধবা হন। সেই কন্যা ভরাকর গ্রামের প্রসিদ্ধ মধ্যল্য রায়োপাধিধারী কাটালিয়ার দত্তবংশে পরিণীতা হইয়া, একটি কন্যাসন্তান রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। দত্তমহাশয় এই মাতৃহীন ভগিনীকন্যাকে নিজগৃহে আনিয়া সযত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন; ইহার নাম কামিনী-সুন্দরী। কামিনী অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না বালিকা, দত্ত-পরিবারের স্নেহ ও যত্নে দিনে দিনে চন্দ্রকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। কি করিয়া ভগিনীর দুঃখ নিবারণ করিবেন, দত্তমহাশয় সেজন্য সর্ব্বদা চিন্তিত ছিলেন। তিনি ভগিনীকে একটি পোষ্যপুত্র রাখিয়া দিলেন, এই বালকের নাম চন্দ্রকান্ত। চন্দ্রকান্ত নিজগুণে দত্ত-পরিবারের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইলেন, এমনকি তিনি দত্ত-দম্পতীর হৃদয়ে যে স্থান পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের পুত্রকন্যাও তদপেক্ষা উচ্চস্থান লাভ করে নাই। দত্তমহাশয় শ্রীনগরের গুহরায়বংশে (ইহাঁরা যশোহর সমাজের বসন্ত রায়ের সন্তান, শ্রীনগরের জমিদারবাবুদিগের স্থাপিত কুলীন) শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায় মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীমতী কামিনীর বিবাহ দিলেন এবং বিপুল অর্থব্যয় করিয়া × চন্দ্রদ্বীপ সমাজের সুপ্রসিদ্ধ বাণারিপাড়ার

*মালখানগরের বসুঠাকুর, শ্রীনগরের গুহ মৌস্তফী, পারুলদীয়ার ঘোষ, এই তিনঘর কুলীন এবং কাটালিয়ার দত্ত অর্দ্ধঘর মধ্যল্য। এক্ষণে বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রামে নানাস্থান হইতে কুলীনগণ গিয়া বসবাস করিতেছেন। যথা,—ভরাকর গ্রামে ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর ইত্যাদি।

× পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সমাজের মৌলিকদিগকে অর্থব্যয় করিয়া কুলীনকন্যা গ্রহণ করিতে হয়, পূর্ব্বে বিপুল অর্থব্যয় করিতে হইত।

গুহ-ঠাকুরতা বংশ হইতে কন্যা আনিয়া ভাগিনেয় চন্দ্রকান্তের উদ্বাহোৎসব সম্পন্ন করিলেন। যাঁহার সহিত চন্দ্রকান্ত ঘোষ মহাশয়ের বিবাহ হইল তাঁহার নাম শিবসুন্দরী। ইনি এবং আমি এক প্রপিতামহের সন্তান, কিন্তু একই বাড়ীতে বাসনিবন্ধন আমরা খুড়তুতো জেঠ্তুতো অনেকগুলি ভাইবোন আপন ভাইবোনের মত ছিলাম। শিবসুন্দরী আমার 'মেজদিদি' এবং মনোরমার 'বউঠাকরুণ', এই গ্রন্থের মধ্যে অনেক স্থানে তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে হইবে, এইজন্যই এত পরিচয় দিলাম।

মেজদিদি, তাঁহার বিবাহের অল্পদিন পরেই বিধবা হইলেন। চন্দ্রকান্তের বিয়োগে দত্ত-পরিবারে যে শোকের আগুন জ্বলিল, তাহা আর নিভে নাই। এই শোক-সংবাদ শুনিয়াই দত্তমহাশয় একটা উচ্চ চৌকী হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান, তাহাতে মুখ হইতে যে রক্ত উঠিল, উহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। এই ঘটনার পরে তিনি অধিক দিন বাঁচেন নাই।

মেজদিদি বিধবা হইলে দত্তগৃহিণী বালিকা মনোরমাকে তাঁহার কোলে তুলিয়া দিলেন, সেই হইতে মেজদিদি মনোরমাকে একান্ত আপনার করিয়া লালন পালন করিয়াছেন। মনোরমার মাতা সর্ব্বদাই গৃহকার্য্যে এত বিব্রত থাকিতেন যে, তাঁহার কিছুমাত্র অবসর থাকিত না। দেবতুল্য স্বামীর বর্ত্তমানে যেরূপ আপনাকে পরিবারস্থ দশজনার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার অবর্ত্তমানেও ঠিক সেইরূপ, কি তাহা অপেক্ষা অধিকতর প্রযত্নে, সমগ্র পরিবারের সেবার ভার গ্রহণ করিলেন। তখনও বাড়ীতে প্রায় ৬০।৭০ জন লোক দুবেলা আহার করে, ইহার উপর অতিথি ও কুটুম্ব আছে। সকলের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়, এজন্য তাঁহার অবসর ছিল না। বালিকা মনোরমার প্রতিপালনের ভার প্রধানতঃ মেজদিদি ও তাঁহার জেঠাইমা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জেঠাইমা দাতা-কালীকুমারের সহোদর জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিঃসন্তান বিধবা-পত্নী। আর একজন প্রতিপালিকা

ছিলেন, তাঁহার নাম উল্লেখ না করিলে অপরাধ হইবে। তিনি এক বৃদ্ধা পরিচারিকা অথবা দাই-মা। ইহাকে সকলে ডাকিত 'কালা ধাই', তারকচন্দ্র ও মনোরমা তাঁহাকে 'কালা মা' বলিয়া ডাকিতেন। তিনি যে এই বালকবালিকাকে কিরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। দত্ত-পরিবারের বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বধূ ও জামাতৃগণ সকলেই কালাধাইকে প্রণাম করিত এবং কালাধাই আহার করিলে বধূগণ নিজহাতে তাহার উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিত। এ দৃশ্য, এ ভাব, সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইতে চলিয়াছে। মনোরমার পিসীমার বৃদ্ধবয়সে বুদ্ধি একটু বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি দয়ামায়ার আধার ছিলেন। বিশেষতঃ তারকচন্দ্র ও মনোরমার উপর তাঁহার আকর্ষণ এত অধিক ছিল যে, তাহাদের একটু অযত্ন (যাহা কদাচিৎ ঘটিয়াছে) দেখিলে তিনি সকলকেই শাসন করিতেন। তাঁহার শাসন সকলেই মাথা পাতিয়া লইত। পরিবারে অন্যান্য অনেক স্ত্রীলোক ছিলেন, সকলেই ইহাদিগকে ভালবাসিতেন। মনোরমা সমস্ত পরিবারের আদরের পুতুল ছিলেন। কালাধাই তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন 'দুর্গামণি', মনোরমার খুল্লপিতামহী (ইনি দেশগৌরব ডাক্তার জগদীশ-চন্দ্র বসুর পিতার মাসী) মনোরমাকে ডাকিতেন 'আমার মন্'। অনেকে ডাকিত 'মনা'। এইরূপ পরিবারমধ্যে তাঁহাকে আদর করিয়া অনেকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকিত। আদরের অবধি ছিল না। বালিকা মনোরমাও আপনার সরলতা ও ভালবাসায় সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল।

কালীকুমার দত্ত মহাশয় পরিবার বলতে কি বুঝিতেন, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই যে, খুল্লতাত ভগিনীর সপত্নী-পুত্রকে মানুষ করিয়া বিবাহ দিয়া পরিবারভুক্ত করিয়াছিলেন। এরূপ পরিবারের মধ্যে মাঝে মাঝে যে মনোমালিন্য কি বিবাদ কলহ হইবে, ইহা অসম্ভব নয়, বস্তুতঃ তাহা হইতও। কলহ-বিবাদের সময়ে কে কাহাকে কি বলিয়াছে, তাহার মীমাংসা করিতে হইলে বৃদ্ধাগণ অনেক সময়ে বালিকা

মনোরমার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেন, মনোরমা যাহা বলিতেন, তাহার উপর, বাদী, প্রতিবাদী, কি বিচারক, কাহারও কিছু বলিবার থাকিত না। এই বালিকাকে কেহ মিথ্যাবাদিনী বলিতে সাহস করিত না। সাত আট বৎসর হইতে তাহাকে কেহ মিথ্যা কথা বলিতে শুনে নাই এবং কাহারও প্রতিই তাহার পক্ষপাত ছিল না।

মনোরমা শিশুকাল হইতেই অতিথি-বৎসলা। বাড়ীতে অতিথি আসিলে আপনার দুগ্ধটুকু তাহাকে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হইতেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই দেবদেবীতে নিষ্ঠাবতী ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিতে শিশুকাল হইতে এই একটা বিশেষত্ব ছিল যে, কি খাদ্য, কি পরিধেয় কোনও বস্তু কাহারও নিকট কখনই চাহিতেন না। বালিকার আহার বিষয়ে এতই সংযম ছিল যে, কেহ হাজার অনুরোধ করিয়াও তাঁহাকে অতিরিক্ত ভোজন করাইতে পারিত না, কোনও সুখাদ্য বস্তুর প্রলোভন তাঁহাকে ভুলাইতে পারিত না। তাঁহার প্রতিপালিকাগণ এজন্য বড়ই দুঃখিতা হইতেন, এত আদরের মেয়ে, তাঁহাকে তাঁহারা তাঁহাদের ইচ্ছামত খাওয়াইতে পারেন না।

মনোরমা বাল্যকালে নিষ্ঠার সহিত ব্রতনিয়ম পালন করিতেন এবং দেবদেবীতে তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল।

উপরোক্ত বিষয়গুলি আমি দত্ত-পরিবারের বৃদ্ধা মহিলাদিগের নিকট শুনিয়াছি।

বিবাহ

১২৮৩ সালের ৩রা ফাল্গুন বসন্ত ঋতুতে আমাদের বিবাহ হইল। তখন আমার বয়স ১৮ বৎসর এবং মনোরমা ১২ বৎসরে পা দিয়াছেন। কুলীনের ঘরে কন্যাদান করিতে বিশেষ অর্থব্যয়ের প্রয়োজন। দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুর পরে অর্থের অসচ্ছলতা উপস্থিত হওয়ায় মনোরমার বিবাহে বিলম্ব হইয়া গেল। দাতা-কালীকুমারের কন্যাকে যেমন

তেমন বংশে অর্পণ করা যায় না, অথচ সেইরূপ অর্থবল নাই, কাজেই দৈবের মুখাপেক্ষা করিতে অভিভাবকগণ বাধ্য হইয়াছিলেন। এদিকে মেজদিদির একান্তই ইচ্ছা হইল যে আমার সহিত মনোরমার বিবাহ হয়, কিন্তু তিনি সাহস করিয়া সে প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন নাই, কেন না অর্থবল নাই।

এই সময়ে কোনও বিশেষ কারণে আমি বিবাহ-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছিলাম। ১৮ বৎসর বয়সে আমাকে অন্ততঃ ২৫ বৎসর বয়স্কের মতন দেখাইত, তখন আমার জ্ঞাতির মধ্যে আমার মতন দেখিতে এত বড় ছে'লে বোধ হয় কেহই অবিবাহিত ছিল না। উচ্চকুলীনের ছে'লে যদি একান্ত নির্ব্বোধ এবং দেখিতে কুৎসিত না হয়, তবে ধনী মৌলিকগণ তাহাকে লোফালুফী করিয়া লইয়া থাকেন। আমার জন্যও অনেক কন্যার পিতা আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি নিজে বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছি। সন্ন্যাসী হইয়া অনাসক্ত জীবন যাপন করিব এবং গাছতলায় মরিয়া থাকিব, কেহ আমার জন্য কাঁদিবে না, ইহাই আমার বাসনা ছিল। শিশুকালে পিতৃহীন হইয়াছি এবং দ্বাদশ বৎসর বয়সে স্নেহময়ী জননীকে হারাইয়াছি, একমাত্র সহোদরা আছেন, উচ্চবংশে ভাল ঘরে তাঁহার বিবাহ হইয়াছে এবং তিনি স্বচ্ছন্দে আছেন সুতরাং কোনো দিকেই আমার বন্ধন নাই, এ অবস্থায় ইচ্ছা করিয়া কেন বেড়ী পরিব? কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিবে? মেজদিদি মনোরমার স্বভাব চরিত্র সমস্ত বর্ণনা করিয়া তাঁহার মনোভিলাষ আমাকে জানাইলেন এবং এ কথাও বলিলেন যে, তাঁহাদের এমন অর্থবল নাই যে তাঁহারা সাহস করিয়া এরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন, কেবল আমার দয়ার উপরই তাঁহাদের নির্ভর। জানি না কি কারণে মেজদিদির কথাগুলি আমার অন্তরে একটা যুগান্তর উপস্থিত করিল। যে কথা হৃদয়ে স্থান দিব না ভাবিয়াছিলাম, সে কথা আজ হৃদয়কে আলোড়িত করিল। দাতা-কালীকুমারের কন্যা, অমন পবিত্র-চরিত্র, আদর্শ পুরুষের রক্তসম্পর্ক, আমি ইহা উপেক্ষা করিতে

পারিলাম না। মনে হইল যেন আমার জন্য মনোরমা এবং তাঁহার জন্য আমি এতকাল অপেক্ষা করিতেছি। মিলনও আশ্চর্য্য দেখিলাম, উভয়ের নামের কি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য, উভয়েই পিতৃমাতৃহীন, (মনোরমার ৮ বৎসর বয়সে তাঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে) পিতামাতার সন্তানের মধ্যে আমরা এক ভাই এক বোন, তাঁহারাও এক ভাই এক বোন এবং ভাই ভগ্নীর মধ্যে আমি যেমন কনিষ্ঠ মনোরমাও সেইরূপ কনিষ্ঠা, আমাদের জন্মমাস ও জন্মবার একই। আমার মনের অবস্থা যদি পূর্ব্ববৎ কঠিন থাকিত, তবে এইসকল সংযোগকে অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারিতাম; কিন্তু মন পূর্ব্বেই নরম হইয়াছে কাজেই এই সংযোগগুলিকে দৈব-মিলন বলিয়া মনে হইল। আমি এই বিবাহের প্রস্তাবে যাই সম্মতি প্রদান করিলাম, অমনি সেই মুহূর্ত্তে আনন্দে মেজদিদির চেহারা বদলাইয়া গেল, তাঁহার চক্ষে ও মুখে একটা অপূর্ব্ব আনন্দদীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। আমার জেঠামহাশয়, জেঠাইমা এবং ভগিনী, ভগিনীপতি প্রভৃতি অভিভাবকগণ সকলেই আনন্দে এই বিবাহে অনুমতি দিলেন, কেননা আমি বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছি ইহাই তাঁহারা যথেষ্ট মনে করিলেন। আমি যখন বিবাহ করিতে যাইতেছি তখন গ্রামের একজন বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কি তোমার দ্বিতীয়বার বিবাহ?" এত বড় গোঁপদাড়ীওয়ালা গুহঠাকুরতার ছে'লে এতদিন অবিবাহিত রহিয়াছে, বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই।

জানি না কি কারণে মনোরমা আমাকে পতিরূপে পাইয়া আপনাকে একেবারে কৃতার্থবোধ করিলেন, আমিও তাঁহাকে পত্নীরূপে পাইয়া ধন্য মনে করিলাম। সে বাল্যপ্রেমের বর্ণনা করা অসম্ভব ও অনর্থক।

কুকুটীয়ার দত্ত-পরিবার বড়ই রক্ষণশীল ছিল, উক্ত পরিবারে তখন বালিকাদিগের লেখাপড়া শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল না। বিবাহের পরে অ, আ, ক, খ, আরম্ভ করিয়া এক বৎসরের মধ্যেই মনোরমা আমাকে চিঠি লিখিতে পারিয়াছিলেন। তিনি অতি অল্প কথায় সুন্দররূপে

মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন, তাহাতে কিছুমাত্র বাহুল্য বা কৃত্রিমতা থাকিত না।

মনোরমা বাল্যকাল হইতেই অল্পভাষিণী ছিলেন, কিন্তু অল্পভাষী লোকেরা অনেক সময়েই অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া থাকে, মনোরমা সেরূপ ছিলেন না। প্রফুল্লতা তাঁহাকে সর্ব্বদা সরস করিয়া রাখিয়াছিল এবং তাঁহার অধরপ্রান্তে মৃদু হাসি সর্ব্বদাই বিরাজিত ছিল। তাঁহার ভ্রাতৃবধূ কুমুদিনীর সহিত এবং বাটীস্থ অন্যান্য বধূদিগের সহিত খুব সদ্ভাব ছিল, কিন্তু তাঁহার 'চিনিখুড়ীতে' ও তাঁহাতে যেরূপ ভালবাসা ছিল, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে সেরূপ নির্ম্মল নিঃস্বার্থ প্রগাঢ় প্রেম অতি অল্প স্থানেই দেখা যায়। দুজনায় দেখা হইলেই আনন্দের উৎস খুলিয়া যাইত। এই 'চিনিখুড়ী' মনোরমার পিতার খুল্লতাত-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ডাক্তার রেবতীমোহন দত্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী এবং টেঙটখালী গ্রামনিবাসী ৺কালীকুমার বসু ডিপুটীম্যাজিষ্ট্রেট্ মহাশয়ের কন্যা। ইঁহার ভ্রাতা সুবিখ্যাত অধ্যাপক ৺হেমেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের তৈলচিত্র রাজসাহী কলেজে বিদ্যমান রহিয়াছে। 'চিনিখুড়ীর' নাম জ্ঞানদা-সুন্দরী। ইনি গতবৎসর (বাং ১৩১৭), পতিপুত্র রাখিয়া গঙ্গালাভ করিয়াছেন। জ্ঞানদাসুন্দরী আদর্শ-চরিত্রা হিন্দুমহিলা ছিলেন। ইঁহার বয়স মনোরমার অপেক্ষা দু-এক বৎসর অধিক ছিল।

আমার কলিকাতায় আগমন

এগার বৎসর বয়সে আমি কলিকাতায় আসি। সে বৎসর ডিউক্ অব এডিন্‌বরা কলিকাতায় আগমন করেন। সে সময়ে বরিশালের সহিত রেল ষ্টিমারের কোনও সম্বন্ধ ছিল না, দেশ হইতে আমরা ন্যূনাধিক দশদিনে নৌকাযোগে কলিকাতা আসিতাম। আমার ভগিনীপতি হাইকোর্টে চাকুরী করিতেন। তিনি আমার দিদিকে লইয়া কলিকাতা আসিলেন, আমি লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে দিদির সঙ্গে

আসিলাম এবং আমার মা গঙ্গাস্নান করিতে আমাদের সঙ্গে আসিলেন।

আমি চক্রবেড় শিশুবিদ্যালয় নামক বাংলা স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম, ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া ইংরাজি পড়িব ইহাই সংকল্প ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই আমি শিক্ষকগণের স্নেহভাজন এবং ছাত্রদিগের প্রিয়পাত্র হইলাম, এমন কি ছাত্রদিগের মধ্যে আমার একটু প্রতিপত্তি এবং প্রভুত্বও হইয়াছিল। যখন আত্মীয়স্বজনগণ আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুরাশা করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ আমার সৌভাগ্যাকাশে বজ্রপাত হইল এবং সমস্ত আশাভরসারূপ বৃক্ষলতা তাহাতে ভস্মীভূত হইয়া গেল। অগ্রহায়ণ মাসে আমরা কলিকাতায় আসিলাম, আর মাঘ মাসে আমার পুণ্যময়ী জননীর গঙ্গা-প্রাপ্তি হইল। সেই সঙ্গে সংসারের সকল আশাভরসা এবং সাংসারিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইল।

একদিন রাত্রিকালে মা আমাকে ও দিদিকে কোলে করিয়া বসিলেন, তখন তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ। হঠাৎ মা বলিলেন, "দেখ্, গঙ্গামণি যেমন তাহার একটী পুত্র ও কন্যা রাখিয়া ওলাউঠায় মরিয়াছে, যদি আমিও সেইরূপ মরি তবে তোরা কি কর্‌বি?" গঙ্গামণি আমার মাতুলালয়ের একটী বিধবা মহিলা। মা'য়ের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া দিদি দুই হাতে মা'য়ের মুখ চাপিয়া ধরিলেন, আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, মা আমাদের নিকট বিদায় লইতেছেন। শেষ রাত্রে সেই দুরন্ত ব্যাধি আমার মাকে আক্রমণ করিল, কিন্তু মা যখন জানিতে দিলেন তখন বেলা দশটা এবং তখন মা'য়ের শরীর হিম হইয়া গিয়াছে, কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, নাড়ী বসিয়া গিয়াছে। সে সময়ে গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভবানীপুরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার, ইনি স্বনামধন্য ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়ের পিতৃদেব। গঙ্গাপ্রসাদবাবু মা'য়ের চিকিৎসা করিলেন এবং মেডিকেল কলেজের পূর্ব্ববাঙ্গলাবাসী অনেক ছাত্র প্রাণপণে শুশ্রূষা করিলেন। কিন্তু

কিছুতেই কিছু হইল না। তখনকার চিকিৎসায় ওলাউঠার রোগীকে বিন্দুমাত্র জল পান করিতে দেওয়া হইত না, কিন্তু আজকাল জলবরফই একটা প্রধান ঔষধ। সে দুঃখ আর এ জীবনে দূর হইবে না। মা আমার পিপাসায় "জল জল" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিয়াছেন কিন্তু তাঁহাকে এক বিন্দু জলও দেওয়া হয় নাই। "পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যায়" বলিয়া মা আমার বেগে উঠিয়া বসিয়াছেন, কিন্তু জোর করিয়া তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়া রাখা হইয়াছে। মৃত্যুর সহিত মা'য়ের আমার সমস্ত যাতনার অবসান হইয়াছে, কিন্তু আমাদের ভাই-ভগিনীর বক্ষ হইতে সে দুঃখের শেল আজিও অপসারিত হয় নাই, আজিও মা'য়ের সেই "জল জল" বলিয়া কাতর চিৎকারধ্বনি যেন আমার বুক ভাঙ্গিয়া দিতেছে।

মা গেলেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমার সকলই গেল। আশা গেল, আকাঙ্ক্ষা গেল, সুখ গেল, সংসার গেল। আর কার জন্য কি করিব? উকিল হব, জজ্ হব, ধনী হব, যশস্বী হব, কার জন্য হব? মা না দেখিলে কোনও সুখই ত সুখ নয়। মা'য়ের তৃপ্তির জন্যই আমার বড় হওয়ার প্রয়োজন ছিল, মা গিয়াছেন এইক্ষণ আমি এই বিশাল সংসারের কোন এক কোণে আপনাকে লুকাইয়া এ দেহ পাত করিব। সংসারের কিছুই আর ভাল লাগিল না। মাঝে মাঝে দিদির নিকট হইতে পলাইতে লাগিলাম, আমার মনের অবস্থা কেহই বুঝিতে পারিত না।

আমার কথা

সংক্ষেপে আমার নিজের কথা কিছু না বলিলে গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থাকে, কিন্তু নিজের কথা নিজের লিখিতে যে কতদূর সঙ্কোচ উপস্থিত হয়, যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারা অবশ্যই তাহা জানেন। সুবিখ্যাত লোকেরা আত্মজীবনী লিখিয়া থাকেন, কিন্তু আমার মত একজন নগণ্য লোকের পক্ষে সেরূপ কার্য্য যে পাঠক পাঠিকার হৃদয়ে অবজ্ঞা ও বিদ্রূপের সৃষ্টি

করিবে, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি। তথাপি কেন যে লিখিতেছি তাহার কারণ এই যে, কোন একটি বস্তুর বর্ণনা করিতে হইলে তাহার চারিদিকের একটা রেখাচিত্র (outline) না দিলে বস্তুটিকে ভাল করিয়া প্রকাশ করা যায় না। বিশেষতঃ কোন কুলবধূর জীবনের সহিত তাহার স্বামীর জীবন এমনই ভাবে জড়িত যে, একজনাকে ছাড়িয়া অন্যজনের কথা বলিতে গেলে বিষয়টা খাপছাড়া হইয়া যায়। কিরূপ সংস্কার, সংসর্গ ও স্বভাব লইয়া উভয়ের মিলমিশ হইল তাহা বুঝা যায় না। পাঠক পাঠিকা, এই অনন্যগতি লেখককে ক্ষমা করিবেন।

বাঙ্গলা ১২৬৪ সনের শ্রাবণ মাসে বরিশাল জেলার অন্তর্গত লতাগ্রামে মাতুলালয়ে আমার জন্ম হয়। আমার মাতামহ ৺গোপীচন্দ্র বসু মহাশয় গ্রামের মধ্যে একজন বিশেষ প্রভাবান্বিত ব্যক্তি ছিলেন। গ্রামের সমস্ত লোক তাঁহাকে মান্য করিত এবং আপনাদের অভিভাবক বলিয়া মনে করিত। গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, উন্নতনাসা, প্রশস্তললাট আমার ঠাকুরদাদামহাশয় দেখিতে অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের একছড়া সুদীর্ঘ মালা কণ্ঠদেশ হইতে বিস্তৃত বক্ষে বিলম্বিত হইয়া তাঁহার সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যকে অধিকতর বর্দ্ধিত করিত। আমার আট বৎসর বয়সে ঠাকুরদাদার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু আজিও আমি তাঁহাকে চক্ষের উপর দেখিতেছি।

ঠাকুরদাদা প্রতিবৎসর দুর্গোৎসব করিতেন। তিনি পূজার তিন দিন গ্রামের সমস্ত লোককে খাওয়াইতেন। সকলের নবান্ন হইয়া গেলে তিনি নবান্ন করিতেন, কেননা গ্রামের সমস্ত লোক লইয়া নবান্ন করিতে হইবে।* তাঁহার উদারতা, সহৃদয়তা ও বুদ্ধিমত্তায় তিনি

---

* বরিশাল জিলায় নবান্ন-পর্ব্ব যে কিরূপ সমারোহে সম্পন্ন হয়, যাঁহারা না দেখিয়াছেন তাঁহাদিগকে তাহা বুঝান অসম্ভব। এই পর্ব্বের আনন্দ সকল শ্রেণীর লোক সমান ভাবে সম্ভোগ করে। চাকুরীয়াগণ যেমন করিয়া হউক নবান্নে বাড়ী আসিবেন। কোন দুঃখী দরিদ্র দিনমজুর কি রাত-ভিখারী কেহই নবান্নের সময়ে বিদেশে থাকে না। সকল ঘরে আনন্দ, সকল ঘরে উৎসব, বস্তুতঃ বরিশালে নবান্নের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী উৎসব আর দু'টি নাই।

গ্রামের সমস্ত লোককে তাঁহার নিজের ঘরের লোকের মতন করিয়াছিলেন।

যথোচিত সমারোহ করিয়া ঠাকুরদাদা মহাশয় তাঁহার একমাত্র কন্যা (আমার মাতৃদেবী) ৺হরসুন্দরীকে বাণারিপাড়া নিবাসী ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা (আমার ৺পিতৃদেব) মহাশয়ের সহিত পরিণয় দিলেন। আমার পিতামাতা উভয়েই দেখিতে সুশ্রী এবং স্বভাবচরিত্রে সকলের প্রিয় ছিলেন। আমার মা গ্রামবাসীমাত্রেরই অত্যন্ত আদরের ও স্নেহের পাত্রী ছিলেন। মাতৃদেবীর ২২ বৎসর বয়সে আমার অগ্রজা জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার জন্মের আড়াই বৎসর পরে আমার জন্ম হয়।

পিতৃহীন

আমার জন্মের কয়েক মাস পরেই আমার পিতৃদেব ২৮ বৎসর বয়সে বিদেশে জ্বররোগে জড়দেহ পরিত্যাগ করেন। কোন উৎসবালয়ে হঠাৎ অগ্নিসংযোগ হইলে যেমন আনন্দোল্লাসের পরিবর্ত্তে 'হাহাকার' ধ্বনি উত্থিত হয়, সেইরূপ আমার মাতুলালয়ে বড়ই সুখের সময়ে বিষম শোকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই ক্ষুদ্র পল্লীখানির প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার রব উঠিল। সে শোক মর্ম্মভেদী শেলের ন্যায় সকলের হৃদয়ে এরূপ বিদ্ধ হইয়াছিল, আমি শুনিয়াছি গ্রামের সমস্ত বয়স্কা স্ত্রীলোক মামাবাড়ীর বিস্তৃত উঠনে গড়াগড়ি দিয়া চিৎকার করিয়াছিলেন। আহা, পল্লীগ্রামের সেই এক-প্রাণতা, সুখে দুঃখে সহানুভূতি পাশ্চাত্য সভ্যতাস্রোতে আজ কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে! এখন একই বাড়ীতে এ ঘরে শোক, ও ঘরে উৎসব, একত্রে বিরাজ করিতেছে। জীবন-সংগ্রামের দুর্গম পথে এখন আর কেহ কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতে পারে না। আবার সুখ-লিপ্সা, বিলাসিতা ও

স্বার্থপরতার অত্যাচারে এখন আর কেহ কাহারো মুখপানে তাকাইতে অবসর পায় না। আমাদের কপালে আরও কি আছে বিধাতাই জানেন।

অন্নারম্ভ

পিতৃদেবের দেহত্যাগের পর ঠাকুরদাদা দুই তিন বৎসর বাড়ী আসিলেন না। স্নেহের পুত্তলী কন্যাকে বিধবা দেখিবেন, ইহা তাঁহার অসহ্য। কিন্তু মহাকাল সকল সন্তাপের মহৌষধি, ঠাকুরদাদা বাড়ী আসিলেন। গ্রামের সমস্ত লোক একত্র হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল। স্নেহময়ী, কন্যাগতপ্রাণা, সরলহৃদয়া আমার ঠান্‌দিদির শোকের আগুন আবার নবীভূত হইয়া জ্বলিয়া উঠিল, মেয়েমহলে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। এ সময়ে আমার বয়স তিন বৎসরের উপর, কিন্তু আমার অন্নারম্ভ হয় নাই। কি করিয়া হইবে? সমারোহ করিয়া যখন অন্নারম্ভের বন্দোবস্ত হইতেছিল তখন ত শোকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল, দুই বৎসর আড়াই বৎসরের মধ্যে সে আগুনের আঁচ কমে নাই, তাই ঠাকুরদাদার এত সাধের দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন হইতে পারে নাই। সাড়ে তিন বৎসর বয়স অবধি আমি শুধু দুধ খাইয়া রহিয়াছি। আমার জন্য দুইটী গাভী ছিল, একটির নাম 'রূপী' অন্যটির নাম 'মঙ্গলী'। আমি তিন চারি সের দুধ খাইতাম। সাড়ে তিন বৎসর পর্য্যন্ত শুদ্ধ দুগ্ধ পান করিয়া আমার শরীর খুব হৃষ্টপুষ্ট ও লাবণ্যযুক্ত হইয়াছিল। গ্রামে আমার মতন সুস্থ বালক কেহই ছিল না। অন্নারম্ভের পরেও আমি অনেক দিন ভাত খাই নাই; পাছে আমি ভাত খাইতে চাই এজন্য সকলে ভাতের প্রতি আমার বিরক্তি জন্মাইয়া দিয়াছিল।

নামকরণ

আমার দিদির এবং আমার নামকরণের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। বাঙ্গলা ১২৬৭ সালে সুদূর পল্লীগ্রামের একজন ৬০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ (আমার মাতামহ) দিদির নাম রাখিলেন 'শশীকলা', আমার নাম রাখিলেন 'মনোরঞ্জন', ইহাতে মনে হয় যে ঠাকুরদাদা মহাশয়ের গাত্রে যদিও কখনো নব্য সভ্যতার বাতাস লাগে নাই, তথাপি তাঁহার অন্তরে কিছু নব্যতা ছিল। 'মনোরঞ্জন' নামধারী আমার অপেক্ষা অধিক বয়স্ক কোন বাঙ্গালী কেহ দেখিয়াছেন কি ?

বাল্যকাল

আমার ৮ বৎসর বয়সে ঠাকুরদাদা মহাশয় মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিলেন। পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হইয়া তিনি প্রায় এক বৎসর কাল শয্যাগত ছিলেন, এই সময়ে আমার মা তাঁহার যেরূপ সেবাশুশ্রূষা করিয়াছেন তাহা হিন্দুকন্যার পক্ষেও অত্যাশ্চর্য্য। গভীর রাত্রিতে, ভীষণ শ্মশানভূমিতে আমাকে লইয়া যাইতে আমার মাতুলগণ বাধা দিলেন, কিন্তু মা সে বাধা মানিলেন না, কেননা ঠাকুরদাদা এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার চিতায় আমার দ্বারা যেন একখানা চন্দনকাষ্ঠ অর্পিত হয়। মা আমাকে লইয়া শ্মশানে গেলেন, কীর্ত্তন ও হরিনামের রোলেব মধ্যে চিতা জ্বলিয়া উঠিল, আমার এত সাধের ঠাকুরদাদার দেবোপম দেহ অগ্নিদেব আত্মসাৎ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, আমি একখানা চন্দনকাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া সেই আগুনে আহুতি দিলাম, মা আমাকে স্নান করাইয়া ঘরে লইয়া আসিলেন। জীবনে এই আমার প্রথম শোক। আমি ভাবিতে লাগিলাম, "আমার ঠাকুরদাদা গেল কোথায় ?" এই সময় হইতে প্রেততত্ত্ব জানিবার জন্য আমার প্রাণে প্রথম আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হইল এবং এই আকাঙ্ক্ষা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, পরিণত বয়সে প্রেততত্ত্বের চর্চ্চায় আমাকে

জীবনের সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতে বাধ্য করিয়াছে। এখনও সে আকাঙ্ক্ষা একেবারে মিটে নাই, তবে অনেক পরিমাণে চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে।

পাঠশালা ও বাল্যচিন্তা

মামাবাড়ীর পাঠশালায় আমি ভর্ত্তি হইলাম, কিন্তু লেখাপড়ায় আমার মনোযোগ ছিল না। কেমন একটা উদাস ভাব আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া থাকিত। মামাবাড়ীর দক্ষিণ দিকে সুবিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র সমীরহিল্লোলে ঢেউ খেলিত, অসংখ্য টিয়াপক্ষী ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজে সবুজ মিলাইয়া সেই ধান্যক্ষেত্রের উপরে উপরে উড়িয়া বেড়াইত, আমি জ্ঞানহারা হইয়া তাহা দেখিতাম। কখনো কখনো মনে হইত "এই যে দক্ষিণ দিক্, ইহার সীমা কোথায়?" কল্পনাবলে বহু দূর গিয়া একটা প্রাচীর দিতাম, কিন্তু তাহাতেও যখন সীমা নির্ণয় হইত না, প্রাচীরের সীমার পরে কি—এই চিন্তা মনে উঠিত, তখন অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িতাম। কোন দিকেরই যে সীমা নাই, ইহা আমার নিকট অত্যন্ত ক্লেশকর হইয়া পড়িয়াছিল।

আর একটি কারণেও আমাকে ক্লেশ পাইতে হইত। কোন একটা দেয়ালে কি কোন বস্তুতে কেহ দুইটা রেখা টানিয়াছে অথবা কোন একটা গাছে দুইটা দাগ পড়িয়াছে, উক্ত রেখা কি দাগ সমান্তরাল না হইলে আমার মনে বড়ই উদ্বেগ বোধ হইত, আমি রেখা কি দাগগুলি পুঁছিয়া ঘসিয়া ফেলিতাম, অথবা কোনরূপে সমান্তরাল করিয়া দিতাম। যাত্রাগান শুনিতেছি, যাত্রার দলের কোন ছোকরার টেড়ী যদি বাঁকা হইত অথবা সিঁথির একদিকের চুল দুই চারিগাছি অন্যদিকে যাইয়া পড়িত, তবে আমার গান শুনার সুখ নষ্ট হইয়া যাইত, আমি উক্ত ছোকরার দিকে চাহিতে পারিতাম না, মুখ নীচু করিয়া থাকিতাম। এইসকল সামান্য কথা এইজন্য লিখিতেছি যে, এই

ভাবগুলি পরিণত বয়সে আমার জীবনের উপর অনেক প্রকারের কার্য্য করিয়াছে।

আর একটি কথা লিখিতে বিশেষ সঙ্কোচ বোধ হইতেছে। আমি মাতুলালয়ে অতিশয় আদরে প্রতিপালিত হইয়াছি, মাতুলগণ যথাসাধ্য পোষাক পরিচ্ছদে আমাকে সজ্জিত করিতেন, কিন্তু আমার সমবয়স্ক বালকসহচরদিগের সেইরূপ ভাল পোষাক না থাকিলে আমি আমার পোষাক পরিতে বড়ই যাতনা পাইতাম। আমার পোষাকের দিকে অন্যে তাকাইয়া আছে, সে নিজেকে আমার অপেক্ষা দুঃখী মনে করিতেছে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিতাম না, ইহাতে আমার একটা মর্ম্মস্পর্শী ক্লেশ হইত। বোধ হয় এই ভাব হইতেই চিরজীবন আমি বড়মানসীর বিরোধী হইয়া আছি। ধনগৌরব ও রূপগৌরব, এই দুইটাই আমার অসহ্য বোধ হইত। যৌবনের প্রারম্ভে আমার সহচর বন্ধুদিগকে লইয়া আমি একটী দল গঠন করিয়াছিলাম। সে দলের এই নিয়ম ছিল যে, যদি কোন যুবক ফিট্‌ফাট্ করিয়া টেড়ী কাটিয়া পোষাক পরিচ্ছদে বাবু সাজিয়া আমাদের সম্মুখীন হয়, আমরা তাহার দিকে কিছুতেই তাকাইব না, অন্য দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিব। ইহাতে ভাল মন্দ দুইটি ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। ভালটি এই যে, বাল্যকালের পরে আমি কখনো মূল্যবান্ কাপড়, জুতা, জামা পরি নাই, মন্দটি এই যে বড়মানসীকে ঘৃণা করিতে যাইয়া বড়মানুষদিগকেও সমুচিত শ্রদ্ধা করিতে পারি নাই।

———

সন্ন্যাসী

মাতৃবিয়োগের পরে আমার দিদি ও ভগিনীপতি (নরোত্তমপুর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ৺দ্বারকানাথ রায় মহাশয়) আমাকে অধিকতর যত্ন ও স্নেহ করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমার মন কিছুতেই বাঁধিতে পারিলেন না। সন্ন্যাসী হইব, স্থির করিলাম। সময় অমূল্য ধন, তাহার বিনিময়ে

অর্থ ও বিদ্যা উপার্জ্জন করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, হয় অমর হইতে হইবে নতুবা ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে হইবে, ইহাই স্থির করিলাম। অমর হওয়ার প্রণালী শিখিলাম। কিরূপে খেচরীমুদ্রা করিয়া জিহ্বাকে গো-জিহ্বার ন্যায় সুদীর্ঘ করিতে হয়, কেমন করিয়া দিন দিন আহার কমাইতে হয়, এবং কি কি বস্তু গলাধঃকরিয়া কিরূপ ভাবে কিরূপ স্থানে বসিতে হয়, সমস্ত জানিয়া লইলাম। কিন্তু সহসা এই প্রণালীর উপর বিরক্তি জন্মিল, ভাবিলাম একটা কাষ্ঠলোষ্ট্রের মতন হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া ফল কি ? এই সময়ে দেবদেবীর প্রতি আমার বিশেষ ভক্তি ছিল, ভাবিলাম কালীসিদ্ধি করিব। সেই বয়সে যতটা চেষ্টা করিতে হয় করিলাম। কালীঘাটে যাইয়া দিনরাত্রির মধ্যে অনেকবার পড়িয়া থাকিতাম, কালীমূর্ত্তি আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরিত রাখিয়াছিলাম। বাড়ীতে সকলের অগোচরে রাত্রি একটা দুইটা অবধি ধ্যান করিতাম, নানা প্রকারের সঙ্গীত নিজে প্রস্তুত করিয়া গান করিতাম। ত্রিকোণেশ্বরীর ঘাটে যেসকল সাধুসন্ন্যাসী আসিতেন, তাঁহাদের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ধর্ম্মকথা শুনিতাম।

এই সময়ে তীর্থস্থানগুলির প্রতি আমার অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিয়াছিল। মনে হইত, যদি কেহ আমাকে কুরুক্ষেত্র, অযোধ্যা, মথুরা কিংবা বৃন্দাবনে নিয়া ছাড়িয়া দেয়, আমি ভাবাবেশে নিশ্চয়ই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িব। হায়, জীবনে সেরূপ ভাব আবার কত দিনে আসিবে ? মায়ের অভাব দূর করিবার জন্য, শূন্য বুক পূর্ণ করিতে আমি কালী-সিদ্ধি করিতে যত্নবান্ হইলাম, কিন্তু কিছুতেই আমার মাতৃহীন-হৃদয় পূর্ণ হইল না।

ইহার পরে জীবনে আর একটা পরিবর্ত্তন ঘটিল। দেশের কাজ করিয়া জীবনপাত করিব ভাবিলাম। ভবানীপুরের কতকগুলি বাছা বাছা বালক লইয়া একটি দল গঠন করিলাম, অচিরে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। সভার নাম 'বাল্যোৎসাহিনী সভা'; সভ্যগণ আমাকে সভার সম্পাদক মনোনীত করিলেন। কালীঘাট হইতে

চক্রবেড় পর্য্যন্ত ছাত্র সংগ্রহ করিয়া এই সভা গঠিত হইয়াছিল। শিষ্টতাশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, একতাসাধন, রচনা ও বক্তৃতা শিক্ষা দেওয়া এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সভার সঙ্গে যাঁহাদের সম্পর্ক ছিল তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখন সুবিখ্যাত লোক হইয়াছেন।

এই সভা ভবানীপুরের ছাত্রমহলে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব সরকারী উকীল, সুবিখ্যাত ৺অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একদা ইহার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আজিও দেশ-দেশান্তর-স্থিত বিবিধ প্রকারের বিষয়কর্ম্ম-নিযুক্ত বাল্যোৎসাহিনী সভার সভ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে ভুলেন নাই। বাল্যোৎসাহিনী সভার আদ্যন্ত বিবরণ অত্যন্ত কৌতূহলজনক ও শিক্ষাপ্রদ, কিন্তু এখানে উহার বিস্তৃত বর্ণনা সম্ভবে না। উক্ত সভার সভ্যদিগের পরস্পরের সহিত পরস্পরের যেরূপ অমায়িক ভালবাসা ও সুমধুর সম্বন্ধ ছিল, সে ভাবটি এখনকার দিনে বড়ই দুর্ল্লভ। এখনও তাহা মনে করিয়া হৃদয় উল্লসিত হয়। ফুলটি শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার সুগন্ধ-স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

বক্তৃতা ও কবিতা

বাল্যকাল হইতেই আমি বক্তৃতা করিতে পারিতাম, কিন্তু ক্রমে আমার বক্তৃতার ভাষা বড়ই উৎকট হইয়া উঠিল। চৌদ্দ বৎসর বয়সে আলবার্ট হলে একটা বড় সভায় আমি যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম তাহার একটু নমুনা দিলে পাঠক বোধ হয় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। সভায় অনেক প্রসিদ্ধ বক্তা বক্তৃতা করিয়াছিলেন, আমি বালক এক কোণে দাঁড়াইয়াছিলাম, কেহ ভাবিতে পারে নাই যে আমিও একজন বক্তা। স্ত্রীশিক্ষার প্রচারের জন্য সভাটি আহূত হইয়াছিল। অসংখ্য করতালির মধ্যে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের বক্তৃতা যখন শেষ হইল তখন এক কোণে আমি দাঁড়াইয়া বলিতে আরম্ভ করিলাম, যথা—

"মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণ, লীলাবতীর মানবী-লীলা অবসানের পর সহস্র সহস্র বার সূর্য্যদেব গগনমণ্ডলে সমুদিত হইয়া তেজঃপুঞ্জ কিরণমালায় সমস্ত জগৎ বিভাসিত করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের দেশীয় অবলাগণের অন্তরনিহিত অমবস্যার আতঙ্ক-জনিত গভীর অন্ধকার কিছুতেই বিদূরিত হয় নাই—যাঁহারা সেই অন্ধকার দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন, প্রদোষ-সমীরের মৃদুল-বিহার-জনিত ভাগীরথীর তরঙ্গভঙ্গিমার ন্যায় তাঁহাদের হৃদয়ে যে অপরূপ আনন্দলহরী প্রবাহিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?" ইত্যাদি। একটি বালকের মুখে অনর্গল এইরূপ ভাষাবিন্যাস শুনিয়া খট্ খট্ শব্দে সমস্ত চেয়ারগুলি আমার দিকে ফিরিল। আমার মনে হইতেছে যখন আমি "প্রদোষ-সমীরের মৃদুল-বিহার-জনিত ভাগীরথীর তরঙ্গ-ভঙ্গিমার ন্যায়" বলিলাম তখন আমার কাছে উপবিষ্ট এক প্রৌঢ় ব্যক্তি "ও বাবা!" বলিয়া উঠিয়াছিলেন। আমি তখন এইরূপ ভাষায় যতক্ষণ ইচ্ছা অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতাম। বলা বাহুল্য যে শেষকালে আমাকে এই ভাষা বদলাইতে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, কি লেখায় কি বলায় এরূপ ভাষা শ্রোতৃবর্গের মনে কোন স্থায়ী ভাব মুদ্রিত করিয়া দিতে পারে না। মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধের প্রতি অত্যধিক আসক্তিই বোধ হয় আমার এইরূপ ভাষার প্রতি অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিল। সভাস্থলে করতালি আমি কাহারও অপেক্ষা কম পাইলাম না।

প্রসিদ্ধ নাটকলেখক সুকবি ও সুবক্তা ৺মনোমোহন বসু মহাশয় তাঁহার 'মধ্যস্থ' নামক পত্রিকায় আমার কবিতা প্রকাশ করিয়া আমাকে কবিতা লিখিতে সর্ব্বপ্রথম উৎসাহ দান করেন। 'মধ্যস্থে' অমিত্রাক্ষর ছন্দে আমার লিখিত 'ভীষ্মদেবের শরশয্যা' ছাপা হইল, সেদিন ছাপার অক্ষরে নিজের নামটা বারংবার দেখিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। ইহার পরে বসুমহাশয়ের 'চাষার খেদ' নামক অপূর্ব্ব কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আমি বুঝিলাম যে সরল ভাষায় যদি ভাব প্রকাশ করা যায়,

উহা অতীব হৃদয়গ্রাহী হয়, কঠিন ভাষায় সেরূপ হয় না। 'চাষার খেদ' আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল, দুঃখের বিষয়, উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

হেমবাবুকে শিঙ্গা বাজাইতে মানা করিয়া এক কবিতা লিখিয়াছিলাম, তিনি উহা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু উহা প্রকাশ করা হয় নাই। বঙ্গদর্শনে 'অশনি' নামে এক কবিতা প্রকাশিত হয়, বঙ্কিম বাবু উহা মনোনীত করিয়াছিলেন এবং সঞ্জীব বাবু সুখ্যাতি করিয়া আমাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু আর কখনও বঙ্গদর্শনে লিখি নাই। আমার বাল্যকালে লোকেরা মনে করিত, আমি কালে প্রসিদ্ধ লেখক হইব ; কিন্তু তাহাদের অনুমান ঠিক হয় নাই। ইহার এক প্রধান কারণ এই যে, মাতৃবিয়োগের পর হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত কোথা হইতে একটা উৎকট বৈরাগ্য হঠাৎ আসিয়া আমার সমস্ত সংকল্প ভাঙ্গিয়া চূরিয়া ফেলিত। সে বৈরাগ্য নিজে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিত না, অথচ একটা বৈদ্যুতিক শক্তির মতন আমার সাজানো গোছানো আসবাবগুলি ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিত। এই প্রবৃত্তি লইয়া আমি বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারি নাই, গ্রন্থকার হইতে পারি নাই, কবি হওয়া ত দূরের কথা। আমার তহবিলে অনেক অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ থাকিত, কোনোটার আধখানা লিখিয়া কোনোটার বা বারো আনা লিখিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি, সমাপ্ত করার পূর্ব্বেই বৈরাগ্য আসিয়া বলেন "এসব লিখিয়া কি হবে?" মুগ্ধবোধ পড়িতে আরম্ভ করিলাম, অল্প দিনেই এত পড়িলাম যে শিক্ষক অবাক্ হইয়া গেলেন কিন্তু হঠাৎ পড়া বন্ধ করিলাম, পাণিনিও ঐরূপ পড়িলাম, সংস্কৃত, ইংরাজী যাহা ধরিলাম সকলেরই সেই এক অবস্থা।

নানা কথা

আমাদের গ্রামে যখন সখের থিয়েটার হইল, আমিই তাহার একজন প্রধান উদ্যোক্তা এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। দীর্ঘকাল

পর্য্যন্ত দিবানিশি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া দল গঠন করিলাম। আমাদের অভিনয় দেখিবার জন্য দূরদূরান্তর হইতে লোকেরা নৌকা করিয়া আসিত এবং তিন চারি দিন নৌকায় বাস করিত। অভিনয়-কার্য্যে তখন আমাদের যেরূপ যশ হইয়াছিল, পূর্ব্ববঙ্গে সেরূপ তখন কাহারও হয় নাই। আমরা মদ্যপায়ীকে দলে গ্রহণ করিতাম না, এজন্য অনেকে মদ ছাড়িয়া আমাদের দলে মিশিয়াছিল। আমাদের দলের প্রভাবে গ্রাম্য দলাদলি উঠিয়া গিয়াছিল এবং গ্রামের যুবকদিগের মধ্যে একটা প্রগাঢ় প্রীতির বন্ধন জন্মিয়াছিল। আমি এই দলের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিলাম। হঠাৎ আমার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, কিছুই ভাল লাগিল না, আমি অভিনয় ছাড়িয়া দিলাম, থিয়েটারের দল ভাঙ্গিয়া গেল।

আমি আমাদের গ্রামের এবং পার্শ্ববর্ত্তী নরোত্তমপুর গ্রামের সর্ব্বশ্রেণীর নরনারীর যেরূপ ভালবাসা পাইয়াছিলাম, আমার সময়ে কিম্বা তাহার বহুপূর্ব্বেও কেহ কখনও সেইরূপ ভালবাসা পায় নাই। সকলেই আমাকে দেখিতে ভালবাসিত, নিজের জন মনে করিত এবং আমার কথা শুনিতে, আমার সঙ্গে কথা বলিতে, কি আমাকে আদর যত্ন করিতে ভাল বাসিত। যুবতী স্ত্রীলোকেরাও আমাকে সঙ্কোচ করিত না, তাহারা আমাকে শ্রদ্ধা করিত। বলিতে গেলে আমি আমাদের গ্রামের ও প্রতিবেশী গ্রামসমূহের বড়ই আদরের সামগ্রী ছিলাম। আমি দেশের উন্নতির জন্য যেসমস্ত সভা করিতাম, গ্রামের বৃদ্ধ অভিভাবকগণ তাহাতে উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন। এক বিরাট্ বিচার-সভা স্থাপিত করিয়াছিলাম, তাহাতে গ্রামের বিবাদ বিসম্বাদ ও বড় বড় মামলা মোকদ্দমা সালিশিতে নিষ্পত্তি হইত। আমাদের গ্রামে আমাঅপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ অনেক লোক ছিলেন, কিন্তু সকলে আমাকে কেন এরূপভাবে ভাল বাসিত তাহা অদ্যাপি আমি নির্ণয় করিতে পারি নাই। সেই একদিন গিয়াছে যখন গ্রামের সকল বাড়ীকেই আমার নিজের বাড়ী মনে হইত, ছোট বড় ভদ্র ইতর

সকলকেই পরমাত্মীয় মনে হইত। যাহারা সমাজে নিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়া পরিচিত আমি তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে যাইয়া আত্মবিস্মৃত হইতাম। তাহাদের সুখদুঃখের কথা আমার প্রাণে সুখদুঃখের তরঙ্গ তুলিত, আমি তাহাদিগকে বড় ভালবাসিতাম। ওলাউঠার রোগীর সেবা ও চিকিৎসা করার জন্য আমি একটী দল গঠন করিয়াছিলাম, গ্রামে ২।৩ জন ডাক্তার ও অনেক যুবক আমার সহকারী হইয়াছিলেন, তখন ভদ্র ইতর কোনও শ্রেণীর লোকই বিনা চিকিৎসায় ও বিনা সেবায় মরিতে পায় নাই। যুবকগণ অতি চমৎকার সেবা করিতেন। সে স্রোত এখনও একেবারে বন্ধ হয় নাই।

বাল্যকাল হইতে আমি কোন বিপদ্‌কেই বিপদ্ জ্ঞান করি নাই, এমন কি আমি বিপদে ও অসুবিধায় পড়িতে ভাল বাসিতাম। যে কার্য্য অতি সহজে সম্পন্ন হইত সেকার্য্য করিতে আমার উৎসাহ হইত না, যে পথে চলিতে কষ্ট নাই সে পথ আমার ভাল লাগিত না। ১৭ বৎসর বয়সেই আমি পূর্ণযুবক হইয়াছিলাম, এই সময়ে একটী বিষম মানসিক আঘাত প্রাপ্ত হইলাম। এই আঘাত আমার জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। অন্ধ ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামত সবেগে চলিতে গেলে যেখানে তাহার মাথা ঠেকে, ব্যথা পাইয়া সেইখানেই থমকিয়া দাঁড়ায়, আমিও সেইরূপ থমকিয়া দাঁড়াইলাম। জীবনে এইরূপ অনেক আঘাত পাইয়াছি এবং সেইসকল আঘাতে প্রত্যেকবারেই পথ পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় প্রত্যেকবারেই প্রেয় হইতে শ্রেয়তে আসিয়াছি, একটী আঘাতও নিরর্থক হয় নাই। এই আঘাত না পাইলে আমার ভবিষ্য-জীবন সম্পূর্ণরূপে অন্য আকার ধারণ করিত। যে ব্যক্তি সবেগে রাস্তা হাঁটিতেছে, এক হাত সরিয়া চলিলে সে উত্তর হইতে দক্ষিণে যাইয়া পড়ে, সেইরূপ একদণ্ডের একটী সামান্য ঘটনা মানুষকে যে কোথা হইতে কোথায় লইয়া যায় তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে মানুষের অভিমান করিবার কিছু থাকে না। ১৮ বৎসর বয়স হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহিত জীবনের ৭ বৎসর

একরূপে কাটিয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে ২০ বৎসর বয়সে একবার ঢাকা হইতে পদব্রজে কাছাড় গিয়াছিলাম। এই পর্য্যটনে আমাকে নানাপ্রকার অবস্থার মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল। একান্ত অবলম্বন-শূন্য হইয়া ১২দিন রাস্তা হাঁটিলাম, এই ১২ দিনে যেসকল ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা লিখিলে কুতূহলপূর্ণ একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইতে পারে; কিন্তু ঐসকল ব্যাপার এই পুস্তকের বিশেষ লক্ষ্য নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক মনে করি। ১৮ বৎসর বয়সের মধ্যে আমার জীবনে অত্যধিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, সাধারণতঃ একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকেও এত ঘটনার মধ্য দিয়া আসিতে হয় না। ক্ষিপ্ত সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় ঘটনাপুঞ্জ আমার জীবনতরীকে কোথাও স্থির হইতে দেয় নাই, ঘোর ঝটিকা ঝঞ্ঝাবাতের মধ্য দিয়া কোনো জাহাজ বন্দর পাইলে যেমন লঙ্গর করিয়া স্থিরভাব অবলম্বন করে, মনোরমাকে পাইয়া আমার জীবনতরীও অনেক পরিমাণে সেই ভাব অবলম্বন করিয়াছিল; কাণ্ডারীহীন তরী একটা বিশ্রামের স্থান পাইয়াছিল।

বৈদান্তিক পণ্ডিতদিগের সঙ্গ করিয়া ও তাঁহাদের উপদেশ পাইয়া যে ব্যক্তি এই পরিদৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইত সে একটী বস্তুকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইল। বিক্ষিপ্তচিত্ত আপনাকে প্রত্যাহার করার একটী স্থান পাইল। এই সময়ের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া একটী কবিতা লিখিয়াছিলাম, উহার কয়েকটী ছত্র উদ্ধৃত করিলে তখনকার ভাব স্পষ্ট হইতে পারে ঃ—

ভাবিতাম আছে কিনা এই বিশ্বস্থূল,
আমি আছি কি না আছি তাও হ'তো ভুল।
চিন্তা বহিল উজান,
ভাঙ্গিল স্বপ্ন, সেই মায়াময় ভাণ;
যদি বা না থাকে বিশ্ব, এই জড়ময় দৃশ্য,
তুমি আমি আছি তার কিছু নাই আন
প্রেমের সাগরে মগ্ন দুটী নগ্ন প্রাণ।

প্রেম যেমন 'সত্য' রূপে আপনার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে অন্য কেহই সেরূপ করিতে পারে না, সে প্রেম মানুষের প্রতি হউক আর দেবতার প্রতি হউক।

চপলতাহীন বালিকা বধূটী অল্প সময়ের মধ্যে আমার উদ্দাম হৃদয়কে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সে কোনো দিনও ভালবাসা দেখায় নাই, কিন্তু সে যে আমাকে সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল এবং আমাতে আপনাকে একেবারে ডুবাইয়া দিয়াছিল তাহা আমি অল্প দিনেই বুঝিলাম। আগে ভাবিতাম পূর্ব্বরাগ না হইলে বিবাহ সুখের হয় না, এখন বুঝিলাম হিন্দু-বধূ বিবাহের আসনে বসিয়াই স্বামীকে আত্ম-সমর্পণ করে, পতিকে ভালবাসিতে সতীর পূর্ব্বরাগের প্রয়োজন হয় না, 'পতিই সর্ব্বস্ব' এই জ্ঞানই তাঁহাকে পতিগত-প্রাণা করে। 'রূপজ মোহ' এই 'সতীত্বের' নিকট রাণীর কাছে চাকরাণীর মতন গৌরবহীন।

বরিশাল
অশ্বিনীকুমার

২৫ বৎসর বয়সে আমি বরিশাল সহরে, বলিতে গেলে, সর্ব্বপ্রথম গিয়াছি। জিলাস্কুলে ২টা বক্তৃতা করিয়া খ্যাতিলাভ করিলাম। ধীমান্ শ্রীমান্ অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে এখানে আলাপ হইল। তখন অশ্বিনীবাবু বলিতে গেলে উভচর ছিলেন অর্থাৎ ধর্ম্মসভার ও ব্রাহ্ম সমাজের উপদেষ্টা ছিলেন এবং ওকালতীও করিতেন। ধর্ম্মে প্রবৃত্তি আছে অথচ ওকালতীটাও জমিয়া উঠিতেছে, বলা বাহুল্য যে বিবেকী লোকের পক্ষে এটি বড়ই সঙ্কট-কাল। কিন্তু তিনি আপনাকে চিনিয়াছিলেন, তাই এ সঙ্কটে তাঁহাকে অধিককাল থাকিতে হয় নাই। যদিও তাঁহার ওকালতী ত্যাগ ব্যাপারটা বড় সহজ ছিল না, কেননা ভবিষ্যৎ আশায় স্ব-জনগণ সে কার্য্যের বড়ই বিরোধী হইয়াছিলেন,

কিন্তু একথাও বলিতে হইবে যে তাঁহার সাংসারিক অবস্থা তাঁহার অভিমত কার্য্য-সিদ্ধির প্রতিকূল ছিল না, তথাপি যে ব্যক্তির একদা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল হওয়ার প্রত্যাশা ছিল, ওকালতী পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে অল্প মানসিক বলের পরিচয় নহে। যাহা এদেশের অনেকেই করিতে পারে না, অশ্বিনীবাবু তাহা করিলেন, তিনি ওকালতী ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া দেশ-সেবায় ব্রতী হইলেন। অশ্বিনীবাবু যশস্বী ছিলেন, এই কার্য্যে সর্ব্বসাধারণের চক্ষে অধিকতর যশস্বী হইলেন। একদিকে যেমন তাঁহার অসাধারণ শক্তি সামর্থ্য, অন্যদিকে তাঁহার অনন্যসাধারণ সহৃদয়তা, অমায়িকতা, গরিমাশূন্যতা ও বদান্যতা তাঁহাকে অত্যন্ত লোক-প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। যাঁহারা তাঁহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ছিলেন তাঁহারা তাঁহার ভগবদ্‌ভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। দেশহিতৈষণা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের আভরণ ছিল। এখানে অশ্বিনীকুমারের জীবন-চরিত বলিতে গেলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে, তাই তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটীমাত্র কথা বলিলাম। অশ্বিনী, সামাজিক সম্পর্কে আমার নাতি, ধর্ম্ম সম্পর্কে গুরুভাই, তিনি বরিশালের প্রায় সর্ব্ব সদনুষ্ঠানের নেতা। আমি অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে কতকগুলি কার্য্যানুষ্ঠানে যোগদান করিলাম।

দোকানদারী

বরিশাল থাকাকালীন উমেদারদিগের অবস্থা দেখিয়া আমি বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। যুবকগণের শুষ্কমুখ, হতাশ হৃদয় ও ব্যর্থ চেষ্টা কাহার না মর্ম্মবেদনা উৎপাদন করে? বাবা কিম্বা দাদা শিক্ষার জন্য যে অর্থব্যয় করিয়াছেন সে টাকার সুদ তুলিতেও উমেদারদিগের শক্তি নাই। 'হা চাকুরী' 'হা চাকুরী' করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিশুষ্কমুখে মলিনবেশে তাহারা যখন বিশ্রামের জন্য সাধারণ পুস্তকালয়ে আসিয়া বসিত তখন আমি ইচ্ছা করিয়া তাহাদের সঙ্গে

মিশিতাম। একদিন 'উমেদারের দশদশা' বলিয়া এক কবিতা লিখিলাম, কিন্তু তাহাতে কাহারো দুঃখ মিটিল না, কাহারও মনের পরিবর্ত্তন ঘটিল না। চাকুরী ভিন্ন অন্য কিছু করিয়া যে ভদ্রলোকের ছেলেরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে এ বিশ্বাস কাহারও হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইল না। বরিশালের লোকেরা জানিত তালুকদারী আর চাকুরী। দুই চারিজন ভদ্রলোক ছোটখাট দোকান করিয়াছিলেন, অল্পদিনেই সেসকল উঠিয়া গিয়াছে, ইহাতে নিরাশা আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। আমার ইচ্ছা হইল অত্যল্প মূলধনে একখানি দোকান করিয়া আমি কৃতকার্য্যতা দেখাইব।

আমি একশত টাকা মাত্র মূলধন লইয়া একখানা দরজী-দোকান খুলিলাম। ৯০ টাকা মূল্যে একটা সেলাইয়ের কল কিনিলাম, দশ টাকা অবশিষ্ট রহিল, কতকগুলি বালিশের ওয়াড় প্রস্তুত করিয়া আমার কল চালাইবার শিক্ষানবিশী করিলাম। বিবির মহালার পুকুরের পশ্চিম পারে মাসিক ১।০ পাঁচসিকা ভাড়ায় একখানা খড়ো ঘর ভাড়া লইলাম, ঘরখানির জীর্ণ চালা ছিল কিন্তু বেড়া ছিল না। একটী বৃদ্ধ দরজীকে মাসিক ৯৲ টাকা বেতনে কাপড় কাটার জন্য নিযুক্ত করিলাম। গৃহসজ্জা ও আসবাব দেখিয়া এবং মূলধনের কথা শুনিয়া লোকেরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিত না এবং এই কাজটাকে আমার একটা ছেলেখেলা বা খামখেয়ালী মনে করিত। যাঁহারা আমার দোকানে কাপড় দিতেন তাঁহারা জানিতেন যে তাঁহাদের জিনিষ কিছুতেই ভাল হইবে না, কেবল আমার খাতিরে দিতেছেন কিন্তু আমি অতি যত্নের সহিত তাঁহাদের জিনিষ উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া দিতাম। রাস্তার লোকেরাও আমার দোকানের অবস্থা দেখিয়া হাসিত, কিন্তু আমার মনের ভাব এই ছিল যে, আমি দেখাইব আমি মুটের কার্য্য করিতেছি তবু চাকুরী করিতেছি না। তখন সহরে আমার যতটা সম্মান ছিল তাহাতে ঐরূপ জীর্ণ ঘরে নিজের হাতে কল চালাইতে বসা আমার পক্ষে যে কিরূপ পরিহাসের বিষয় হইয়াছিল তাহা বলা যায় না;

কিন্তু আমি কাহারও কথা গ্রাহ্য করি নাই। আমি আমার দোকানের কার্য্যে ব্যস্ত আছি, অপরাহ্ণ ৫টা বাজিতে না বাজিতে শ্রীযুক্ত অশ্বিনী-কুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস প্রভৃতি সহরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সাঙ্গোপাঙ্গসহ খোল করতাল নিশানাদি লইয়া আমার দোকানের দ্বারদেশে আমার জন্য উপস্থিত হইলেন, আমি কলের কার্য্য বন্ধ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে বক্তৃতা করিতে নীলকণ্ঠ রায়ের মাঠে চলিলাম। একটা সর্ব্বোচ্চ কার্য্য এবং একটা অতি নিম্ন কার্য্য করিতে আমি কিছুমাত্র গৌরব বা অগৌরব মনে করিতাম না। লোকশিক্ষা আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

সংক্ষেপে এই দোকানের কথা শেষ করিতে হইবে। পরিণামে এই দোকানে মাসিক ২।৩ শত টাকা লাভ হইতে লাগিল। আমার একজন উমেদার বন্ধুর হাতে দোকান সমর্পণ করিলাম। এই দোকানের দ্বারা তিনি অবস্থাপন্ন লোক হইয়াছেন। অন্য একটি লোক এক বাড়ীতে ভাণ্ডারীর কার্য্য করিত, তাহাকে আমি আমার দোকানের শিক্ষা দিয়াছিলাম, ভগবানের কৃপায় সেও এখন স্বতন্ত্র দোকান খুলিয়া মাসিক অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। যাহারা এই সময়ে চাকুরীর উমেদারীতে ছিল তাহাদের মধ্যে যাহাদের চাকুরী হইয়াছে তাহাদের বেতন অনেকেরই আজিও ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা হয় নাই। তবে একথা অবশ্য আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে উপরোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতা অতীব প্রশংসনীয়। দোকানের সহিত আমার নামের সম্পর্ক রাখিতে আমার উমেদার বন্ধু ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু আমি সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া দোকান তাঁহাকে দিলাম, শুধু আমার প্রথম মূলধন ১০০৲ টাকা আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম। এখনও এই দোকান বরিশালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাটা কাপড়ের দোকান।

মতপরিবর্ত্তন

আমার দোকান-লীলা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই আমার কতকগুলি মতপরিবর্ত্তন ঘটিল। অনেক দিন ধর্ম্মের কথা পরকালের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সেসকল চাপা পড়িয়াছিল, এবারে স্বদেশানুরাগ, সমাজ-সংস্কার ও পরিত্রাণ-চিন্তা এই তিনটি একসঙ্গে জড়িত হইয়া হৃদয়কে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল, সুতরাং ধর্ম্মমতও এই তিনের দ্বারা গঠিত হইল।

জাতিভেদটাকে দেশের যত অমঙ্গলের কারণ বলিয়া মনে হইল। ঈশ্বরের রাজ্যে জাতিভেদ কি? বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' আমার চিন্তানলে ঘৃতাহুতি দিল, ভাবিলাম এমন যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ আর নাই। জাতিভেদের বিরুদ্ধে চিন্তা করিতে করিতে এমনই মনের অবস্থা হইয়াছিল যে জাতিভেদ যদি আমার গায়ের চামড়া হইত তবে আমি উহা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতাম। আমার বাল্যবন্ধু বরিশাল হিন্দুসমাজের প্রচারক সুবক্তা সুলেখক শ্রীযুক্ত শরদিন্দু মিত্র আমাকে জাতিভেদের পক্ষে অনেক কথা বলিতেন, তাঁহার কথা আমার কর্ণে প্রবেশও করিত না, কেন না জাতিভেদের পক্ষে যে কোন যুক্তি থাকিতে পারে ইহা অসম্ভব মনে হইত। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় জাতিভেদের বিরুদ্ধে 'জাতিভেদ' নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সেই পুস্তকের যুক্তিগুলি অখণ্ডনীয় বলিয়া ভাবিতাম। জাতিভেদ দেশের ও সমাজের অনিষ্টকর সুতরাং জাতিভেদ পাপ, পাপ থাকিতে পরিত্রাণ নাই; অতএব জাতিভেদ পরিত্রাণ-বিরোধী, মনের ভাব এইরূপ হইয়া উঠিল এবং বিদ্রোহী মন জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

বুঝিলাম সাধারণতন্ত্র-প্রণালীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালী এবং সর্ব্ব-প্রকারের কৃত্রিম বন্ধনকে ছিন্ন করাই স্বাধীনতা এবং মুক্তি। গুরুবাদ অত্যন্ত অযৌক্তিক। যে ঈশ্বর পক্ষীশাবকের ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে পান, ক্রিমি কীটের মর্ম্মবেদনা বুঝিতে পারেন, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন কি? ক্রমে ক্রমে আমার মতগুলি ব্রাহ্মসমাজের

মতের সঙ্গে মিলিয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে আমি কোন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের বক্তৃতা শুনি নাই, কলিকাতা কি ঢাকার কোন প্রচারকের সঙ্গে আলাপও করি নাই। ব্রহ্ম যখন সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বজ্ঞ তখন আমার অভাব কিসের? ভয়ই বা কিসের? এই ধ্যান ক্রমে ক্রমে এমন গভীর হইয়া উঠিল যে আমি আমাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ্ মনে করিতে লাগিলাম। ব্রাহ্মধর্ম্মের মতগুলি অত্যন্ত বিবেক-সংগত মনে করিলাম এবং ইহার বিরুদ্ধে পৃথিবীশুদ্ধ লোক তর্ক করিতে আসিলে তাহাদিগকে অনায়াসে পরাস্ত করিব এই সাহস জন্মিল। যাহা সত্য তাহাই গ্রহণীয়, যাহা অসত্য তাহা পরিত্যাজ্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্য, তাহাই গ্রহণ করিলাম, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম অসত্য, তাহা পরিত্যাগ করিলাম।*

পাঠক পাঠিকা, এতক্ষণ আমি আপনাদিগকে বড়ই জ্বালাতন করিয়াছি, যাঁহার জীবন-চরিত লেখা হইতেছে তাঁহাকে অনেকক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, আমার কথাই এতক্ষণ বলিলাম। কিন্তু আমার মনে হয় এতটুকু কথা না বলিলে মনোরমার সংসার-চিত্র একান্ত অস্পষ্ট থাকিত, তথাপি এই প্রগল্ভতার জন্য আমি ক্ষমা চাহিতেছি।

আমার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে আমার পরিজন ও বন্ধুদিগের মধ্যে বিশেষতঃ আমার শ্বশুরালয়ে একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়া গেল। আমাদের গ্রামে যাঁহারা আমার পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন তাঁহারাও দুঃখিত হইলেন, কেন না তাঁহারা দুকুল বজায় রাখিয়া চলাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিতেন। আমি অনানুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের শত্রু বলিয়া মনে করিতাম, কেন না তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে একই শরীরের দুইটি অঙ্গরূপে অভিন্ন বলিয়া জানিতাম।

আমি মনোরমাকে পত্রদ্বারা জানাইলাম যে আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ

* কালে মনুষ্যবুদ্ধির কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটে! এখন আমি মনে করি যে সামাজিক প্রণালীর মধ্যে হিন্দু জাতিভেদ প্রথাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী এবং গুরুকরণই ধর্ম্মলাভের সর্ব্বোত্তম উপায়।

করিয়াছি।× পত্রের উত্তরে তিনি আমার মতপরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কিছুই লিখিলেন না, কেবল একবার তাঁহাকে দেখা দিতে অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহার কথামত তাঁহাকে দেখা দিতে কুকুটীয়া গেলাম।

মেজদিদি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখিতা হইয়াছিলেন। একে ত মনোরমার প্রতি তাঁহার অতুল স্নেহ তাহাতে আমিও তাঁহার ভাই, তিনি এই আশা করিয়া আমাদের বিবাহ দিয়াছিলেন যে মনোরমার সহিত তাঁহার কখনো বিচ্ছেদ ঘটিবে না ; কেন না, তিনি তাঁহার সঙ্গে আমাদের বাড়ী আসিবেন এবং তাঁহার সঙ্গে কুকুটীয়া যাইবেন। বস্তুতঃ আমাদের বিবাহের পর হইতে সেইরূপই ঘটনা ঘটিতেছিল। আজ সকল আশাভরসাই ফুরাইল, কিন্তু এখনও মেজদিদি মৃতশরীরে জীবন সঞ্চারের আশায় আছেন, তিনি ভাবিয়াছেন মনোরমার প্রতি আমার যেরূপ ভালবাসা, তাহাতে যদি তিনি তাঁহাকে বশীভূত রাখিতে পারেন তবে আমাকে ফিরাইতে পারিবেন।

এবারে আমার কুকুটীয়া যাওয়ার দুই মাস পূর্ব্বে আমার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন জন্মগ্রহণ করিয়াছে। একজন পুরমহিলা আমার কাছে সেই শিশুটীকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন এবং বলিলেন, "এই সকলের মায়ার বন্ধন তুমি কিরূপে ছিঁড়িতে চাও?" মেজদিদি এবং পরিবারস্থ লোকেরা আমার মতপরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কোনো কথাই আমার নিকট উপস্থিত করিলেন না, যেন কিছুই ঘটে নাই। দুই তিন দিন গত হইল, মনোরমা আমার কাছে কোনো কথাই তুলেন নাই, সেই সরলতা, সেই সহাস্যমুখ, সেই অনুরাগ, কিছুরই পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। আমি যখন ছাদে বসিয়া উপাসনা করিতাম, মনোরমা নয়ন মুদ্রিত করিয়া নিবিষ্ট মনে আমার সঙ্গে বসিতেন, সে পবিত্র মুখ এখনো আমার মনে পড়িতেছে। তাঁহার সঙ্গে উপাসনায় বসিলে আমার মনে হইত, যেন আমি কোনো এক দেবীর সঙ্গে কোনো তপোবনে তপস্যা করিতেছি।

× ব্রাহ্মসমাজে আমি কাহারো দ্বারা দীক্ষিত হই নাই।

কয়েকদিন এইভাবে চলিয়া গেল, একদিন মনোরমা আমাকে বলিলেন, "তুমি কি তোমার এই মত পরিবর্ত্তন করিতে পার না?" আমি বিস্ময়ের সহিত তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলাম, "তুমিই কি এই কথা বলিলে?" অমনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "না, তোমাকে এই কথা বলিতে সকলে আমাকে অনুরোধ করিয়াছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি আমাকে কি করিতে বল?" তিনি বলিলেন, "তুমি যাহা ভাল বুঝিয়াছ তাহার উপর আমার কিছু বলিবার নাই।" এই কথাটা যে প্রাণের সহিত বলিলেন আমি অনায়াসে তাহা বুঝিলাম। এতদিন হইতে দেখিয়া আসিতেছি, মনোরমা 'আত্মসুখ' বলিয়া কিছু হাতে রাখেন নাই, তিনি তাঁহার সমস্ত সুখশান্তি পতিচরণে অর্পণ করিয়াছিলেন, হাতের পাঁচ হাতে রাখেন নাই। আমি যাহাতে সুখী হই তাহা ব্যতীত তাঁহার অন্য সুখ ছিল না। তাঁহার চরিত্র দেখিয়া দেখিয়া আমি একবার লিখিয়াছিলাম যে, "আমার পলাশে যে গোলাপ-গন্ধ পায়"। আমি যে কোনো অন্যায় কাজ করিতে পারি, এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল না। গুরুজনদিগের অত্যন্ত অনুরোধে আমাকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা যে তাঁহার নিজের অনুরোধ নহে, একথা বলিতে তিনি তিলমাত্রও বিলম্ব করিলেন না। "স্বামী আমার বশীভূত, আমি তাঁহাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিব" এতটা দম্ভের ভাব তাঁহার মনে ছিল না, সুতরাং তিনি অন্যের অনুরোধটী জানাইয়াই খালাস হইলেন। আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম, এবিষয় লইয়া আমাদের দুজনার মধ্যে আর কখনো আলোচনা হয় নাই।

ধর্ম্মপ্রচার

অচিরকালমধ্যেই আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইলাম। বরিশাল-ব্রাহ্মসমাজ আমাকে প্রচারক মনোনীত করিলেন। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, প্রাণপণে তাহা প্রচার করিতে হইবে ইহাই স্থির

করিলাম। আমার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ লইয়া বরিশালে খুবই আন্দোলন হইয়াছিল এবং এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ অল্পকালের মধ্যে কয়েকটী উৎসাহী যুবক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। বরিশাল-ব্রাহ্মসমাজে এই সময়ে একটী নূতন উৎসাহের স্রোত আসিয়া পড়িল। আমার প্রচারের বিবরণ এস্থলে বর্ণনা করা হইবে না, কেবল এইমাত্র বলিতে পারি, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তখন কোনোপ্রকার ক্লেশস্বীকার করা কিংবা স্বার্থত্যাগ করাই আমি কষ্টকর মনে করিতাম না। খৃষ্টানদিগকে ব্রাহ্ম করিতে গিয়া আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে আধফুট জল ও দেড়ফুট কাদার মধ্যে বিলাঞ্চলে হাঁটিয়া বেড়াইতে হইত, হাতে লাঠি করিয়া পা টানিয়া টানিয়া তুলিয়া একমাইল যাইতে দুঘণ্টার উপরে সময় লাগিত, পকেটে কুইনাইন থাকিত, কাদা ভাঙ্গিয়া রাস্তা হাঁটিতাম এবং জ্বর হওয়ার আশঙ্কায় মাঝে মাঝে কুইনাইন খাইতাম।

এই সময়ে বরিশালে দুইটী বিশেষ কার্য্য চলিতেছিল এবং বলিতে গেলে সমগ্র সহরের লোকের চিত্তই সেদিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। একটী কার্য্য রোগীর শুশ্রূষা, দ্বিতীয়টী প্রেততত্ত্বের অনুশীলন। রোগীর শুশ্রূষার জন্য যে দল গঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের লোকই অধিকাংশ, বলিতে গেলে ব্রাহ্ম এবং অর্দ্ধব্রাহ্ম ব্যক্তিগণই এই দলের সর্ব্বস্ব ছিলেন। অর্দ্ধব্রাহ্মদিগের মধ্যে স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রধান ছিলেন। যখন ওলাউঠারোগ সহরে ও সহরতলীতে সংক্রামক হইয়া উঠিল, তখন এই দলের লোকেরা যেভাবে রোগীদিগের সেবাশুশ্রূষা ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিয়াছেন সেরূপটী কোথাও লক্ষিত হয় নাই। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি গৃহস্থ, কি আশ্রয়হীন, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কেহই এই সেবকদলের নিকট উপেক্ষিত হয় নাই। ওলাউঠা হাঁসপাতালেও ইঁহারাই শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এদলে এমন কেহ ছিলেন না যিনি নিজের হাতে ওলাউঠা রোগীর মল ও বমি পরিষ্কার করিতে ভয় কিম্বা ঘৃণাবোধ করিতেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের বৃদ্ধ আচার্য্য পরমভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ও স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ রাজকুমার ঘোষ প্রভৃতি যে ভাবে মল ও বমি পরিষ্কার করিয়াছেন, দেখিয়া মনে হইত তাঁহারা যেন রোগীর মলকে চন্দন জ্ঞান করিতেছেন। যখন মারি ভয়ের ভয়ে সমগ্র সহর সন্ত্রাসিত, যখন লোকেরা পীড়িত আত্মীয়স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছিল, সেই সময়ে এই দলের লোকেরা এমনভাবে মৃত্যুভয়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে রোগীদিগের সেবা করিতেছিলেন যে, তাহা দেখিয়া জীবনভয়ে একান্ত ভীত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও সাহসের সঞ্চার হইয়াছিল। সহর হইতে দুই মাইল দূরে কোনো গ্রামে এক ধোপাবাড়ীতে চারিজন লোকের ওলাউঠা হয়, এই দলের একজনমাত্র সেবক সারারাত্রি সেখানে থাকিয়া একাকী নির্ভয়চিত্তে এই সকল রোগীর সেবাশুশ্রূষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। একজন খোট্টা ফেরিওয়ালা ওলাউঠারোগে আক্রান্ত হইয়া কয়লাঘাটা নামক স্থানে নদীতীরে নিরাশ্রয় পড়িয়া আছে জানিতে পারিয়া, আর একজন সহযোগীকে সঙ্গে করিয়া আমি সেখানে গেলাম, আমার সহযোগী আমাকে কিছুই করিতে দিলেন না, সমস্ত কার্য্যই নিজে করিলেন, আমি শুধু তাঁহার সঙ্গে রাত্রি জাগিয়া থাকিলাম, কিন্তু আমার মনে হইতে লাগিল, এই সংসার-মহাশ্মশানে আমরা যেন মহাতপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছি। কি আশ্চর্য্য নির্ভীকতা, কি অপূর্ব্ব আত্মতৃপ্তি ভগবানের কৃপারূপে এই সেবকদলের উপর বর্ষিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়াও আজ আনন্দে হৃদয় অভিভূত হইতেছে। একদিন একটা প্রকাণ্ড বাড়ীতে ওলাউঠা লাগিল, বাড়ীর সমস্ত লোক দুইটী রোগী ফেলিয়া পলায়ন করিল। অশ্বিনীকুমার, বরদাপ্রসন্ন রায়, রাজকুমার ঘোষ এবং আমি সংবাদ পাওয়ামাত্র সেখানে উপস্থিত হইলাম। রোগীদিগের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ একজন কায়স্থ। সারারাত্রি আমরা তাঁহাদের সেবা ও চিকিৎসা করিলাম, শেষরাত্রে কায়স্থটীর অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। তাঁহার বয়স ৫০ বৎসরের অধিক, কিন্তু অল্পদিন হইল তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন,

সুতরাং জীবনের মায়া বাড়িয়া গিয়াছে। যখন তাঁহাকে ঘন ঘন ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলাম, তখন জীবনের আশা অল্প জানিয়া তিনি যেসমস্ত কথা বলিতে লাগিলেন, আজিও আমার হৃদয়ফলকে সেসকল মুদ্রিত আছে। রজনী প্রভাত না হইতেই তাঁহার জীবনলীলা সাঙ্গ হইল, ব্রাহ্মণ রোগীটি বাঁচিয়া উঠিলেন। অশ্বিনীকুমার সকলের সহিত থাকিয়া কেবল যে রোগীর সেবা করিতেন তাহা নহে, তিনি আপনার স্বাভাবিক প্রফুল্লভাবটী দলের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া সকলকে সজীব রাখিতেন।

অনেকেই এইরূপ সেবায় প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়াছিলেন। সকলের নাম লিখিলে অনেক লিখিতে হয়, কিন্তু একজনার নাম না লিখিলে আমার অপরাধ হইবে, তাঁহার নাম ছাপার অক্ষরে উঠিবার আর সম্ভাবনা দেখি না। গরীবের কথা কে লেখে? যাঁহার কথা বলিতেছি সমাজের লোকেরা সেরূপ ব্যক্তিকে নগণ্য লোক মনে করে, কেন না তাঁহার পাণ্ডিত্য কিম্বা ধনসম্পদ্ নাই, কিন্তু আমার বিবেচনায় এইরূপ লোক সমাজের ভূষণস্বরূপ। ইঁহার নাম প্রসন্ন কুমার দাস। এই নামে প্রায় কেহই তাঁহাকে ডাকিত না, সহরের অনেকে তাঁহাকে 'জামাই' বলিয়া ডাকিত, কেন না তিনি একজন প্রাচীন স্কুলমাষ্টারের জামাই; কিন্তু তাঁহার বিশেষ নাম হইয়াছিল 'সদানন্দ ঢোল', এই নামটি আচার্য্য মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত। নামটির বিশেষ সার্থকতা আছে। যখনই তাঁহাকে দেখিবে, তখনই দেখিতে পাইবে তাঁহার গালপোরা পান ও গালভরা হাসি; চর্ব্বিত তাম্বুলরস ওষ্ঠাধর প্লাবিত করিয়া হাসির সঙ্গে মিশিয়াই আছে। কিছু জিজ্ঞাসু হইলে একদফা ঢোক গিলিয়া, তাম্বুলরসকে হজম করিয়া, কথার সহিত হাস্যরসকে বাহির করিয়া দিত। কেহ কখনো তাঁহার মলিনমুখ দেখে নাই, এইজন্য তাঁহার উপাধির প্রথম অংশ হইল 'সদানন্দ'। তাঁহার চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, সহরে যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহা জানিতে হইলে তাঁহার কাছে সকলই পাইবে; নূতন কোনো

ঘটনা ঘটিলে সদানন্দ সংবাদ লইয়া বাহির হইবে, রাস্তায় যাহাকে পাইবে বলিবে এবং পরিচিত লোকের বাড়ী বাড়ী যাইয়া বলিবে; এইজন্য তাহার উপাধির শেষ অংশ হইল 'ঢোল' অর্থাৎ ঢেড়া দেওয়ার কার্য্য তাহার দ্বারাই হইত। সদানন্দের সঙ্গে রোগীর পার্শ্বে বসিয়া আমি অনেক রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি, সেরূপ প্রাণ দিয়া রোগীর সেবা করিতে আমি অন্য কাহাকেও দেখি নাই। আজ তাহার কথা লিখিতে লিখিতে আমার চক্ষে জল আসিতেছে। হে আমাদের দুঃখী বন্ধু সদানন্দ, জানি আমি তুমি এই আড়ম্বরপূর্ণ জগতের চক্ষে অতি নগণ্য ব্যক্তি, কিন্তু নিশ্চয় জানিও এমন স্থান আছে, যেখানে ধনগর্ব্বী, জ্ঞানগর্ব্বী ও ধর্ম্মগর্ব্বীদিগের মাথার উপরে তোমার জন্য দিব্যধাম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

একটি কথা বলিতে অবশিষ্ট রহিয়াছে; বরিশালের শ্রীযুক্ত তারিণীকুমার গুপ্ত, কুঞ্জলাল সান্যাল, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি ডাক্তারগণ সংবাদ পাওয়ামাত্র উপস্থিত হইয়া সযত্নে রোগীদিগের চিকিৎসাকার্য্য করিতেন, তাঁহারা সাধারণের অতীব ধন্যবাদের পাত্র।

আজি পূর্ব্বকথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় ভাবের স্রোত আসিয়া সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিতেছে, কিন্তু এ পুস্তকে এসকল কথার আর অধিক বিস্তৃতি করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। এইমাত্র বলিতে পারি, এই সেবকদলের লোকেরা কোনো রোগীর বাড়ী উপস্থিত হইলে বাড়ীর লোকেরা আপনাদিগকে নিশ্চিন্ত মনে করিত এবং রোগী স্বয়ং যেন মৃতদেহে জীবন পাইত। অচিরকালমধ্যে এই সেবাব্রতের পুণ্যস্রোত সমস্ত দেশ প্লাবিত করিল, স্থানীয় হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভ্যগণও এই পুণ্যব্রতে দীক্ষিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে বসন্ত সমীরের ন্যায় এই পুণ্য সমীরণ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। বরিশাল জেলার অধিকাংশ গ্রামে ক্ষুদ্র বৃহৎ সেবকসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। লোকের ভয় ভাঙ্গিয়া গেল। আমার মনে হয় এখন আর বরিশাল জেলার কোন গ্রামেই কোনো রোগী সেবাশুশ্রূষার অভাবে ক্লেশ পায় না।

একযোগে রোগীদিগের সেবাশুশ্রূষা ব্রতে ব্রতী থাকিয়া আমার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বেই আমি ব্রাহ্মদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, পরে সেই আকর্ষণ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল।

প্রেত-তত্ত্ব

বরিশালে প্রেত-তত্ত্ব অনুসন্ধানের আমিই মূল কারণ ছিলাম। বাল্যকাল হইতেই পরলোকবাসীদিগকে দেখিতে আমার প্রবল ইচ্ছা। কয়েক বৎসর এই ইচ্ছা চাপা ছিল, ধর্ম্মচিন্তার সঙ্গে আবার সেই পুরাতন চিন্তা জাগিয়া উঠিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, মৃত্যুর পরে আত্মা থাকে, সে আত্মা শুধু জ্ঞান প্রীতি ও ইচ্ছাদ্বারা গঠিত। এ কথাটা আমার প্রাণে কখনো ভাল লাগে নাই। শুধু জ্ঞান প্রীতি ও ইচ্ছা, অবলম্বন বিহীন হইয়া কিরূপে থাকিত পারে, তাহা আমি ভাবিতে পারিতাম না। এ বিষয় লইয়া যাঁহাদের সঙ্গে আলোচনা করিতাম, তাঁহাদের কথায় আমার মনে হইত যেন এ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনো পরিষ্কার ধারণা নাই। কেহ কেহ বলিতেন, "উহা ভাবিয়া কি হইবে, যাহা আছে তাহা ত আছেই"। এ সকল কথা বড়ই ঔদাসীন্যপূর্ণ মনে হইত। এই জড়দেহ ত্যাগের পরে একটি প্রেতদেহ থাকে, সেই দেহ ধারণ করিয়া পরলোকবাসিগণ আমাদিগকে দেখা দিতে এবং আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে পারেন, এ বিশ্বাস আমার স্বাভাবিক ছিল। তখনকার অনেক ব্রাহ্ম মনে করিতেন, এরূপ বিশ্বাস ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী। আমি তাঁহাদের কথায় মনে মনে ভাবিতাম যাহা সত্য তাহাই তো ব্রাহ্মধর্ম্ম, সুতরাং ইহা কিরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী হইবে? বরিশালের ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটী প্রচলিত মতের বড়ই গোঁড়া ছিলেন, আমিও কাহারো অপেক্ষা কম গোঁড়া ছিলাম না, কিন্তু পরকাল সম্বন্ধীয় মতে আমি স্বতন্ত্র ছিলাম, ইহা লইয়া আমাদের মধ্যে কখনো বিশেষ বিরোধ ঘটে নাই।

আমি মেস্‌মেরিজমের নামমাত্র শুনিয়াছিলাম, কাহাকেও কখনও একাজ করিতে দেখি নাই, কিন্তু অতি আশ্চর্য্যরূপে এই শক্তি আমাতে প্রকাশিত হইল। অচিরকালমধ্যে গোবিন্দ আমার মিডিয়ম হইল। এই গোবিন্দকে লইয়া যেসকল ঘটনা হইয়াছে, 'আশা-প্রদীপ' নামক গ্রন্থে আমি উহার কিয়দংশ প্রকাশিত করিয়াছি। প্রেত-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় সমস্ত সহর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। আমরা যে গৃহে এই বিষয়ের আলোচনা করিতাম, লোকেরা বাহির হইতে বাঁশ ফেলিয়া দিয়া ছাদ বাহিয়া আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিত। উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, অধ্যাপক প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর প্রধান প্রধান লোকেরা এই তত্ত্বান্বেষণে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহাতে যেসকল অদ্ভুত কার্য্য হইয়াছিল, তাহা 'আশা-প্রদীপ'এ উক্ত হইয়াছে। আমার মিডিয়ম গোবিন্দকে অল্‌কট সাহেব সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। কলিকাতার শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি নিজচক্ষে আমার মিডিয়ম গোবিন্দের আশ্চর্য্য কার্য্যকলাপ দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছেন।

প্রকৃতি ও আদর্শ

মেদিনীপুর হইতে চট্টগ্রাম এবং বরিশাল হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত অধিকাংশ স্থানে আমি ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, সে সমস্ত বিবরণ লিখিলে একখানা বড় পুস্তক হয়। সর্ব্বত্রই সাদরে গৃহীত হইতাম এবং আমার বক্তৃতা ও উপাসনাদ্বারা শ্রোতৃগণের মনও আকৃষ্ট হইত। কিন্তু অল্পকালমধ্যেই আমার মনের একটি পূর্ব্বভাব —যাহা এতকাল নিদ্রিত ছিল, হঠাৎ জাগিয়া উঠিল। বাল্যকাল হইতেই ধ্যান-ধারণার আমি পক্ষপাতী ছিলাম, কিন্তু আমার নিজের চিত্তকে এ সময়ে আমি সংযত করিতে পারিতেছিলাম না। আমার প্রকৃতি ও আদর্শ পরস্পর বিপরীত হইয়া উঠিল। বাল্যকালে

ধ্যান-ধারণা ও সমাধির কথা শুনিয়াছি, কিন্তু আমি সেসকল হইতে বঞ্চিত আছি। মনকে একস্থানে বাঁধিবার জন্য অনেক প্রকার কাল্পনিক পন্থা অবলম্বন করিলাম, অনেক প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু প্রাণ পূর্ণ হইল না। ভাবিলাম বুঝি সরল প্রার্থনা হইতেছে না, তখন যাহাতে সরল প্রার্থনা হয় তজ্জন্যও প্রার্থনা করিলাম, যে অস্ত্র হাতে ছিল তাহার সম্পূর্ণ ব্যবহার যথাসাধ্য করিলাম, কিন্তু যে বন্ধন কাটিতে চাহিয়াছিলাম তাহা কাটিল না।

কেহ যেন মনে না করেন যে, ব্রহ্মোপাসনায় কখনো আমার পাষাণ হৃদয় বিগলিত হয় নাই। কতদিন অশ্রুজলে ভাসিয়াছি এবং উপাসকমণ্ডলীও ভাসিয়াছেন। তাহাতে সাময়িক তৃপ্তি যথেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু আমি যে জিনিস চাহিতেছিলাম সে জিনিস তাহা নহে। এই সময়ে আর একটি বিঘ্ন উপস্থিত হইল। একদিন আচার্য্যের কার্য্য করিতে বেদীতে বসিয়াছি, ব্রাহ্মপ্রণালীক্রমে ভগবানের আরাধনা করিতেছি, 'সত্যংজ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম' বলিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিলাম কিন্তু আমার মন উপাসকমণ্ডলীর প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছিল, আমি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম, ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি, তবে এত উচ্চকণ্ঠে বলিতেছি কেন? সকলে মিলিয়া উচ্চকণ্ঠে স্তব পাঠ করা এক কথা, আর পরকে শুনাইয়া শুনাইয়া এরূপভাবে আরাধনা করা ভিন্ন কথা, এরূপ করা ঠিক নয় বলিয়া মনে হইল। ঠিক নয় তবে এতদিন কেমন করিয়া করিলাম? এতদিন ধরা পড়ে নাই, অভ্যাসবশতঃ করিয়াছি, বাধে নাই! আজ যখন ধরা পড়িয়াছে তখন আর এরূপ করা যায় না। উপাসনায় যদি গলদ থাকে তবে আমার ধর্ম্ম হইবে কিরূপে? কপটতা অপেক্ষা ধর্ম্মের অধিকতর শত্রু আর নাই। ইহার পূর্ব্বে আর একদিন একটি ঘটনা ঘটিল। বরিশালের উকীল শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গুপ্ত মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের একজন উপাসক; যদিও তিনি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম নহেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্ম অতি অল্পই দেখা যায়। একদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে

বলিলেন যে, "আচার্য্যগণ বেদী হইতে যাহা বলেন, তাহার প্রত্যেক কথাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়; যদি কোন আচার্য্য বলেন, 'এই ত ঈশ্বর বিদ্যমান আছেন' তখন আমরা মনে করি তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সে প্রত্যক্ষ কাল্পনিক বা দার্শনিক প্রত্যক্ষ নহে, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ।" কথাটা শুনিবামাত্র চকিতে আমার প্রাণের মধ্যে যেন একটা আলোক প্রবেশ করিল, আমি বুঝিলাম ধর্ম্মোপদেষ্টার কতদূর দায়িত্ব!

কিরূপে চিত্ত সংযত হইবে এই চিন্তাই আমার প্রধান চিন্তা হইল। গীতা পাঠ করিয়া দেখিলাম, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

হে কৃষ্ণ! মন চঞ্চল, বলবৎ, প্রমাথি ও দৃঢ়, তাহাকে নিগ্রহ করা বায়ুকে নিগ্রহ করার ন্যায় সুদুষ্কর।

অর্জ্জুনের উক্তি পড়িয়া বড়ই নিরাশ হইলাম। অর্জ্জুন অত্যন্ত সংযমী, তিনি জিতেন্দ্রিয়, অস্ত্রপরীক্ষার সময়ে ও দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় লক্ষ্যভেদ করিয়া তিনি চিত্তস্থিরতার অদ্ভুত পরিচয় দিয়াছেন, সেই অর্জ্জুনেরও এই উক্তি, তবে আমি কোথায় আছি? এই সময়ে একবার কলিকাতায় আসিলাম, মনের অভিপ্রায় এই যে, ব্রাহ্মসমাজের সাধকদিগের নিকট চিত্তসংযমের উপায় জিজ্ঞাসা করিব। একদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গত সভায় উপস্থিত হইলাম। সেদিনকার আলোচ্য বিষয় ছিল—'চিত্ত-সংযম', আমি ভাবিলাম, বুঝি ভগবান্ আমারই জন্য অদ্য এরূপ বিষয়ের অবতারণা করিলেন। কিন্তু আমার আশা পূর্ণ হইল না, সঙ্গত সভায় যেসকল কথাবার্ত্তা হইল তাহাতে কিছু উপকার পাইলাম না। কোন বৃদ্ধ ব্রাহ্ম আমাকে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন। হা অভ্যাস! তোমাকে কে অতিক্রম করিতে পারে? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কিরূপে চিত্তসংযম করিতে হয় তাহার উপায় আমিও কিছু বলিলাম। হে মনুষ্যপ্রকৃতি! তোমাকে বুঝা ভার।

অবসর বুঝিয়া হে দরিদ্র, তুমি ধনীর বড়াই করিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ কর না। কিন্তু নির্ধনের ধনগর্ব্ব বাহিরেই খাটে, আপনার জীর্ণ গৃহে প্রবেশ করিলে সে বড়াই আর থাকে না। আমি চিত্তসংযমের উপায় যাহা যাহা বলিলাম, অনেকে সেগুলিকে উত্তম বলিলেন, কিন্তু আমি আপনার দিকে তাকাইয়া আপনাকে আবার বুঝিলাম।

যখন মনের অবস্থা এইরূপ, তখন একদিন সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী বেড়াইতে গেলাম। নানাপ্রকার কথাবার্ত্তার মধ্যে তিনি আমাকে বলিলেন, "তুমি যেরূপভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছ তাহা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, কিন্তু আজকাল তোমার সেরূপ প্রফুল্লতা দেখিতেছি না কেন?" আমি তাঁহাকে আমার প্রাণের কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি আমাকে উপদেশ করিলেন যে, "তুমি ঢাকায় গোঁসাইজীর কাছে যাও, তিনি যখন একাকী ভজন করিবেন, তখন তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া বলিও যে, আপনি যাহা পাইয়াছেন তাহা আমাকে প্রদান করুন।" আমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না, একজন ধার্ম্মিক লোক একজন ধর্ম্মার্থীকে উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু তিনি এমন কি বস্তু দিতে পারিবেন যে আমি তাহা লইয়া কৃতার্থ হইব? গুরুবাদ ত আমার নিকট বিষম-কুসংস্কার, গুরুবাদ মানিতে গেলে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে হয়, বিশেষতঃ সর্ব্বপ্রকারের মধ্যবর্ত্তিতা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী। বস্তুতঃ আমার মনে হইল যে প্রচারক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এতকাল তর্কযুক্তি করিয়া এখন বোধ হয় কিঞ্চিৎ কুসংস্কারী হইয়া পড়িয়াছেন।

পূর্ব্ব স্মৃতি

যাহা হউক, তাঁহার কথায় একটি সৌম্যমূর্ত্তি আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইল। আমার বয়স যখন ২১।২২ বৎসর তখন আমারই

আমাদের ভাল ঘুম হয় নাই। যে যখন জাগিয়াছি তখনই দেখিয়াছি গোঁসাইজী বিছানায় আসন করিয়া এক কোণে বসিয়া আছেন, মনে হইল যেন একটি প্রস্তরমূর্ত্তিকে ঘরের কোণে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। তিনি সারারাত্রি শয়ন করেন নাই; পরে জানিলাম, তিনি অধিকাংশ দিনই এইরূপ ধ্যানে বসিয়া রাত্রি অতিবাহিত করেন, শয়নের জন্য বিছানা ঠিকঠাক করিয়া ভগবানের নাম করিয়া শয়ন করিবেন ভাবিয়া নাম করিতে বসেন, সেই ভাবেই রাত্রি কাটিয়া যায়। সাপুরের উৎসবের পরে এত বৎসরের মধ্যে আমি তাঁহাকে দেখি নাই, আজ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথায় সেই মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে উদিত হইল।

গোঁসাইসঙ্গ

গোস্বামী মহাশয়কে দেখিবার ইচ্ছায় আমি ব্যস্ত হইয়া ঢাকায় গেলাম, কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়া জানিলাম, বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দেখিবার জন্য তিনি বারদী গিয়াছেন, কবে ফিরিবেন ঠিক করিয়া কেহ বলিতে পারিলেন না। অনর্থক ঢাকায় বসিয়া থাকিয়া কি করিব? ভাবিলাম, যদি এতদূর আসিয়াছি, একবার মনোরমাকে দেখিয়া আসি। ঢাকা হইতে আমার শ্বশুরালয় কুকুটীয়া গ্রাম নৌকাযোগে ছয় সাত ঘন্টার পথ মাত্র। বলা বাহুল্য যে, প্রত্যাশার অতীতভাবে হঠাৎ আমাকে পাইয়া মনোরমা পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। যেদিন কুকুটীয়া পৌঁছিয়াছি, তাহার তৃতীয় দিবস রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলাম, গোঁসাইজী ঢাকায় আসিয়াছেন। স্বপ্নটা সত্য বলিয়াই বোধ হইল এবং ঢাকা রওনা হইলাম; পৌঁছিয়া দেখিলাম, স্বপ্ন সফল হইয়াছে, আমি যেদিন স্বপ্ন দেখিয়াছি গোঁসাইজী সেইদিনই ঢাকায় পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষু জুড়াইল।

এই সময়ে গোঁসাইজীর ধর্ম্মমত লইয়া ব্রাহ্মসমাজে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল, তিনি ব্রাহ্মসমাজে হিন্দু যোগ-প্রণালী ও গুরুবাদ প্রচার

করিতেছেন, পরলোকগত ব্যক্তিদিগকে তিনি দেখিতে পান এবং তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলেন, হিন্দু সাধুদিগকে চরণে পড়িয়া প্রণাম করেন, পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস করেন এবং সাকার উপাসনাকেও সমর্থন করিয়া থাকেন, এইরূপ অনেক কথা লইয়া অধিকাংশ ব্রাহ্মই তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরলোকগত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ ও তাঁহাদের কথাবার্ত্তাশ্রবণ-সম্বন্ধে আমার অবিশ্বাস ছিল না, কিন্তু অন্যান্য যেসকল মতের কথা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, সেসকল সম্বন্ধে আমার মত অন্যান্য ব্রাহ্মগণের মতের অনুকূলই ছিল, কেন না আমি খুবই গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিলাম। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার যে প্রয়োজন তাহা সিদ্ধ করিতে গোস্বামী মহাশয় ভিন্ন অন্যের আশ্রয় লইতে পারি এমন লোক দেখিতে পাইলাম না, তাই তাঁহার অন্যান্য মতামতকে একদিকে সরাইয়া রাখিয়া তাঁহার দিকেই আমার দৃষ্টি পড়িল। আর একটী ঘটনা দেখিলাম। ৺রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয় পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক, তিনি খুব গোঁড়া ব্রাহ্ম, গোঁসাইজীর অভিনব মতগুলির সহিত তাঁহার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই, কিন্তু স্কুলের মাষ্টারীকার্য্য সারিয়া যতটুকু অবসর পাইতেন, তিনি নিয়মিতরূপে দুবেলা গোঁসাইজীর দক্ষিণপাশে মুদ্রিতনেত্রে বসিয়া থাকিতেন, চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত। একদিন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাঁহার সহিত গোঁসাইজীর মতের মিল নাই অথচ তিনি তাঁহার নিকট বসিয়া থাকেন কেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি তাঁহার নিকটে বসিয়া যে উপকার পাই, সে উপকারে আমি আমাকে বঞ্চিত করিতে পারি না।" তাঁহার কথায় বুঝিলাম, তিনি ধর্ম্মমত অপেক্ষা ধর্ম্মজীবনের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা রাখেন।

এই সময়ে ঢাকা ব্রাহ্ম-সমাজে ধর্ম্মার্থী উপাসকের সংখ্যা খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। গোঁসাইজীর সঙ্গ করিতে, তাঁহার উপাসনা ও উপদেশ শুনিতে হিন্দু, খৃষ্টান ও মুসলমানগণও আসিতেন। প্রচারাশ্রমে সারাদিন ধর্ম্মের হাওয়া বহিত। পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, বাজে কথা, গ্রাম্য

আলাপ সেখান হইতে উঠিয়া গিয়াছিল। একটী প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড অহোরাত্র প্রজ্বলিত থাকিয়া যেমন শীতার্ত্ত ব্যক্তিদিগকে উত্তাপ প্রদান করে, গোঁসাইজী স্থির আসনে উপবেশন করিয়া সেইরূপ সকলকে ধর্ম্মতেজ দান করিতেছিলেন। তখন তাঁহার সন্ন্যাসীর বেশ। শুনিলাম তিনি কোনো সন্ন্যাসীর নিকট রীতিমত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ডাক্তার পি, কে, রায় মহাশয় পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রাহ্ম-সমাজের সভাপতি ছিলেন। তিনি উদ্যোগ করিয়া একটী ধর্ম্মালোচনী সভা গঠিত করিলেন, আমি উহার সম্পাদক মনোনীত হইলাম। যেসকল বিষয়ের আলোচনা হইত, তন্মধ্যে গোঁসাইজীর উক্তিগুলি আমি লিখিয়া রাখিতাম, কিন্তু এ সভা বেশী দিন টিকে নাই। বুঝিলাম এইরূপ আলোচনায় যোগদান করিতে তাঁহার তেমন প্রবৃত্তি ছিল না।

একদিন ব্রাহ্ম-সমাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ গোঁসাইজীকে একটী বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলেন, তিনিও স্বীকৃত হইলেন। যথাসময়ে উপাসনামন্দির লোকে পরিপূর্ণ হইল। তিনি বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বক্তৃতার মধ্যে যখন ভগবানের মহিমা বর্ণনা আরম্ভ হইল, তখন তিনি বাহ্যস্ফূর্ত্তিরহিত হইয়া গেলেন। তাঁহার স্থিরচক্ষু সম্পূর্ণ পলকহীন হইয়া গিয়াছে, নয়নতারা লক্ষ্যহীন হইয়া একদিকে পড়িয়া রহিয়াছে, স্পষ্টই দেখা গেল, যাঁহার সেই চক্ষু তিনি চক্ষুতে উপস্থিত নাই। ক্রমে স্পন্দহীনশরীর হেলিতে লাগিল, তখন একজন উপাসক পশ্চাৎদিকে যাইয়া দুই হাতের ঠেক দিলেন। বহুক্ষণ অতীত হইয়া গেলে হঠাৎ বাহ্যজ্ঞান হইল, তখন তিনি মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত 'নমস্তে সতেতে' স্তব পাঠ করিয়া এবং বারংবার 'হরিওঁ হরিওঁ' ও 'শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ' বলিয়া বক্তৃতামঞ্চ হইতে নামিয়া পড়িলেন। শ্রোতৃবর্গ এতক্ষণ নীরব ও নিস্তব্ধ থাকিয়া বিস্ময়ের সহিত এই নির্ব্বাক্ বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছিলেন। গোঁসাইজী

মন্দির পরিত্যাগ করিলে তাঁহারাও একে একে চলিয়া গেলেন। সকলেই গম্ভীর ও নীরব, কাহারো মুখে কথা বা গমনে চপলতা লক্ষিত হইল না।

এই সময়ে তাঁহার দৈনিক কার্য্য যাহা দেখিয়াছি সংক্ষেপে তাহা লিখিতেছি। প্রাতে মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া নীচের ঘরে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে আসিয়া বসিতেন। একই স্থানে একই আসনে সর্ব্বদা বসিতেন, কখনো তাঁহাকে স্থান কি আসন পরিবর্ত্তন করিতে দেখি নাই, তবে যখন ঘরের বাহিরে কোথাও যাইতেন, কি মন্দিরে উপাসনা করিতেন তখনকার কথা স্বতন্ত্র। তিনি স্বস্তিকাসনে স্থিরভাবে বসিতেন। দেখিলাম, তাঁহার আসন স্থির ও শরীর চাঞ্চল্যবিহীন। দৃষ্টি প্রায় সকল সময়েই নিম্নদিকে নিবদ্ধ থাকিত। এমন কি যখন কথা কহিতেছেন, কি কোন উপদেশ দিতেছেন তখনও শ্রোতাদিগের মুখের দিকে চাহিতেন না। ডুবুরি যেমন অগাধ জল হইতে মণিমুক্তা তুলিয়া উপরিস্থ লোকদিগকে উপহার দেয়, সেইরূপ প্রত্যেকটি কথা সুগভীর অন্তরতল হইতে তুলিয়া আনিয়া সকলকে উপহার দিতেছেন। তাঁহার বাক্যে চাপল্যের লেশমাত্র নাই, সাধারণ কথাও এমন করিয়া বলিতেছেন, শুনিয়া মনে হয় যেন কি একটা মিষ্টরস সম্ভোগ করিতে করিতে কথা কহিতেছেন। বাক্যমালার প্রত্যেকটি শব্দ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নির্গত হইতেছে প্রত্যেকটি কথা যেন ঠিক ঠিক ওজন করা, তাহাতে একটিও অপ্রয়োজনীয় বা অতিরিক্ত শব্দ নাই। তাঁহার সম্মুখে একখানি ছোট কাষ্ঠাসনে কতকগুলি গ্রন্থ রহিয়াছে, প্রাতে উপাসনা ও তাহার পর গ্রন্থ পাঠ হইত, গোঁসাইজী নিজেই পাঠ করিতেন। নানাপ্রকার সংস্কৃত গ্রন্থ ব্যতীত তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ ও নানক সাহেবের গুরুমুখী 'গ্রন্থ সাহেব' তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি নিজেই পাঠ করিতেন। তাঁহার গম্ভীর ও মধুর কণ্ঠ ভক্তিরসে ভারি হইয়া এমনই মাধুর্য্যময় হইত যে, শ্রোতৃগণ সকলেই নয়ন মুদ্রিত করিয়া একান্তচিত্তে সেই বাক্যামৃত পানে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন।

যে গৃহে তিনি বসিতেন সে স্থানে প্রবেশ করিলেই আপনা আপনি চক্ষু বুজিয়া আসিত, সে ঘরে যে ভগবানের পূজা হইতেছে, সত্য সত্যই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত।

আহারান্তে গোঁসাইজী পুনরায় আসিয়া আসনে বসিতেন, এবং ধ্যানে ও পাঠে তিন চারি ঘণ্টা অতিবাহিত করিতেন। এই সময়ে যাহাদের স্কুল কিম্বা আফিস নাই এমন ছুই চারিজন লোক কাছে থাকিয়া তাঁহার সঙ্গসুখ উপভোগ করিত, আমিও এই সুখের অংশ লাভ করিতে লাগিলাম। অপরাহ্ণে আবার লোকসমাগম হইত, তখন নানাপ্রকার ধর্ম্মালাপ হইয়া, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে খোল করতাল সংযোগে প্রাঙ্গণে কীর্ত্তন আরম্ভ হইত। "অখিল তারণ ব'লে একবার ডাক তাঁরে। ডাক তাঁরে ভক্তসঙ্গে, ভাসি সবে প্রেম-তরঙ্গে, হরিবোল হরিবোল ব'লেরে" যখন এই গানটি জমিয়া যাইত এবং গোঁসাইজী ঊর্দ্ধহস্তে উচ্চকণ্ঠে হরিনামের ধ্বনি করিয়া মত্ত-সিংহের ন্যায় দণ্ডায়মান হইতেন, তখন সকলের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত। তাঁহার শরীরে যখন স্বেদ পুলক অশ্রু কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হইত, তখন সকলে নির্ন্নিমেষনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিত, এবং তিনি যখন নামানন্দসুধাপানে মত্ত হইয়া নানাভাবে নৃত্য করিতেন, তখন মনে হইত যেন সেই প্রাঙ্গণভূমিটী জীবজন্তু, বৃক্ষলতা সমস্ত লইয়া ব্রহ্মানন্দে নৃত্য করিতেছে। সকলের হৃদয়ে কি যে একটা ভাবের তরঙ্গ খেলিত তাহার বর্ণনা করিতে আমার শক্তি নাই। বস্তুতঃ "ডাক তাঁরে ভক্ত সঙ্গে ভাসি সবে প্রেম-তরঙ্গে" এই সঙ্গীতের সার্থকতা মূর্ত্তি ধরিয়া আবির্ভূত হইত। নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার দাঁড়াইয়া সমাধি হইত, নিস্পলক স্থির নেত্র নির্ম্মুক্ত আকাশে নিবদ্ধ থাকিত এবং মুখশ্রী একেবারে বদলাইয়া যাইত, মনে হইত যেন সে দেহে জীবনের সঞ্চার নাই। অনেকে মিলিয়া উচ্চকণ্ঠে হরিনাম করিলে আবার বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইত। তখন তিনি করুণ কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতেন, সেই ধ্বনি উপস্থিত নরনারীদিগের 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ

করিত এবং সকলকে আকুল করিয়া তুলিত।* অনেক বার অনেককে সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতে দেখিয়াছি, সেসকল দেখিয়া নৃত্যের প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মে নাই, কিন্তু গোঁসাইজীর নৃত্য সেরূপ নহে, ইহা এমনই একটা খাঁটি জিনিস যে, আমার প্রাণ কিছুতেই ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারিল না। তাঁহার আসন উপবেশন, কথাবার্ত্তা, পাঠ উপাসনা, কীর্ত্তন নর্ত্তন, আচার ব্যবহার এবং ভাব ভঙ্গী সমস্তই অকৃত্রিম, সমস্তই শান্তভাবে পরিপূর্ণ মনে হইল।

সন্ধ্যার পরে প্রতিদিন তাঁহার গৃহে ভজন হইত, তখন তিনি নিজে সকলের সঙ্গে ভজন-সঙ্গীত গান করিতেন।

গোঁসাইজীর আচার ব্যবহার ও কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে হইল, তাঁহার অন্তরে একটি একটানা স্রোত সর্ব্বদা ছুটিয়া চলিয়াছে। বাহিরের কার্য্যগুলি উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। একটি পর্ব্বত-বাহিনী নদী আপনার মনে আপনি নিরবচ্ছিন্নভাবে একই স্রোতে সাগরের দিকে গা ঢালিয়া দিয়া চলিয়াছে, বিচিত্র বীচিমালা, নানাবিধ ছায়া ও তরণীশ্রেণী উপরে উপরে নাচিতেছে, খেলিতেছে, ভাসিতেছে, কিন্তু ভিতরে সেই একই স্রোত একই টানে অবিশ্রান্ত প্রবাহিত, বাহিরের বিচিত্র কার্য্যকলাপ সেই একনিষ্ঠ ভাবস্রোতের কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিতেছে না। এরূপ দোতলা মানুষ আমি এই প্রথম দেখিলাম।

গোঁসাইজীকে দেখিয়া আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইল, মনের উদ্বেগ অনেকটা কমিয়া গেল, কিন্তু তাঁহার কয়েকজন অনুগত অনুচরের ব্যবহারে আমি বড়ই বিরক্ত হইলাম। উক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অব্রাহ্ম প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিতেন এবং সময়ে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের কম্পাউণ্ডের মধ্যে এমন কার্য্য করিতেন যাহা সেখানে হওয়া উচিত নয়। এ সকল আমার ভাল লাগিত না।

*কখন কখন কীর্ত্তনান্তে সমাধিভঙ্গ হইলে মাটিতে বসিয়া বিড়বিড় করিয়া কি কথা বলিতেন তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইত না।

কিছুদিন পরে কোন বিশেষ কারণে আমাকে বরিশালে ফিরিতে হইল। গোঁসাইজীকে আমার মনের কথা কিছুই বলা হইল না। দুইটি কারণে বলিলাম না। প্রথম কারণ এই যে, আমি যে অশান্তি প্রাণে লইয়া ঢাকায় গিয়াছিলাম; গোঁসাইজীর সঙ্গ পাইয়া সে অশান্তি অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল, দ্বিতীয় কারণ এই যে, তাঁহার অনুগত শিষ্যবর্গের অনেকের আচার ও বিশ্বাস আমার নিকট কুসংস্কার-দোষে দূষিত বোধ হইল। আমার মনে ভয় হইল, তাঁহার শিষ্য হইলে আমিও হয়ত এইরূপ কুসংস্কারী হইয়া যাইব। একদিকে গোঁসাইজীর প্রতি প্রাণের টান, অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি একান্ত ভালবাসা, এই উভয় আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া দুইটি বিপরীত স্রোতের সঙ্গমস্থল যেরূপ সর্ব্বদা তরঙ্গায়িত থাকে, সেইরূপ আমার হৃদয়ও তরঙ্গায়িত হইয়া রহিল। তথাপি বরিশালে যাইয়া পুনরায় উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

ইহার কয়েক মাস পরে একদিন হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গেল, গোঁসাইজী কলিকাতা হইয়া বাগেরহাট আসিয়াছেন, দুই একদিনের মধ্যেই বরিশাল আসিবেন। আমার হৃদয়-নিহিত প্রচ্ছন্ন-অগ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল, আমি দুই একদিন অপেক্ষা করিতে পারিলাম না, সেই দিনই বাগেরহাট রওনা হইলাম। তখন ৺জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় সেখানকার প্রথম মুন্সেফ। তিনি একজন বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ভক্ত-ব্রাহ্ম, তখন তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একখানি সটীক উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করিতেছিলেন, উক্ত কার্য্যে তাঁহাকে বহু অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করিতে হইয়াছে, তখন উক্ত গ্রন্থের সেরূপ উৎকৃষ্ট সংস্করণ আর বাহির হয় নাই। গোঁসাইজী জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলেন। তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া আমার প্রাণ জুড়াইল।

মন পরিবর্ত্তন

ঢাকায় গোঁসাইজীকে দেখার পর হইতে আমার ভিতরে ভিতরে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন আসিতেছিল। আমি বুঝিলাম, নিরাকারের সাকার মূর্ত্তি চাই, কেবল উদ্দেশ্য-পূজায় প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না। ভক্তিকে জানিতে হইলে ভক্তের মধ্য দিয়াই জানিতে হইবে, ভক্ত ভিন্ন ভক্তির অন্য মূর্ত্তি নাই। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম এ সকল তত্ত্ব, জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্ম্মীতেই বিকশিত। সুন্দরকে ছাড়িয়া সৌন্দর্য্যকে বুঝা একটা কথার কথা, দেখা ত যায়ই না। যাহারা ইহা না বুঝে তাহারা নিরাকারের সাকার মূর্ত্তি দেখিতে পায় না। আমার মনের ভাব তখন এরূপ নহে যে, আমি নিরাকার ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে সাকার পদার্থের উপাসনা করিব ; তবে ভাবভক্তি, জ্ঞান সৌন্দর্য্য, সকলেরই যে সাকার মূর্ত্তি আছে এইটি আমি বুঝিলাম। বুঝিলাম কথার অর্থ এই যে, প্রাণের মধ্যে গাঢ়রূপে অনুভব করিলাম। মনে মনে সাবধান রহিলাম যে, কোনক্রমে যেন সাকার উপাসক না হইয়া পড়ি।

গুরুবাদ মানিলাম এবং এই তত্ত্বকে যুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিলাম, নতুবা যে জ্ঞানাভিমানে আঘাত পড়ে। আমাদের হৃদয় পরাস্ত হওয়ার পাত্র নয়, যদি জ্ঞানকে এ রাজ্যে বসবাস করিতে হয়, তবে হৃদয়ের সঙ্গে সন্ধি না করিয়া তিনি মাথা রাখিবার স্থান করিতে পারেন না। কাজেই তাঁহাকে একটা মিটমাট করিয়া লইতে হয়। আমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে আমি মেস্‌মেরিজম্ রূপ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিলাম। মনে হইল, সে পথ এত প্রশস্ত যে চক্ষু বুজিয়া চলিলেও খানায় পড়িতে হয় না, এবং এমনি আবর্জ্জনাশূন্য যে জগৎকে সে পথে ডাকিতে কিছুমাত্র আমার সঙ্কোচ নাই।

গুরুবাদ-তত্ত্ব

আমি দেখিলাম, আমি স্বাধীন নহি, একটা ভ্রান্ত স্বাধীনতা-জ্ঞান আমাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। রিপু, প্রবৃত্তি, স্বার্থ ও

কতকগুলি সংস্কার পঞ্চভূতের ন্যায় আমার ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়া আছে, তাহারা যে হুকুম করে, আমি তাহাই পালন করি, তাহারা নাচাইলে নাচি, হাসাইলে হাসি, কাঁদাইলে কাঁদি, মনে করি যেন আমি স্বাধীন ভাবেই সকল কার্য্য করিতেছি। বস্তুতঃ আমার সদসৎ সমস্ত কার্য্যেরই নেতা ঐ অসুরগুলা। সুতরাং আমি এক্ষণে ঈশ্বরের অধীন নই, গুরুর অধীন নই এবং স্বাধীনও নই। আমি নিজে মেস্‌মেরিজম্ জানি এবং ধূলা, জল, এমন কি বায়ু অবধি মেস্‌মেরাইজ্ করা যায়, তাহারও প্রমাণ আমি পাইয়াছি এবং শব্দ মেস্‌মেরাইজ্ হইতে পারে, ইহাও বিশ্বাস করি। যে সিদ্ধ-পুরুষের মন্ত্রে শক্তিসঞ্চারের ক্ষমতা আছে, তিনি যদি শক্তিসঞ্চার করিয়া আমাকে সিদ্ধমন্ত্র প্রদান করেন, তবে আমি ক্রমশঃ তাঁহারই সাধু ইচ্ছার বশীভূত হইব, তখন তাঁহার সাধু-ইচ্ছার প্রভাবে আমার কাঁধের ভূতের বোঝা নামিয়া যাইবে অর্থাৎ আমি রিপুর অধীনতা হইতে উদ্ধার পাইয়া গুরুর অধীন হইব। গুরু সর্ব্বদাই শিষ্যের মুক্তি বাঞ্ছা করিবেন, সুতরাং আমার ইচ্ছা, গুরুর ইচ্ছা ও ভগবানের ইচ্ছা একই হইবে, তখন সম্পূর্ণ ঈশ্বরের অধীন, সম্পুর্ণ গুরুর অধীন এবং সম্পুর্ণ স্বাধীন হইব, কেন না তখন তিনের ইচ্ছা একই ইচ্ছা হইবে। এখন আমি ঈশ্বরের অধীন নই, গুরুর অধীন নই, এবং স্বাধীনও নই, শুধু রিপুর অধীন।

আমি গোঁসাইজীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইলাম। এমন সত্যবাদী, অকপট, ভক্তি ও শক্তিশালী পুরুষ আর কোথায় পাইব? সকলকে ত বিশ্বাস করিয়া আত্মসমর্পণ করা যায় না।

———

গুরু করণ

বাগেরহাটে সেদিনকার রাত্রির উপাসনার পরে আমি গোঁসাইজীর নিকটে যাইয়া বলিলাম, "আমি আর অপেক্ষা করিতে পারি না।" তিনি উত্তর করিলেন, "কাল বরিশালে গিয়ে হবে।" পূর্ব্বে আমি

ইঙ্গিতেও কখনো তাঁহাকে জানাই নাই যে আমি তাঁহার নিকট দীক্ষা-প্রার্থী, বরঞ্চ তাঁহার শিষ্যবর্গের অনেক কাজের আমি প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি, কাজেই তাঁহার উত্তর শুনিয়া আমি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কিন্তু আশায় আমার প্রাণ ভরিয়া গেল। সে রাত্রিতে ভাল করিয়া নিদ্রা যাইতে পারিলাম না, কখন রাত্রি প্রভাত হইবে, কখন বরিশালে রওনা হইব, এই চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

ষ্টীমারের সমস্ত লোক সারাটা দিন গোঁসাইজীর কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। তিনি যখন চক্ষু বুজিয়া ধ্যাননিমগ্ন আছেন, ষ্টীমারের একজন ফিরিঙ্গী কাপ্তান অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এ-সাধু, কেত্তো দারু পিয়া?" গোঁসাইজী চক্ষু মেলিয়া সহাস্যে তাঁহার দিকে চাহিলেন এবং বলিলেন "তুম্হারা যিশুখ্রীষ্টভি এহি দারু পিতা থা।" বড়ই হাসির রগড় উঠিল, ফিরিঙ্গীটি বক্র দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা বরিশালে পৌঁছিলাম। গোঁসাইজীকে দেখিবার জন্য চারিদিক্ হইতে লোকের সমাগম হইতে লাগিল। রাত্রি দশটার পরে এক নির্জ্জন ঘরে তিনি আমাকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে বরিশালবাসী কোন লোক তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। আমার দীক্ষা গ্রহণের পর অল্পদিনমধ্যেই বরিশালের স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, ভক্ত জমিদার ৺রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী এবং রাখালবাবুর এক কন্যা, প্রসিদ্ধ উকিল নির্ম্মলচরিত্র স্বর্গীয় গোরাচাঁদ দাস, ভক্তবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসকগণ গুরুদেবের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। আমার দীক্ষাকালে তিনি অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া বলিলেন, "শ্রীগুরুদেব আপনাকে এই মন্ত্র প্রদান করিলেন।" আমাকে মন্ত্র এবং মন্ত্রার্থ বুঝাইয়া দিলেন, এক প্রকারের প্রাণায়াম শিক্ষা দিলেন,

এবং মাংস ও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে নিষেধ করিলেন। নিষেধ করিলেন কথাটা বলিলে ঠিক কথা হয় না, সেরূপ হুকুম করা তাঁহার রীতি ছিল না। তিনি বলিলেন, "এই সাধনপ্রণালীতে উচ্ছিষ্ট ও মাংস-ভক্ষণ নিষেধ।" মন্ত্রের সহিত আমার তখনকার ধর্ম্মমতের কোনো বিরোধ নাই দেখিয়া আমি পরম আনন্দিত হইলাম।

আমি মনোরমার জীবনচরিত লিখিতে বসিয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে কোথায় ফেলিয়া আমি কোথায় চলিয়া আসিয়াছি, ইহাতে পাঠক-পাঠিকা বিরক্ত হইতে পারেন, কিন্তু আমার দীক্ষাগ্রহণের সঙ্গে তাঁহার সমস্ত জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ, তাই আমাকে এতদূর আসিতে হইয়াছে, এখন আমি যত সংক্ষেপে পারি আমার কথা ফেলিয়া রাখিয়া তাঁহার কথা বলিতে চেষ্টা করিব। এখানে আমাকে বড়ই মর্ম্মবেদনা পাইতে হইবে। দীক্ষাগ্রহণের পরে শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে বরিশাল হইতে মাদারিপুর, মাণিকদহ ও কাকিনীয়া গিয়াছিলাম। কিরূপে প্রেমের তরঙ্গ ছড়াইয়া, বিষয়াসক্ত নরনারীগণের চিত্তকে ধর্ম্মের দিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, তিনি এই সকল দেশকে ভগবৎপ্রেমে ভাসাইয়াছিলেন, আজিও মানস-ক্ষেত্রে সেই প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া ডুবিয়া হৃদয় কিরূপ আনন্দে অভিভূত হয়, সেসকল পুণ্য কথা বলিতে এখানে আমাকে নিরস্ত হইতে হইল, যদি ভাগ্যে থাকে আর তাঁহার কৃপা হয় তবে ভবিষ্যতে সেসকল যথাসাধ্য লিখিয়া কৃতার্থ হইতে বাসনা রহিল।

মনোরমার দীক্ষাগ্রহণ

আমার দীক্ষাগ্রহণের পরে আমি দার্জ্জিলিং বেড়াইতে গেলাম, সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার ধর্ম্মপ্রচারে মনোযোগী হইলাম। দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। ভাদ্র মাসে কলিকাতায় আসিয়াছি, হঠাৎ একদিন গুরুদেবকে দেখিবার জন্য মনে অত্যন্ত ব্যাকুলতা উপস্থিত হইল। কতকগুলি কাপড়চোপড় ধোপার বাড়ী

ছিল, সেগুলি ফিরিয়া পাওয়ার জন্য কলিকাতায় দুতিন দিন অপেক্ষা করিতে পারিলাম না, সেই দিনই ঢাকায় চলিয়া গেলাম। সেখানে শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

জন্মাষ্টমীর উৎসব হইয়া গিয়াছে, দুই এক দিনের মধ্যেই মিছিল (procession) বাহির হইবে। ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল ভারত-বিখ্যাত, উহা দেখিবার জন্য বহু-দূরান্তর হইতে সহস্র সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। সে ব্যাপারটি যে কিরূপ বৃহৎ ব্যাপার, স্বচক্ষে না দেখিলে অনুমানে তাহার উপলব্ধি হয় না। কুকুটীয়ার একটি লোকের মুখে শুনিলাম, আমার শ্বশুরবাড়ীর অনেক স্ত্রীলোক ও পুরুষ এই সমারোহ দেখিবার জন্য ঢাকায় আসিয়াছেন এবং মনোরমাও তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছেন। আমি দেখা করিতে তাঁহাদের বাসায় গেলাম। মনোরমার এক খুল্লতাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন দত্ত তখন ঢাকায় চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন, ডাইলবাজারে তাঁহার বাসাবাড়ী, সকলে সেখানেই উঠিয়াছেন। আমাকে হঠাৎ উপস্থিত দেখিয়া তাঁহারা সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং একটু আশ্চর্য্যান্বিতও হইলেন। আমার শ্যালাজ সম্পর্কীয়া একজন পরিহাস-রসিকা প্রৌঢ়া আমাকে বলিলেন, "এতক্ষণে রহস্যটা বুঝিলাম।" তিনি নিশ্চয়রূপে বুঝিয়াছেন যে আমাতে ও মনোরমাতে লেখালেখি করিয়া জন্মাষ্টমী দেখার বন্দোবস্ত হইয়াছে। তাঁহার সিদ্ধান্তের প্রমাণস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন যে, "যে মনা (মনোরমা) জন্মেও কখনো কাহারও নিকট কোনো অভিলাষ প্রকাশ করে না, সে যে জন্মাষ্টমী দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ঢাকায় আসিয়াছে, ইহার কারণ অবশ্যই তোমাদের দুজনের মধ্যে মিলনের বন্দোবস্ত, নতুবা তুমিই বা এ সময়ে হঠাৎ এখানে আসিলে কেন?" আমি ভাবিলাম এইরূপই মানুষ মানুষের মন বুঝে, আমি কিন্তু মনোরমার ঢাকা আসার কোনো খবরই রাখি না।

হঠাৎ আমার মনে একটা চিন্তা উপস্থিত হইল। ভাবিলাম,

শ্রীগুরুদেব এখানে আছেন, দৈবক্রমে আমরা স্বামী স্ত্রী এখানে উপস্থিত হইয়াছি, এই দৈব ঘটনার কি কিছু অর্থ নাই? মনোরমা কি শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা পাইতে পারেন না? প্রবল চিন্তা মনকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া মনোরমাকে দেখা দিয়া আমি অবিলম্বে গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে জানাইলাম যে, ঘটনাক্রমে আমার স্ত্রী এখানে আসিয়াছেন, তিনি কি দীক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন? তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ তাহা হইবে।" উত্তর শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল, কেন না দেখিয়াছি তিনি অনেক প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং অনেককে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন, প্রার্থনা মাত্র অনুমতি অতি অল্প লোকই পাইয়াছেন। বিশেষতঃ বাহিরের দিক্ দিয়া দেখিলে আমার স্ত্রী সম্পূর্ণই তাঁহার অপরিচিতা, এ অবস্থায় অনুমতি পাইয়া কেনই বা আমার মনে আনন্দ না হইবে? কিন্তু আমার এই আনন্দ অল্পক্ষণের মধ্যেই বিষাদে পরিণত হইল। অন্য একটি চিন্তার ছায়া পড়িয়া আমার আনন্দভাবটীকে মলিন করিয়া ফেলিল। আমি ভাবিলাম এ কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার ত কোনই সম্ভাবনা নাই। আমার শ্বশুরবাড়ীর বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, যুবতী ও বালিকা, প্রায় সমস্ত স্ত্রীলোকই আসিয়াছেন, বিশেষতঃ আমার মেজদিদি সর্ব্বদা মনোরমার অভিভাবিকা, তিনিও সঙ্গে আছেন, এ অবস্থায় তাঁহাকে আমি কিরূপে অন্যত্র লইয়া আসিব? মেজদিদি যেমন প্রখরবুদ্ধিসম্পন্না তেমনই মনোরমা যাহাতে আমার সঙ্গে না আইসেন তজ্জন্য বিশেষ প্রযত্নপরা, তাঁহার চক্ষুকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার পাহারার মধ্য হইতে মনোরমাকে কোথাও লইয়া যাওয়া সহজ কর্ম্ম নয়। পাঠক পাঠিকা মনে করিতে পারেন যে, এ আবার কিরূপ কথা? স্বামী আপন স্ত্রীকে লইয়া যাইবেন তাহাতে আবার আশঙ্কা কি? আশঙ্কার কারণ ছিল। আমি তখন শ্বশুর পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করিতে ইচ্ছুক ছিলাম না সুতরাং আমাকে মিটমাট করিয়া চলিতে হইয়াছিল। আমি জানিতাম, আমি

নরকে গেলেও মনোরমা আমার সঙ্গ ছাড়িবেন না, সুতরাং এখন একটা বিবাদ বিসম্বাদ করার প্রয়োজন কি। এদিকে মেজদিদি যে শ্রীগুরুদেবের নিকট মনোরমার দীক্ষাগ্রহণপ্রস্তাবে রাজি হইবেন সে ত অসম্ভব কথা, এখন উপায় কি ? গুরুদেব বলিয়াছেন "তাহা হইবে," এখন যদি না হয় তবে ত তাঁহার কথা ব্যর্থ হইল। আমি গোপনে মনোরমাকে আমার মনের অভিলাষ জানাইলাম, তিনি বলিলেন "আমি ত কিছুই জানি না, তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব।" বস্তুতঃ মনোরমা তখন ঠাকুরের বিষয় কিছুই জানেন না। আমি আশা করিয়াছিলাম আমার প্রস্তাবে মনোরমা অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিবেন, কিন্তু তাহা না করিয়া বলিলেন, "তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব।" আমার প্রাণের আশঙ্কা আরও বাড়িয়া উঠিল, কেন না যাহার তেমন আগ্রহ নাই সে কি দীক্ষা পাইবে ? তাঁহার উত্তরটা অনুরোধে ঢেঁকী গেলার মতন মনে হইল। তথাপি আমার উৎসাহ ভঙ্গ হইল না। এখন মেজদিদিকে হাতে না আনিতে পারিলে কোনো কার্য্যই হইবে না ; কিন্তু তাঁহাকে এ বিষয়ে রাজি করা কি সম্ভব ? তিনি-বাল্যবিধবা, আজীবন ব্রহ্মচারিণী, হিন্দুধর্ম্মে অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী, হিন্দু-আচার পুঙ্খানুপুঙ্খ মানিয়া চলেন এবং বিল্বপুষ্করিণীর সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধ-বিদ্যার সন্তানের নিকট শৈবমন্ত্রে দীক্ষিতা ; তিনি যে একজন ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকের নিকট মনোরমার—তাঁহার প্রাণাধিকা মনোরমার দীক্ষাগ্রহণের সহায়তা করিবেন, ইহা ত অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। তথাপি অনন্যোপায় হইয়া আমি তাঁহাকেই বলিতে বাধ্য হইলাম। যদিও অনেক প্রাচীনা ও বৃদ্ধা অভিভাবিকা সঙ্গে আছেন তথাপি মেজদিদি সহায়তা করিলে কেহই তাঁহাকে ঠেকাইতে পারে না, সকলেই তাঁহাকে ভালবাসেন এবং বিশ্বাস করেন।

আমার সঙ্গে মেজদিদির নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্ত্তা হইল।

আমি। মেজদি, আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

মেজদিদি। (একটু উগ্রভাবে) কি বলিবে বল।

মেজদিদি হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে, আমি মনোরমাকে ব্রাহ্ম-সমাজে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব করিব, ইহাই তাঁহার উগ্রভাবের কারণ হইয়াছিল।

আমি বলিলাম, আমি মনোরমাকে নি'য়ে যে'তে চাচ্ছি না, আপনাদের যদি কখনো ইচ্ছা হয় তাহাকে আমার নিকট পাঠাইবেন, সে চিরকাল আপনাদের নিকট থাকিলেও আমার আপত্তি নাই।

মেজদিদি। (প্রসন্নভাবে) তবে আর কি কথা বলিবে বল।

আমি বলিলাম, আমি গোঁসাইজীর (নাম বলিলাম) নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি। তিনি আকাশগঙ্গাপাহাড়ে কোনো সিদ্ধপুরুষের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অনেক বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি আমি আর দেখি নাই। আমার ইচ্ছা হইয়াছে যে, মনোরমা তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে, তিনি দীক্ষা দিতে রাজি হইয়াছেন। আমরা দুজনায় যে যেখানে থাকি না কেন, স্বামী স্ত্রী আমরা একই ধর্ম্ম অবলম্বন করিব, মনোরমা আমার সহধর্ম্মিণী হইবে, ইহাই আমার ইচ্ছা। আপনি অনুমতি না করিলে আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ করার আর উপায় নাই।

মেজদিদি। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) তিনি কি আমাকে দীক্ষা দান করিবেন ?

মেজদিদির কথা শুনিয়া মনে হইল, আমি বুঝি একটা সুখস্বপ্ন দেখিতেছি, যদি এই স্বপ্ন সত্য হয় তবে বুঝিব ইহা ভগবানের আমার প্রতি বিশেষ কৃপা। আমি বলিলাম—"জিজ্ঞাসা করিয়া আসিব ?"

মেজদিদি বলিলেন "শীঘ্র যাও।"

আমার সমস্ত আশঙ্কা কাটিয়া গেল, মেঘ-বিমুক্ত শারদীয় আকাশের ন্যায় মন আমার উজ্জ্বল ও পরিষ্কার হইয়া উঠিল। ডাইলবাজার হইতে নলগোলা অতি দ্রুত চলিয়া আসিলাম, তবু মনে হইতেছিল পথ যেন ফুরায় না। ঠাকুরের নিকট আসিয়া মেজদিদির প্রার্থনা জানাইলাম, তিনি বলিলেন "হাঁ, তিনিও দীক্ষা পাইবেন।" আমার

আনন্দের সীমা রহিল না। ছুটিয়া গিয়া মেজদিদিকে সংবাদ জানাইলাম, তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল।

মেজদিদি রাজি হওয়ায় কাজ অনেকটা অগ্রসর হইল বটে কিন্তু তিনিও ত বধূ, তাঁহার উপরে অনেকে আছেন, সুতরাং তিনিও অন্য গুরুজনদিগকে কিছু না বলিয়া মনোরমাকে লইয়া কোথাও যাইতে পারেন না। পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য বধূদিগকে প্রৌঢ় অবস্থায়ও বহু পরিমাণে গুরুজনদিগের অধীন থাকিতে হয়, তাহারা কর্ত্তা হইয়া বড় কিছু একটা করিতে পারে না। আজিও এ প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই।

গেণ্ডারিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ বি, এ, মহাশয় তখন ঢাকা কলেজিয়েট্ স্কুলের একজন শিক্ষক, তিনি আমাদের গুরুভাই। যে বাসাবাড়ীতে তিনি তখন বাস করিতেন, উহা মনোরমাদের বাসা হইতে বেশী দূর নয়। তিনি আমার বন্ধু, এই সম্পর্কে আমার স্ত্রীকে তিনি তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। ইহাতে কাহারও আপত্তি করার কিছু থাকিল না, কেন না কুঞ্জবাবু একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, তিনি হিন্দু এবং মনোরমার খুড়ামহাশয়েরও বিশেষ পরিচিত। এই ঘটনাটী দৈবাৎ ঘটে নাই, ইহা আমার ও কুঞ্জবাবুর পরামর্শের ফল। মেজ-দিদিকেও ইহা জানিতে দিয়াছিলাম। মনোরমা যেখানেই যাউন, মেজদিদি ছায়ার মতন সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। পরের দিন বেলা ৮টার সময়ে মেজদিদি মনোরমাকে সঙ্গে করিয়া কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, শ্রীগুরুদেব সেইখানে আসিয়া তাঁহাদিগকে দীক্ষা প্রদান করিলেন।

দীক্ষাগ্রহণ

যে ঘরটিতে দীক্ষা দেওয়া হইবে, সে ঘরটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া তাহাতে ধূপধূনা দেওয়া হইয়াছে। ঠাকুরের জন্য একখানা স্বতন্ত্র আসন ও দীক্ষার্থিগণের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসন রাখা হইয়াছে।

মেজদিদি ও মনোরমা ভিন্ন আরও কয়েকটী বালক ও স্ত্রীলোক সেদিন দীক্ষার্থী ছিলেন এবং কুঞ্জবাবু ও আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। শ্রীগুরুদেব আসনে বসিয়া বহুক্ষণ ধ্যানস্থ রহিলেন। নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপের ন্যায় তাঁহার সেই ধ্যানস্থ রূপ এখনও আমার মনে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। ধ্যানভঙ্গ হইলে তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া "জয় গুরু, জয় গুরু" শব্দ উচ্চারণ করিলেন। পরে উপস্থিত সকল দীক্ষার্থীকেই একই মন্ত্র প্রদান করিয়া মন্ত্রার্থ বুঝাইয়া দিয়া প্রাণায়াম শিক্ষা দিলেন। বলিয়া দিলেন, প্রাণায়ামটী ভূতশুদ্ধির জন্য, নাম জপই প্রকৃত সাধন, এই নাম প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে জপ করিতে হইবে। মাংস এবং উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ এই সাধনপ্রণালীতে নিষিদ্ধ, তবে পিতা মাতা এবং স্বামীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে নিষেধ নাই।

দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু মনোরমা করিলেন না; সকলে উঠিয়া গেলেন, মনোরমা উঠিলেন না; একজন মহিলা যখন তাঁহার বাহু আকর্ষণ করিয়া উঠিতে সঙ্কেত করিলেন, তখন তিনি চক্ষু মেলিলেন, কিন্তু সহজে উঠিতে পারিলেন না। উক্ত মহিলা ধরিয়া দাঁড় করাইলেন, তখন আস্তে আস্তে হাঁটিতে পারিলেন। আমরা মনে করিলাম, বুঝি পায়ে ঝিঁ-ঝিঁ ধরিয়াছে, তথাপি ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক বোধ হইল। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, মন্ত্রগ্রহণমাত্র মনোরমার সমস্ত বহিরিন্দ্রিয় নিরোধ হইয়া গিয়াছিল, তৎক্ষণাৎ সমাধির অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। কোন একটী যন্ত্রে সম্পূর্ণ দম দেওয়া থাকিলে যেমন একবার ঘুরাইয়া দিলেই সে আর থামিতে পারে না, সেইরূপ মনোরমার মনোযন্ত্র একটি সিদ্ধমন্ত্রের অপেক্ষা করিতেছিল, সেই মন্ত্র প্রাপ্তিমাত্র মনের যে গতি হইল, তাহা আর থামিল না, তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাসে সেই নাম চলিতে লাগিল। সমস্ত জীবনে কখনো তাহা ভুলিতে পারেন নাই।

প্রথম সমাধি

জন্মাষ্টমীর মিছিল শেষ হইয়া গেল, কুকুটীয়া হইতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা বাড়ী চলিলেন এবং আমাকেও তাঁহারা অনুরোধ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গী করিলেন।

কুকুটীয়া পৌঁছিয়া পরের দিন আমি মনোরমাকে লইয়া দোতলার উপর একটি ক্ষুদ্র ঘরে সাধনে বসিলাম। মনোরমা আমার কাছে বসিয়া দুই হস্ত জোড় করিয়া শ্রীগুরুদেবকে ও ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া চক্ষু বুজিলেন, আমিও চক্ষু বুজিয়া গুরুদত্ত নাম জপ করিতে লাগিলাম, এক ঘণ্টা কি তদপেক্ষাও অল্পকালমধ্যে আমি চক্ষু মেলিলাম, কিন্তু মনোরমা সেই অবস্থায়ই বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখশ্রী দেখিয়া মনে হইল যেন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই এবং তিনি কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। এইরূপে ছয় ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল এবং তিনি জোড়হস্তে নমস্কার করিয়া চক্ষু মেলিলেন। এই সময়ের মধ্যে মেজদিদি একাধিকবার আসিয়া মনোরমাকে দেখিয়া গিয়াছেন। আমি ত সর্ব্বদাই কাছে ছিলাম। ধ্যানভঙ্গের পরে আমি মনোরমাকে বলিলাম যে, তুমি অনেকক্ষণ বসিয়া ছিলে। তিনি বলিলেন "কতক্ষণ", আমি বলিলাম "ছয় ঘণ্টা"। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন "আমার মনে হয় যেন অতি অল্পক্ষণ বসিয়াছি।" আমি জানিতে চাহিলাম, "কি নিয়ে এতক্ষণ বসিয়াছিলে? মনের অবস্থা কিরূপ ছিল?" তিনি যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই যে, অনবরত নাম চলিতেছিল, আর নামে এতই আনন্দ হইতেছিল যে, মনে হয় যেন আনন্দসাগরে ডুবিয়াছিলেন। বাহিরের কোন ইন্দ্রিয়েরই কিছুমাত্র ক্রিয়া অনুভূত হয় নাই, অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ কিছুই ছিল না, কেবল নামানন্দে আত্মহারা হইয়া ডুবিয়াছিলেন।

আজ আমার নিকট সত্যসত্যই একটা নূতন জগৎ প্রকাশিত হইল। সমাধির কথা শাস্ত্রে ও লোকের মুখে শুনিয়াছি কিন্তু ইহার পূর্ব্বে কখনই এরূপ সহজ সমাধির কথা কল্পনাও করি নাই। অনেক

সাধু সন্ন্যাসী হট্‌যোগ করিয়া সমাধিলাভের চেষ্টা করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কদাচিৎ কোন ব্যক্তি কিছুকালের জন্য সমাধির অবস্থা লাভ করেন, কিন্তু উহা অত্যন্ত কঠোর সাধনার ফল। আবার যাঁহারা কোন মূর্ত্তিবিশেষকে আরাধ্যরূপে ধ্যান করেন, অত্যুগ্র একাগ্রতা দ্বারা তাঁহাদের মধ্যে কদাচিৎ কাহারও চিত্ত অন্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া ধ্যেয় বস্তুতে স্থিরতা লাভ করে। এসকল বিশ্বাস আমার ছিল, কিন্তু কিছুমাত্র কঠোরতা অথবা প্রযত্ন না করিয়া গুরুদত্ত নাম মাত্র অবলম্বনে একজন অবলার চিত্ত যে অনায়াসে সমাধিলাভ করিবে ইহা আমি কখন চিন্তা করি নাই। দীক্ষাপ্রাপ্তির পরে মনোরমা অদ্যই প্রথম সাধনে বসিলেন।*

এই ঘটনার দুই তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতে আমি অনেক সময়েই মনোরমাকে সঙ্গে লইয়া উপাসনা করিয়াছি। তিনি অত্যন্ত ভক্তির সহিত আমার উপাসনায় যোগ দিয়াছেন, এইরূপভাবেই বসিয়াছেন, এইরূপে হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিতেন এবং চক্ষু বুজিয়া স্থিরভাবে বসিতেন; আমি যখন উপাসনা শেষ করিতাম, তিনিও নমস্কার করিয়া উঠিয়া যাইতেন কিন্তু হঠাৎ কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল যে, সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানের অতীত হইয়া ছয় ঘণ্টাকাল নামামৃত-সুধাপানে নিমগ্ন রহিলেন? বলিব কি, শত সাধনের ধন প্রত্যাশার অতীতভাবে আমারই ঘরে প্রকাশিত দেখিয়া আমি ত হাতে আকাশ পাইলাম। আর মনোরমা? মনোরমা তখন সমাধির নামও শুনেন নাই, যে অবস্থাটি লাভ হইয়াছে তাহা তাঁহার অচিন্তিত অবস্থা। কোনো আশ্রয়হীন নিদ্রিত দরিদ্রকে বৃক্ষতল হইতে তুলিয়া লইয়া গিয়া কেহ যদি রাজসিংহাসনে বসাইয়া দেয়, তবে তাহার যে আনন্দ হয় তদপেক্ষা লক্ষলক্ষগুণ আনন্দে আজ মনোরমার হৃদয়মন উদ্ভাসিত হইয়া

*এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া কোন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি (ইংরাজী বিদ্যায় সুপণ্ডিত) বলিলেন যে, ক্ষেত্র সম্পূর্ণই প্রস্তুত ছিল, একটি সিদ্ধমন্ত্রের অপেক্ষা ছিল; উহা প্রাপ্তিমাত্র সমাধি হইল।

উঠিয়াছে। দৃষ্টান্তের অভাববশতঃই রাজ্যসুখের তুলনা দিলাম, বস্তুতঃ ভগবানের নামানন্দের সহিত পার্থিব কোনো সুখের কি তুলনা হয়? এ সুখ যাঁহার ভাগ্যে ঘটে, সেই ত প্রকৃত রাজরাজেশ্বর। পৃথিবীর রাজা ও রাণী তাঁহার চাকর চাকরাণীর যোগ্যও নহে। কিন্তু হায়, আমরা সেই অমূল্য সুখকে তুচ্ছ করিয়া 'ধূলির ধনমান' লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। আমাদের অপেক্ষা নির্ব্বোধ ও কাঙ্গাল আর কে আছে?

মনোরমার অবস্থা দেখিয়া আমি নূতন জীবন পাইলাম, কিন্তু মেজদিদি বড়ই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন, মনোরমার যদি প্রতিদিন এইরূপ অবস্থা হয় তবে এ ঘটনা ত কিছুতেই গোপন রহিবে না এবং সমস্ত ব্যাপারটা বাড়ীর লোকেরা জানিতে পারিলে তাঁহাকেই দোষের ভাগী হইতে হইবে। তিনিই যে দীক্ষাদানের সাহায্য করিয়া তাঁহাদের মেয়েকে এইরূপ ভাবাপন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলে বাড়ীর কর্ত্তারা ও প্রাচীনারা সকলেই তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইবেন। মেজদিদি বড়ই কাতর হইয়া আমাকে বলিলেন, "তুমি যদি জানিতে যে দীক্ষাগ্রহণ করিলে উহার এইরূপ অবস্থা হইতে পারে তবে সে কথা আমাকে আগে জানাইলে না কেন?" আমি ভাবিলাম, যে অবস্থা দেখিয়া আমি আমাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি, মেজদিদি গুরুগঞ্জনার ভয়ে সে অবস্থাকে আপদ্ ভাবিতেছেন। প্রকাশ্যে বলিলাম, "মেজদি, আমি কিরূপে জানিব যে ইঁহার এই অবস্থা হইবে? আপনাদের সুস্থা, সবলা মেয়ে, ইঁহার কোনো রোগ নাই, মৃগী নাই, তবে নাম করিতে করিতে কেন এরূপ হয়, তাহা আপনারাই বলিতে পারেন, কেননা আমাপেক্ষাও আপনারা ইঁহাকে অধিক জানেন।" মেজদিদি যদিও অন্তরে বুঝিলেন যে ইহা একটা খুব বাঞ্ছনীয় অবস্থা, তথাপি গুরুজনের ভয়ে খুব চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

মেজদিদির মনের অবস্থা দেখিয়া আমার বড় আশঙ্কা হইল। আমি ভাবিলাম মনোরমা এখানে থাকিলে নিশ্চয়ই তাঁহার সাধনের বিঘ্ন ঘটিবে, অতএব তাঁহাকে আর এখানে রাখা হইবে না। আমি

প্রস্তাব করিলাম যে এবারেই মনোরমাকে আমি সঙ্গে লইয়া যাইব। মনোরমাকে নেওয়ার কথা বলায় শ্বশুরবাড়ীর সকলেই আমার উপর উত্তেজিত হইয়া উঠিল, মনে হইল যেন আমি কথাটা বলিয়া ভিমরুলের চাকে ঢিল ছুড়িয়াছি। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমি সকলের বিদ্বেষ-ভাজন হইলাম, যে রসনাগুলি আমার পক্ষে চিরকোমল ছিল, সেগুলি কঠোর ও কর্ক্কশ হইয়া উঠিল। আদর, সম্মান ও স্নেহের স্থানগুলি পলকের মধ্যে উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও নিষ্ঠুরতা অধিকার করিয়া লইল। দশ বৎসরের বদ্ধমূল বান্ধবতা একটি কথায় ছিন্নমূল হইয়া গেল। এই দুর্দ্দিনে কেবল একটি হৃদয় ধ্রুবতারার মত স্থির রহিল। শুধু স্থির রহিল বলিলে ঠিক বলা হয় না, অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া স্থির রহিল।

আজ শ্বশুরবাড়ীর এতগুলি পরিজনের মধ্যে কেহই আমার আত্মীয় নাই, কেবল আত্মীয় নাই এরূপ নহে, সকলেই শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। কেবল শ্বশুরবাড়ীর লোক নহে, সমস্ত গ্রামখানিই আরক্ত-নেত্রে আমার দিকে চাহিল এবং আমার প্রতি ঘৃণাপ্রকাশ ও কটুবাক্যবর্ষণ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ভদ্র, অভদ্র, স্ত্রীলোক, পুরুষ সকলের মুখেই আমাদের কথা এবং সকলের মুখেই আমার নিন্দা। সংক্ষেপতঃ সমগ্র গ্রামখানি এক পক্ষ এবং আমি একলা এক পক্ষ।

"দাতা-কালীকুমারের কন্যা মনোরমা কি খৃষ্টান হইবে?" সকলের মুখেই এই কথা। অনেকে ব্রাহ্ম হইয়াছে এবং আপনার স্ত্রীকে ব্রাহ্ম-সমাজে নিয়াছে কিন্তু এ বিষয় লইয়া এতবড় একটা জটলা, এতবড় একটা আন্দোলন আর কোথাও হইয়াছে কি না সন্দেহ। গ্রামে আজ দত্তপরিবারের কেহ শত্রু নাই, সকলেই দাতা-কালীকুমারের নাম লইয়া, তাঁহারই মানসম্ভ্রমরক্ষার্থ মনোরমাকে পতিঅনুগামিনী হইতে নিবারণ করিতে উপস্থিত। কাহারও উৎকট পীড়া হইলে পাড়াপ্রতিবেশী যেমন তাহাকে দেখিতে আসে, আজ মনোরমাকে ও আমাকে দেখিবার জন্য সেইরূপ আবালবৃদ্ধবনিতা ছুটিয়া আসিতে লাগিল। নয় দশ বৎসরের মেয়েগুলি পেটের উপর একটা ভাই কি বোনকে লইয়া

হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিতেছে, আর দূর হইতে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া আমাকে দেখাইতেছে, তাহাদের মনের ভাব এই যে, এই দুর্জ্জন লোকটা তাহাদের মনাদিদিকে জন্মের মতন লইয়া যাইতেছে। আমার শ্বশুরবাড়ীর দীঘির পাড়ে নানাশ্রেণীর অনেক প্রজা আছে, তাহাদের ঝি বউ পাড়া খালি করিয়া আসিয়াছে, পাড়াপ্রতিবেশী আত্মীয়গণের ত কথাই নাই। আমার বিবাহের সময়ে যেরূপ সকলের আনাগোনা দেখিয়াছিলাম, এই সময়েও প্রায় সেইরূপ, তবে দুইটি ঘটনার মধ্যে কি বৈসাদৃশ্য! দশবৎসর পূর্ব্বে যাহাকে দেখিবার জন্য তাহাদের চক্ষু উৎফুল্ল হইয়াছিল, আজ তাহার প্রতি কি বিষম ঘৃণাদৃষ্টি বর্ষণ করিতে করিতে তাহারা ছুটিয়া আসিতেছে। কুকুটীয়ার এবং প্রতিবেশী দুই তিন গ্রামের লোক আজ যে একজোট হইয়াছে তাহার বিশেষ কারণ আছে। দাতা-কালীকুমারের কেহ শত্রু ছিল না। সকলেই তাঁহার নাম করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিত। সেই কালীকুমারের কন্যা আজ খৃষ্টান* হইতে যাইতেছে ইহা তাহাদের সকলেরই কলঙ্কের বিষয়। এইসকল আন্দোলনের পশ্চাতে মেজদিদির পরামর্শ ছিল। তিনি বাড়ীর কর্ত্তা ও গৃহিণীদিগকে উত্তেজিত করিয়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে খবর দিলেন, তাঁহারা মনোরমাকে বুঝাইয়া তাঁহার গন্তব্য পথ হইতে ফিরাইতে চেষ্টা করিবেন। মেজদিদির অন্তরে এই বিশ্বাস ছিল যে, মনোরমা যদি আমার সঙ্গে না যান তবে আমি বাধ্য হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব। তাঁহার এরূপ বিশ্বাস করার যে কোনো কারণ ছিল না তাহা নহে।

মনোরমার ধৈর্য্য ও সংযম

মনোরমাকে নেওয়ার প্রস্তাব যখন আমি সুদৃঢ় করিলাম তখন হইতে তাঁহার সঙ্গে আমার দেখাশুনা বন্ধ হইল। একমাত্র আহারের

*গ্রাম্যলোকেরা তখন ব্রাহ্মদিগকে খৃষ্টান নামেই অভিহিত করিত। খৃষ্টান নামটা বড়ই ঘৃণাজনক ছিল, এমন কি এখনও আছে।

সময়ভিন্ন কেহ আমাকে বাড়ীর মধ্যে যাইতে অনুরোধ করিল না, আমিও গেলাম না, বাহিরবাড়ীতে রহিলাম। পুরুষের দশ দশা, তাহাকে সকলই সহিতে হয়। মানুষের ভাগ্যে বিধাতা যতবিধ অপমান লিখিয়াছেন তন্মধ্যে উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত হইয়া শ্বশুরবাড়ীতে রাত্রিবাস সর্ব্বাপেক্ষা অপমান। সে অপমানও আমাকে সহ্য করিতে হইল; সান্ত্বনা এই ছিল যে, সমস্ত লাঞ্ছনাই আমি ধর্ম্মের জন্য সহ্য করিতেছিলাম।

ক্রমান্বয়ে তিন দিন সকাল বিকাল দত্তবাড়ীতে সালিশী সভার অধিবেশন হইতেছিল। এ সালিশী সভা কোনো সুবিচারের জন্য নহে, মনোরমার মন ফিরাইবার জন্য এই সভা বসিতেছিল। গ্রামের এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ভূম্যধিকারী প্রভৃতি নানাশ্রেণীর অনেক লোক এই সভায় যোগদান করিতেছিলেন। বাড়ীর মধ্যের বিস্তৃত অঙ্গনে সমস্ত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সকালবেলায় ৮টার সময়ে আসিয়া জুটিতেন এবং মনোরমাকে ডাকিয়া আনিয়া কাছে বসাইয়া বুঝাইতেন যে, তাঁহার কিছুতেই স্বামী-অনুগামিনী হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাদের বক্তৃতার মধ্যে তিনটি কথাই প্রধান ছিল। প্রথমটি এই যে, মনোরমার পিতা সর্ব্বজনমান্য নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন, কন্যা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বন করিলে তাঁহার পবিত্র নামে কলঙ্ক হইবে। এইরূপ দেবতাপিতার কন্যা হইয়া পিতৃনামে কলঙ্ক প্রদান করিলে তাঁহার কোনো ধর্ম্মই হইতে পারে না। দ্বিতীয় কথা, ব্রাহ্ম-সমাজ একটা নেড়ানেড়ীর দল, সে দলের স্ত্রীলোক-পুরুষ প্রায় সমস্তই চরিত্রহীন, এরূপ একটা দলের মধ্যে যাইয়া পড়া কোনো সাধ্বী স্ত্রীলোকের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে। তৃতীয় কথা এই যে, মনোরমার স্বামী চাকুরীবাকুরী কিছুই করে না, এখন পরের আশ্রিত ও গলগ্রহ হইয়া তাঁহাকে থাকিতে হইবে, পরের ঘরে হয়ত দাসীর ন্যায় ব্যবহৃত হইবে। ঈশ্বর না করুন, যদি স্বামীর জীবনের উপর কোনো বিপদ্ ঘটে তবে মনোরমাকে শিশুসন্তান লইয়া রাস্তায় দাঁড়াইতে হইবে, কেন না তখন কোনো হিন্দু আত্মীয় তাঁহাকে

গ্রহণ করিতে পারিবে না। স্বার্থপর ব্রাহ্মেরা যে সাহায্য করিবে তাহা ত বুঝাই যায়, কেন না তাহারা মা-বাপ-ভাই-বোনকে সাহায্য করে না। ইত্যাদি নানাপ্রকারে পল্লবিত করিয়া, নানা লোকের দৃষ্টান্ত দিয়া, এইসকল কথা হইত। কখনো স্নেহপূর্ণ বাক্যে, কখনো তিরস্কারের ভাষায় এবং কখনো বা ভবিষ্যৎ ভয় প্রদর্শন করিয়া বক্তাগণ তাঁহাদের বক্তব্য ও মন্তব্য প্রকাশ করিতেন।

এইরূপে সকাল আটটা হইতে বেলা বারটা এবং বিকালে চারিটার পর হইতে রাত্রি আট-নয়টাপর্য্যন্ত সভা বসিত। প্রতিবারেই সভাভঙ্গের পূর্ব্বে বক্তাগণ মনোরমাকে অনুরোধ করিতেন যে, "তুমি বল যে তুমি যাইবে না, আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে যাই।" কিন্তু এই তিন দিনের মধ্যে মনোরমা তাঁহাদের সহিত একটি কথাও বলেন নাই। তাঁহারা যখন ডাকিয়াছেন তখন আসিয়া কাছে বসিয়াছেন এবং তাঁহারা যখন চলিয়া গিয়াছেন তখন মনোরমা উঠিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। সকলেই বলিলেন, "হদ্দ মেয়ে, এত করিয়াও আমরা একটা মুখের কথা বাহির করিতে পারিলাম না।" বাহিরের লোক চলিয়া গেলেই যে মনোরমা অব্যাহতি পাইতেন তাহা নয়, বাড়ীর মেয়েরা সর্ব্বদাই তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতেন। সকলের মুখেই এক কথা, "বল এখন তুমি যাইবে না।" মনোরমা একেবারেই বোবা হইয়া রহিতেন। তাঁহার প্রাণের অসীম ক্লেশ আমি অনুভব করিলাম এবং সকলকে বিনয় করিয়া বলিলাম, "আপনারা একটি কার্য্য করুন, মনোরমাকে দিয়া এই কথা লিখাইয়া আনুন যে, সে আমার সঙ্গে যাইবে না।" তাঁহারা তাহাই করিতে রাজি হইলেন এবং তাঁহাদের অনুরোধে মনোরমা একখানি কাগজে কিছু লিখিয়া একজন চাকর দ্বারা আমার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। কাগজে কি লিখিত হইয়াছে দেখিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র হইলেন, কাগজখানি খুলিয়া দেখা গেল তাহাতে লিখিত রহিয়াছে, "আমি তোমার সঙ্গে যাব।" যদিও আমার বিপক্ষগণের আর কিছুই বলিবার রহিল না তথাপি তাঁহারা সহজে পরাস্ত হইলেন না।

কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমাকে আরও অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল, সেসকল কথা আর লিখিতে ইচ্ছা নাই। যখন এইসকল ব্যাপার হইতেছিল, তখন মনোরমার সহোদর শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দত্ত মহাশয় দেশে ছিলেন না, তিনি উপস্থিত থাকিলে আমাদিগকে এত ক্লেশ সহ্য করিতে হইত না।

কুকুটীয়ার কোনো ব্যক্তি একখানা নৌকা কেরায়া করিয়া দিয়া আমার সাহায্য করিল না। আমার হাতে টাকাপয়সা কিছুই ছিল না, কাহারও নিকট যে ধার পাইব সে আশাও নাই, কেন না কে আমাকে সাহায্য করিবে? লজ্জাসরম খোয়াইয়া অন্য বাড়ীর মনোরমার খুল্লতাত-সম্পর্কীয় শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দত্ত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর নিকট দশটি টাকা চাহিলাম, তিনি দশটি টাকা দিলেন। এ কার্য্যে তাঁহাকে কিছু গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছিল।

মেজদিদি যখন দেখিলেন যে, কোনো কৌশলেই তাঁহারা ফললাভ করিতে পারিলেন না, তখন দুইখানা নৌকা করার বন্দোবস্ত হইল এবং আমাকে তিনি বলিলেন যে, "তুমি এক নৌকায় যাইবে, আমি মনোরমাকে লইয়া অন্য নৌকায় যাইব, যদি নরোত্তমপুরে তোমার ভগিনী মনোরমাকে রাখিতে চাহেন, তবে তাহাকে এখন সেখানেই রাখিবে।" আমি এ কথায় আপত্তি করিলাম না, এখন মনোরমাকে লইয়া আমি এবাড়ীহইতে বাহির হইতে পারিলেই বাঁচি।

এই সময়ে মনোরমার মানসিক অবস্থার কথা ভাবিয়া আমাকেও বিষণ্ণ হইতে হইয়াছিল। যাহারা জেদবাদ করিয়া তেজস্বিতা দেখাইয়া বাপেরবাড়ীহইতে স্বামীর সঙ্গে চলিয়া যায়, তাহাদের তেমন মনোবেদনা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু মনোরমার স্নেহপ্রবণ হৃদয় উভয় পক্ষের জন্যই ব্যাকুলা, পিত্রালয়ে তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় এবং তাঁহার হৃদয় সকলের জন্যই মমতাপূর্ণ। যে যাহা করিতেছে সকলই তাঁহার কল্যাণের জন্য সুতরাং তাঁহার প্রাণ যেন দুই ভাগে ছিন্ন হইয়া বিদীর্ণ হইতেছিল। যেদিন আহারান্তে আমরা রওনা হইব, সেদিনকার

সমস্ত সকালবেলাটা তাঁহার চক্ষের জল থামে নাই, তিনি পরিবারস্থ কাহারও মুখের দিকে তাকাইয়া কথা বলিতে পারিলেন না। বিদায়কালের সেই হৃদয়-বেদনার কথা কোনো পক্ষই কখনো ভুলিতে পারে নাই।

গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া কোলের শিশুটিকে কোলে লইয়া সাশ্রু-নয়নে তিনি নৌকায় উঠিলেন। নিজের যা কিছু গহনাপত্র ছিল তাহা কিংবা অন্য কোনো জিনিষই সঙ্গে লইলেন না, এমন কি বিছানাও সঙ্গে গেল না। অন্য কেহও সেসকল দেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। এইরূপে তিনি চিরবান্ধব আত্মীয়স্বজনের নিকট জন্মের মতন বিদায় গ্রহণ করিলেন।

তিন দিন পরে আমাদের নৌকা নরোত্তমপুরে আমার ভগিনীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল, দিদি অতুল স্নেহে আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার শ্বশুর গ্রাম্য লোকের পরামর্শে আমাদিগকে তাঁহার বাড়ীতে রাখিতে অস্বীকৃত হইলেন, সুতরাং আমি মেজদিদির নিকট যে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছিলাম সে পাশ ছিন্ন হইল। দুই দিন নরোত্তমপুরে থাকিয়া আমি, মনোরমা ও আমাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ নিত্যরঞ্জন ও চিত্তরঞ্জনকে লইয়া বরিশাল রওয়ানা হইলাম।

এখনও মনোরমার চক্ষের জল শুকায় নাই। আজ আমি তাঁহাকে প্রফুল্ল করার জন্য অনেক প্রকারের কথাবার্ত্তা পাড়িলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিন দিন পর্য্যন্ত এতগুলি লোক দু'বেলা তাঁহাকে এত বুঝাইল, তিনি যে কাহারও কথায় একটিও উত্তর করিলেন না ইহার কারণ কি? মনোরমা বলিলেন, "আমি কি উত্তর করিব? তাঁহারা যখন আমার পিতার প্রশংসা করিতেন, তাহা শুনিতে আমার খুব ভাল লাগিত। তাঁহারা যে ব্রাহ্ম-সমাজের লোকের নিন্দা করিয়াছেন, তাহাতে আমার কিছুই বলিবার নাই, কেননা আমি ব্রাহ্মদিগের বিষয়ে কিছুই জানি না। তাহার পরে তাঁহারা যখন

তোমার নিন্দা করিয়াছেন, আমি সে কথায় কাণ দেই নাই। সেসকল কথার প্রতিবাদকরাও আবশ্যক মনে করি নাই। তাঁহারা যতক্ষণ নানা কথা বলিয়াছেন আমি ততক্ষণ ভগবানের নাম করিয়াছি। আমি জানিতাম যে তাঁহারা আহারের বেলায় নিশ্চয়ই উঠিয়া যাইবেন, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলার আবশ্যক কি?"

মনোরমার উত্তর শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম, এরূপ ধৈর্য্য ও সংযম আমার নিকট অসাধারণ মনে হইয়াছিল।

নরোত্তমপুর হইতে রওয়ানা হইয়া দ্বিতীয় দিবসের অপরাহ্ণে আমরা বরিশাল পৌঁছিলাম। আমানতগঞ্জের ঘাটে নৌকা লাগাইয়া আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম যে, রাস্তায় কোন পরিচিত লোক দেখিতে পাই কি না। এমন সময়ে আচার্য্য গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভাগিনেয় শ্রীমান্ সুখময় রায়কে দেখিতে পাইলাম, তাহাকে সঙ্গে করিয়া সকলকে লইয়া উক্ত আচার্য্যমহাশয়ের বাসায়* উপস্থিত হইলাম। সেই পরিবারস্থ সকলে অকস্মাৎ আমাকে সপরিবারে উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্মিত হইলেন, কেননা এরূপ আগমনের কিছুমাত্র পূর্ব্ব সূচনা ছিল না। তখন ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি আমার এতই অনুরাগ ছিল যে, আমি আমার ভার্য্যা ও পুত্রদ্বয়কে ব্রাহ্ম-সমাজে আনিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলাম। জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যরঞ্জন মেজদিদির সঙ্গে আমাদের বাণারিপাড়ার বাড়ীতে রহিল।

———

মজুমদার-পরিবার

আচার্য্য গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বরিশাল গভর্ণমেণ্ট ইংরাজী স্কুলের একজন শিক্ষক, তাঁহার বেতন মাসিক ৩০৲ ত্রিশ টাকা মাত্র।

---

* বরিশালের টাউনের উপর যত বাড়ী আছে সকলকেই 'বাসা' বলে, গ্রামের বাড়ীকেই বাড়ী বলে। গ্রামের বাড়ীকে কখনই বাসা বলে না এবং সহরের বাড়ীকে বাড়ী বলে না।

তিনি স্থানীয় ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য। ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে যৎসামান্য অর্থ তাঁহাকে দেওয়া হয়, তাহার সংখ্যা দশটাকার অধিক এবং বিশ-টাকার অনধিক, সর্ব্বদা সমান থাকিত না। তাঁহার পিতা বরিশালে কোনো জমিদারের মোক্তার ছিলেন, তাঁহার একখানা বসতবাড়ী আছে। বাড়ী বলিতে পাকাবাড়ী নহে, (এ সময়ে সহরের উপরে অতি অল্প লোকেরই পাকাবাড়ী ছিল) খানিকটা জমি ছিল, উহার কতক অংশে মজুমদারমহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং কতক অংশে মজুমদারমহাশয় খড়ের ঘর করিয়া বাস করিতেন। বরিশালে মেটে দেয়াল প্রচলিত নাই, যাহারা পাকাবাড়ী করিতে না পারে, তাহারা হোগলাপাতা, নল বা ইকরের অথবা বাঁশের চাটাইয়ের বেড়া দিয়া ঘর করে। হোগলাপাতাই সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা, মজুমদারমহাশয়ের ঘরেও ইহারই বেড়া ছিল, তাহাও সর্ব্বত্র সমানভাবে ছিল না, কোথাও পাতলা কোথাও ভাঙ্গা—তবে সুখের বিষয় যে চোরের ভয় করিবার কোনো কারণ ছিল না, কেননা সকলেই জানিত যে মজুমদারমহাশয় কপর্দ্দক-শূন্য।

একখানি বড় ঘরের মধ্যে বেড়া দিয়া দুই তিনটা বিভাগ করিয়া তাহাতে মজুমদারমহাশয়, সহধর্ম্মিণী, একটি পুত্র ও পাঁচটি কন্যাসহ বাস করেন। অন্য ভিটিতে একখানা ছোট ঘর আছে, তাহাতে থাকে কালীচরণ ও সারদাসুন্দরী। কালীচরণ সমাজের ভৃত্য, সারদা তাহার স্ত্রী, ইহারা মজুমদারমহাশয়ের পরিবারভুক্ত। এইরূপ সংসারে চারিটি পোষ্য প্রবেশ করিলাম, পরিবারস্থ সকলে অতুল আগ্রহে, আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা জানিতেন যে আমিও কপর্দ্দকশূন্য।

মজুমদারমহাশয় বরিশালে সকলেরই মান্য ব্যক্তি, এমন কোনো লোক নাই যেব্যক্তি তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা না করে। ঘোর ব্রাহ্ম-বিরোধীও তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাঁহার হৃদয়ে হিংসা নাই, বিদ্বেষ নাই, স্বার্থপরতা নাই, এমন কি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের

যে দলবদ্ধভাব মহৎ হৃদয়কেও পঙ্কিল করে, তাঁহাতে তাহারও লেশ মাত্র নাই। তাঁহার উদার হৃদয় সকলকেই আলিঙ্গন করিবার জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত, তাঁহার মিষ্টহাসি ও শিষ্টাচার সকলকেই মুগ্ধ করে, তিনি ধার্ম্মিক, অকপট, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। তাঁহার সবল, সুস্থ, দৃঢ় ও কর্ম্মঠ দেহ যৌবনপুণ্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রদান করে। জগতে যে শোক-দুঃখ-দারিদ্র্যের একটা পীড়ন আছে তাঁহাকে দেখিলে তাহা বুঝা যায় না। তাঁহার অশেষ গুণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুণ অকপটতা। এই আবর্জ্জনাময় ভেজালপূর্ণ সংসার-বাজারে সেরূপ খাঁটী বস্তু কদাচিৎ কোথাও পাওয়া যায়, কিন্তু অতি দুর্লভ।

আপনি দেখিবেন, মজুমদারমহাশয় প্রতিদিন প্রভাতে বাজার করিয়া ফিরিতেছেন, তাঁহার ডানহাতে দশবারসের ওজনের বেসাতি, কাঁধে মস্তবড় লম্বালম্বা একবোঝা ডেঙ্গোর ডাঁটা, বামবগলে একটা মোটা পিচের লাঠী, পায়ে চটীজুতা; তিনি ঊর্দ্ধ্‌দিকে আকাশের পানে চক্ষু বিন্যস্ত করিয়া প্রায় এক মাইল দূর হইতে ঘরে ফিরিতেছেন, রাস্তায় কখনো একজন সব্‌জজের সঙ্গে, কখনো বড় উকীলদের সঙ্গে, কখনো কোনো জমিদারের সঙ্গে দেখা হইতেছে, সকলেই মজুমদার মহাশয়কে, 'মহাশয় নমস্কার' বলিয়া হাতজোড় করিয়া সসম্ভ্রমে নমস্কার করিতেছেন, আর তিনি হস্তে, স্কন্ধে বেসাতির প্রকাণ্ড বোঝা লইয়া মাথা ঈষৎ নত করিয়া প্রতিনমস্কার করিতেছেন। নিজের বেশের, নিজের অবস্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। এইরূপ অবস্থায় দেখা হইতেছে বলিয়া বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নাই, তাঁহার চিত্ত সামাজিক পারিপাট্যের বাহিরে গিয়াছে, তিনি কাহাকেও সঙ্কোচ করিবেন কেন?

মজুমদারমহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর নাম মনোরমা, ছায়ার ন্যায় তিনি স্বামীর অনুগমন করেন। একান্ত-বাধ্যতা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। স্বামীর সন্তোষের জন্য তিনি সকল প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে, সর্ব্বপ্রকারের স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তিনি বিক্রমপুর বহরগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ রায়চৌধুরীবংশের কন্যা। খুব

বালিকাবয়সেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছে কিন্তু মজুমদারমহাশয় একান্ত বালক ছিলেন না। স্বামীস্ত্রীর বয়সের মধ্যে একটু বেশী ব্যবধান ছিল, অথচ তাহাতে অমানান হয় নাই। স্বামী ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে কয়েক বৎসর পরে পত্নী তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। মজুমদারমহাশয় যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই নিরামিষভোজী, গৃহিণীও অল্প বয়সেই আমিষ ভোজন পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মজুমদারমহাশয় তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে যত্নপূর্ব্বক লেখাপড়া শিখাইয়াছেন এবং প্রচলিত প্রণালী অনুসারে ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি স্থানীয় ব্রাহ্মিকা-সমাজের আচার্য্যা এবং ব্রাহ্ম-সমাজের বেদীতে বসিয়াও সময়ে সময়ে আচার্য্যার কার্য্য করেন। বঙ্গদেশের ব্রাহ্ম-সমাজে তিনিই একার্য্যে সর্ব্বপ্রথম ব্রতী হইয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে কোথাও কোনো মহিলা আচার্য্যের কার্য্যের অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। মজুমদারপরিবারের প্রতি স্থানীয় ব্রাহ্মগণের এমন কি, জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা থাকাতেই লোকেরা ইহা অনুমোদন করিয়াছে। তিনি যেদিন আচার্য্যার কার্য্য করিতেন সেদিন সমাজ-মন্দিরে লোকের ভিড় হইত। তাঁহার উপাসনা, উপদেশ ও প্রার্থনা শুনিয়া কোনো দুষ্টলোকও নিন্দা করিত না। যাঁহারা স্ত্রী-স্বাধীনতার ঘোর বিরোধী তাঁহারাও ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত।

তখন মজুমদারমহাশয়ের একটি পুত্র ও পাঁচটি কন্যা। সন্তানগণ সকলেই শ্রীসম্পন্ন, জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলা এক্ষণ কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ও স্বনামধন্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী, অন্যান্য কন্যাগণও সুপাত্রে অর্পিতা হইয়াছে। আমি যখনকার কথা বলিতেছি তখন কন্যাগণের মধ্যে কাহারও বিবাহ হয় নাই।

মজুমদার-গৃহিণী পুত্রকন্যাগণ লইয়া প্রতিদিন প্রভাতে পারিবারিক উপাসনা করেন, তাহার পর গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, নিজে দুবেলা বাটনা

বাটেন, কুট্‌না কুটেন, রান্না করেন, পরিবেশন করেন। এইসকল কার্য্যের ফাঁকে ফাঁকে কন্যাগণকে পাঠ দেন, কন্যাগণও কখনো কখনো মায়ের গৃহকার্য্যের সাহায্য করে। তাহারা ঘর ঝাঁট দেয়, ঘর নিকায়, পুকুর হইতে কলসী-কক্ষে জল আনে, অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য করে এবং আপনাদের পাঠশিক্ষা করে। বলিতে কি মজুমদার-গৃহিণীকে শারীরিক কঠিন পরিশ্রম করিয়া গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, কিন্তু সেজন্য কখনো এক পলকের জন্যও তাঁহার মুখে বিরক্তির চিহ্ন দেখা যায় না। আবার তিনি এইসকল রান্নাবান্নার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও সর্ব্বদা এমনই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন যে, দেখিলে মনে হয় যেন সে শ্রেণীর কার্য্যের সহিত তাঁহার কোনো সম্বন্ধ নাই। অনেক পরিবারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গৃহিণী রান্না করিতে গেলে কিছুতেই আপনাকে পরিচ্ছন্ন রাখিতে পারেন না; হাতে কালী, কাপড়ে কালী ও হলুদের দাগ, গায়ে কালী, মুখে কালী, সে কালী ঘর্ম্মের সঙ্গে মিশিয়া একটা বীভৎস কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছে। গৃহিণী রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইলে মনে হয় যেন ঘোররূপা মহাকালী ভীষণ যুদ্ধে শুম্ভ নিশুম্ভ বধ করিয়া আসিয়া উপস্থিত। মজুমদার-গৃহিণী এত যে কঠোর পরিশ্রমে গৃহকার্য্য করিতেন, তবু দেখিয়া মনে হইত যেন কিছুই তাঁহার গায়ে লাগিতেছে না, অথচ তিনি খুব বলিষ্ঠা নহেন।

এই পরিবারের কর্ত্তাটি ত শিব, গৃহিণীও দেবী। আর পুত্রকন্যাগুলিও যেন দেবশিশু। কন্যাগণ যখন তাহাদের আভরণ-বর্জ্জিত দেহলতাকে গোলাপী রঙ্গের ছোপান কাপড়ে বেষ্টিত করিয়া কলসী-কক্ষে জল আনিতে যাইত, তখন মনে হইত যেন প্রাচীনকালের বানপ্রস্থাশ্রমে সরলা ঋষিকন্যাগণ বৃক্ষবাটিকায় জলসেচন করিতে যাইতেছে। সকলেই সদা প্রফুল্ল, সকলেরই মুখে হাসি, ধনীর গৃহের বিলাসিতা তাহাদিগকে বিকৃত করে নাই, সম্পৎ-লালসা তাহাদিগকে মলিন করে নাই, তাহারা আপন অবস্থায় প্রসন্ন-চিত্ত, অল্পে সন্তুষ্ট, পিতামাতার চরিত্র-গৌরবেই গৌরবান্বিত; সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা, হিংসা ও কুটিলতা তাহাদিগকে

স্পর্শ করে নাই। বস্তুতঃ সেই দরিদ্রতার মধ্যে যে সুখ, যে শান্তি দেখিয়াছি ঐশ্বর্য্যের মধ্যে কোথাও তাহা দেখিলাম না।

মজুমদারমহাশয় প্রায়শঃ পারিবারিক উপাসনায় যোগদান করেন। তদ্ব্যতীত কথাপ্রসঙ্গে পরিবারবর্গকে অনেক উপদেশ দেন, ধর্ম্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন। গৃহিণী অবকাশসময়ে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন। অনেক ধর্ম্ম-পিপাসু লোক তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং কর্ত্তা ও গৃহিণী উভয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া তাঁহারা পরম পরিতুষ্ট হইয়া ঘরে ফিরেন।

সংসারে অতিথির অভাব নাই। যিনি আসিবেন তাঁহার জন্যই অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত আছে। যাহা জুটিবে সকলে মিলিয়া তাহাই খাওয়া হইবে, চুলপ্রমাণ পার্থক্য নাই। আহারের পরে অতিথি আসিলে আবার রাঁধিতে বিরক্তি নাই। একদিনকার একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে—তখন তিন চারিজন অন্য লোক এই বাড়ীতে আহার করিতেন, কোনো কার্য্যগতিকে রাত্রি দুইটার সময়ে বাসায় আসিয়া তাঁহারা মজুমদার-গৃহিণীকে না জানাইয়া নিজেরা হাঁড়ি হইতে খাদ্য লইয়া খাইয়াছিলেন, পরের দিন ইহা জানিতে পারিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন এবং বলিলেন, তাঁহাকে তখন জাগাইলে তিনি বড়ই তৃপ্তিলাভ করিতেন, ইহাতে তিনি দুঃখিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ সে পরিবারে বাস করিতে কাহারও সঙ্কোচ হওয়ার কারণ ছিল না। এই পরিবারে প্রবেশ করিয়া মনোরমা দেখিলেন যে, কুকুটীয়ার লোকেরা ব্রাহ্ম-সমাজের যেরূপ চিত্র তাঁহার নিকট অঙ্কিত করিয়াছে এই পরিবারের চিত্র তাঁহার ঠিক বিপরীত। একদিনের মধ্যে তিনি সকলের আপনার হইয়া গেলেন।

কালীচরণ ও সারদার মধ্যে মাসেমাসেই দাম্পত্যকলহ হইত। কিন্তু উহা অজাযুদ্ধ ও ঋষিশ্রাদ্ধের ন্যায় বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া প্রসব করিত, সে কলহ লইয়া পরিবারস্থ সকলেই বড় আমোদ অনুভব করিতেন। কালীচরণের কথাবার্ত্তায় রসিকতার একটা আভাস পাওয়া

যাইত। তাহার একটি অভ্যাস বড় চমৎকার ছিল, আপনি তামাক সাজিয়া হুকার মাথায় কলিকা চড়াইয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িত এবং "ওরে হরে, তামাক দে" বলিয়া উচ্চস্বরে কোনো অস্তিত্বশূন্য লোককে ডাকিত এবং নিজেই "আজ্ঞে, এই তামাক দিচ্ছি" বলিয়া উত্তর করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া গড়গড়ার নল টানিতে থাকিত। চাকরের সাজা তামাক খাওয়ার সাধটা সে এই প্রকারে মিটাইয়া লইত। কালীচরণের স্বভাব খুব সরল ছিল, মজুমদার-পরিবারের পুত্রকন্যাগণ তাহাকে 'ভাই' বলিয়া ডাকিত। মজুমদারমহাশয়কে যদি শিব বলিলাম তবে কালীচরণকে নন্দী বলিতে হইবে। তাহার একটি গাভী ছিল, গাভীটি চারি পাঁচ সের দুধ দিত।

———

বরিশাল

অনেকগুলি নামের মিল এক বাড়ীতে জুটিল। আমার পুত্র দুইটির নাম নিত্যরঞ্জন ও চিত্তরঞ্জন, আচার্য্য মজুমদারমহাশয়ের পুত্রের নাম প্রেমরঞ্জন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পুত্রগণের নাম সত্যরঞ্জন, উষারঞ্জন, ভবরঞ্জন, শান্তিরঞ্জন ইত্যাদি। আবার মজুমদার-গৃহিণীর নাম মনোরমা, আমার স্ত্রীর নামও মনোরমা। মজুমদারমহাশয় এই জন্য আমার স্ত্রীকে ডাকিতেন 'ময়না'। দুই একদিনের মধ্যে সকলের সহিত এতদূর আত্মীয়তা হইয়া গেল যে, কেহ দেখিলে মনে করিতে পারিত যে দুই পরিবারের মধ্যে বহুকালের বান্ধবতা আছে।

যেদিন আমরা বরিশালে পৌঁছিলাম তাহার পরের রবিবারের সকালবেলায় আমরা পুরুষগণ সমাজমন্দিরে সামাজিক উপাসনায় গেলাম, বাড়ীতে মজুমদার-গৃহিণী তাঁহার কন্যাগণসহ মনোরমাকে লইয়া পারিবারিক উপাসনায় বসিলেন। আমরা বেলা এগারটার পরে সমাজ হইতে ফিরিয়া আসিলাম, বাড়ীতে আসামাত্র মজুমদার-গৃহিণী

বলিলেন যে, "মনোরমাকে লইয়া তাঁহারা ছয়টার সময়ে উপাসনা করিতে বসিয়াছিলেন, কিন্তু সেই হইতে সে চক্ষু বুজিয়া বসিয়া আছে, তাঁহার যে বাহ্যজ্ঞান আছে এরূপ বোধ হয় না।" দীক্ষালাভের পরে আজ তাঁহার দ্বিতীয় দিন বসা হইল। আচার্য্য মজুমদারমহাশয় কিছুক্ষণ অবলোকন করিয়া বলিলেন, ইহা নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা। কিছুক্ষণ পরে আমি মনোরমার কর্ণে অস্পষ্টস্বরে তাঁহার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলাম, একবার কাণ ফিরাইয়া লইলেন তাহার পরে বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল, করজোড়ে নমস্কার করিয়া চক্ষু চাহিলেন এবং সম্মুখে সকলকে দেখিয়া লজ্জিত হইলেন।

এ সময়ে বড়ই মুস্কিল হইল, মনোরমা যখনই উপাসনায় বসেন সমাধিস্থা হইয়া পড়েন। ব্রাহ্মিকা-সমাজে গেলেন, সেখানেও ঐরূপ অবস্থা হইল। অধিকাংশ ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ইহার ভালমন্দ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা কখনই এরূপ অবস্থা দেখেন নাই, কেহ মনে করিলেন হয়ত কোন ব্যাধি, কিন্তু সুস্থ শরীর এবং ভগবানের নাম করিতে বসিলেই এই অবস্থা উপস্থিত হয়, অন্য কোনো সময়েই কিছু হয় না; ইহাতে ক্রমে ক্রমে সকলেরই বিশ্বাস জন্মিল যে, ইহা ব্যাধি নহে, তবে ইহা যে একটা উচ্চ অবস্থা তাহা অতি অল্প ব্রাহ্মই বুঝিলেন। কেমন করিয়াই বা বুঝিবেন, তাঁহারা কেহই পূর্ব্বে কখনো এরূপ অবস্থা দেখেন নাই। যাহা হউক এ সময়ে মনোরমাকে বড়ই সসঙ্কোচে উপাসনায় যোগ দিতে হইত, এমন কি তিনি অনেক সময়ে সকলের সঙ্গে উপাসনায় বসিয়া ইচ্ছা করিয়া চক্ষু বুজিয়া বসেন নাই এবং মনঃসংযোগের ইচ্ছা করেন নাই, কেননা তাহা হইলে সেই অবস্থা উপস্থিত হইবে এবং লোকের আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া পড়িবেন। যদিও ব্রাহ্মগণ নিজ নিজ চিত্তকে উপাসনায় নিবিষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন, তথাপি এইরূপ একটা অনায়াস সমাধির বিষয় তাঁহাদের কল্পনার অতীত ছিল এবং অনেকে ইহাকে আদর্শ বলিয়াও মনে করিতেন না। তবে ব্যাপারটা যে প্রকৃত উপাসকগণের চিত্তকে একটু

আলোড়িত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেরূপ উপাসকের সংখ্যা আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম অপেক্ষা অনানুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের মধ্যেই অধিক ছিল। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গুপ্ত, ৺গোরাচাঁদ দাস, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র সেন প্রভৃতি এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আনুষ্ঠানিকদের মধ্যে সমাজসংস্কারস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল, তাঁহারা এক-একজন বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, সুবক্তা, তর্কপটু উপদেষ্টাকে যেরূপ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন, একজন পাণ্ডিত্যবিহীন বিচারবিমুখ সংযতচিত্ত উপাসককে সেরূপ করিতেন না। আর অনানুষ্ঠানিকগণ কেবলমাত্র ব্রহ্মোপাসনার জন্যই সমাজে আসিতেন সুতরাং কাহাকেও উপাসনায় সংযতচিত্ত দেখিলে তাঁহারা তাঁহাকেই বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। যদি মনোরমা আমার সহধর্মিণী না হইতেন, তবে তখন তাঁহার অবস্থার প্রতি আমার দৃষ্টিও বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইত কিনা সন্দেহ। বরিশাল-ব্রাহ্মসমাজের তখন একটা বেজায় উৎসাহের যুগ গিয়াছে। উৎসাহ, উদ্যম, সমাজসংস্কার, ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি ধর্ম্মের বহিরঙ্গ লইয়াই তখন আমরা উন্মত্ত ছিলাম, স্বয়ং শাক্যসিংহ উপস্থিত হইলেও সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের চিত্ত তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইত কিনা সন্দেহ।

মনোরমা উপাসনা করিতে বসিয়া দুই হাত জোড় করিয়া হদ্দ দুই মিনিট নমস্কার করিতেন, তাহার পরে হাত দু'খানা যখন কোলের মধ্যে রাখিতেন তখন আর তাঁহার বাহ্যস্ফূর্ত্তি থাকিত না। চিত্তসংযমের জন্য তাঁহাকে কখনো ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় নাই। ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করা মাত্র তাঁহার মন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অতীত হইয়া যাইত, তখন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, কাহারও কোন ক্রিয়া থাকিত না। ভয়ঙ্কর চিৎকার করিয়া ডাকিলেও শুনিতেন না এবং তাঁহাকে ধরিয়া স্থানান্তরিত করিলেও টের পাইতেন না। মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্তিমাত্র গুরুদত্ত নাম রেলগাড়ীর চাকার ন্যায় তাঁহার অন্তরে অবিচ্ছেদে চলিতেছে; হাঁটিতে, চলিতে, বসিতে, গৃহকার্য্য করিতে, এমনকি অন্যের সঙ্গে কথা বলিবার সময়েও সে নামের বিরাম নাই।

শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত সে নাম এমনই মিলিয়া গিয়াছে যে, একটি শ্বাসও বৃথা ফেলিবার উপায় নাই। মনোরমা বলিয়াছেন যে, বাহিরের কোনো চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়াও তিনি নামের গতিরোধ করিতে পারেন এমন শক্তি তাঁহার নাই। নিদ্রা ভাঙ্গিলেই দেখিতে পান যে, চৈতন্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাম চলিতেছে। এমন কি তিনি মনে করিতেন যেন নিদ্রিতাবস্থায়ও অনবরত নাম চলিতেছে।

কয়েক দিন পরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ধ্যানের সময়ে তুমি কিরূপ অনুভব কর? তিনি বলিলেন, "নাম সর্ব্বদাই চলিতেছে, সে নাম আনন্দময়, যখন উপাসনায় বসি তখন নামের আনন্দে একেবারে ডুবিয়া যাই, কেবল নাম আর আনন্দ, অন্য কোনো জ্ঞানই থাকে না। সে আনন্দ হইতে আমি আমাকে ফিরাইয়া আনিতে পারি না। উপাসনায় বসিলেই এই অবস্থা আসিয়া পড়ে, আমি থামাইতে পারি না; যাঁহাদের সঙ্গে উপাসনায় বসি তাঁহারা হয়ত বিরক্ত হন, আমাকে লইয়া তাঁহাদের অসুবিধা ঘটে, আমি আর সামাজিক উপাসনায় যাইতে ইচ্ছা করি না।" বস্তুতঃ অনেক সময়ে বড়ই গোলযোগ হইত; ব্রাহ্মিকাসমাজের উপাসনায় বসিয়াছেন, উপাসিকাগণ নিয়মিতরূপে উপাসনা ও প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের কার্য্য শেষ করিয়াছেন, এখন সকলে বাড়ী যাইবেন কিন্তু মনোরমা ত বসিয়াই আছেন। ডাকিলেও তাঁহার সাড়া পাওয়া যায় না, ঠেলিলেও তাঁহাকে তোলা যায় না, এ অবস্থায় তাঁহাকে ফেলিয়া সকলে যাইতে পারেন না, কাজেই লোক পাঠাইয়া দিয়া আমার খোঁজ করিতে হয়। আমি আসিয়া কাণে নাম না বলিলে বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইবে না। আমাকে সকল সময়ে খুঁজিয়া পাওয়াও বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। ইহা ব্যতীত আমি কাণে নাম বলিয়া চেতনা সম্পাদন করিলে মনোরমা দেখিতে পাইতেন যে, তাঁহাকে ঘেরিয়া সকলে বসিয়া আছেন, ইহাতে তাঁহার বড় সঙ্কোচ উপস্থিত হইত। এই জন্যই সামাজিক উপাসনায় যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার পরে যখন যাইতেন তখনও

চক্ষু মেলিয়া থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতেন। কিন্তু অধিক দিন তাঁহাকে এরূপ সঙ্কোচ করিতে হয় নাই, ইহার কিছু দিন পরেই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল।

এ ক্ষেত্রে স্পষ্টরূপে সদ্গুরুপ্রদত্ত সিদ্ধমন্ত্রের শক্তি দেখিলাম এবং সমাধি যে একটা সত্য বস্তু তাহাও বুঝিতে পারিলাম, কেননা যাঁহার কাণের কাছে কামানের শব্দও শ্রুত হয় না, জপ্য মন্ত্রটি অস্ফুটস্বরে কয়েকবার বলিলেই তাঁহার বাহ্যস্ফূর্ত্তি হয়, ইহা বিস্ময়কর নয় কি?

বরিশাল-ব্রাহ্মসমাজ

বরিশাল-ব্রাহ্মসমাজ বহুকালের পুরাতন সমাজ। এমন একদিন ছিল যখন বরিশাল ব্রাহ্মধর্ম্মের একটা প্রধান কেন্দ্র বলিয়া বিবেচিত হইত, কিন্তু বহু বৎসর সে ভাব নরম পড়িয়াছিল। এই সময়ে পুনরায় মরা গাঙ্গে জোয়ার আসিল, একদল উৎসাহী যুবকের ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণে পুনরায় উৎসাহের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইল। পুরাতন দলের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তিনজনের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত। আচার্য্য মজুমদারমহাশয়ের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অপর দুইজনের মধ্যে একজন ৺সর্ব্বানন্দ দাস ও অন্যজন শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস।

সর্ব্বানন্দবাবু ছোটআদালতের হেডক্লার্ক ছিলেন, মাসিক একশত টাকা বেতন পাইতেন। তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও অমায়িকতা প্রবাদের মতন ছিল। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই তাঁহার নীতিজ্ঞানের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারিবে। তাঁহার আফিসে তিনি কিছু কাগজ, কলম, খাম ও কালী নিজের পয়সায় কিনিয়া রাখিতেন। কোনো বন্ধু ব্যক্তি চিঠিপত্র লিখিতে চাহিলে তাঁহাদিগকে উহাই দিতেন, কদাচ বাহিরের কোনো লোককে এক টুকরা সরকারী কাগজ দিতেন না এবং সরকারী কালী কলম ব্যবহার করিতে দিতেন না। জীবনের সমস্ত কার্য্যে তাঁহার এইরূপ সূক্ষ্ম নৈতিক দৃষ্টি

ছিল। তাঁহার সদা-প্রফুল্ল মুখমণ্ডল, প্রেমোজ্জ্বল চক্ষু, মধুর সম্ভাষণ, শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপ সকলকেই মুগ্ধ করিত। দেহত্যাগের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত তিনি বহু বৎসর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার প্রতি ব্রাহ্মগণের এতই শ্রদ্ধাভক্তি ছিল যে, তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য কাহাকেও সম্পাদক করার প্রস্তাব কখনও উপস্থিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষেই তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহার একশত টাকা আয় দ্বারা কোনোরূপে কষ্টেসৃষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত, কেননা পরিজন প্রায় তের চৌদ্দটি, তাহার উপর অতিথি অভ্যাগত প্রায় সর্ব্বদাই থাকিত। বরিশালের ব্রাহ্মদিগের আতিথেয়তা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ, তাহার মধ্যে আবার আচার্য্য মজুমদারমহাশয়ের এবং সম্পাদক সর্ব্বানন্দবাবুর আতিথেয়তার ত কথাই নাই। সম্পাদকমহাশয় ব্রাহ্মমাত্রকেই আপনার পরিজন বলিয়া গ্রহণ করিতেন। আজিও তাঁহার স্নেহের কথা মনে করিয়া আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়। দুরন্ত ওলাউঠা ব্যাধি যখন তাঁহার দেহকে আক্রমণ করিল, তখন স্পষ্টই বুঝা গেল যে, সে তাঁহার আত্মাকে বিন্দুমাত্রও ক্লিষ্ট করিতে পারে নাই। মুখমণ্ডলে মৃত্যুচ্ছায়া পড়িয়াছে কিন্তু সে মুখ মলিন হয় নাই, হাসি-হাসিমুখে দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া 'দয়াময়' নাম করিতে করিতে পরকালবিশ্বাসী পরলোকে চলিয়া গেলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্য মজুমদারমহাশয় 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' রবে গৃহ কম্পিত করিয়া তাঁহার সখা, সুহৃদ্, ধর্ম্মবন্ধু সর্ব্বানন্দের জন্য যে আন্তরিক প্রার্থনা করিয়াছিলেন, বিশ্বাসীর মুখবিনির্গত সেই প্রার্থনা উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রকেই আত্মবিস্মৃত করিয়াছিল। ইহার পরে যখন সর্ব্বানন্দবাবুর বর্ষীয়সী সহধর্ম্মিণী সমস্ত সন্তানগণ সঙ্গে লইয়া কাতর প্রাণে আপনার সহজ ও স্বাভাবিক ভাষায় স্বর্গগত স্বামীর জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন এবং স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া আপনার প্রাণের কথা বলিলেন, তখন উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে কেহই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না।

বিচিত্র পুষ্পরাশিদ্বারা সুসজ্জিত সেই পবিত্র দেহ যখন শ্মশানক্ষেত্রের

দিকে বন্ধুগণ বহন করিয়া চলিলেন, তখন সমস্ত সহরের লোক তাঁহাদিগের অনুগমন করিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে কখনই বরিশালের শ্মশানে এরূপ বিপুল জনতা দৃষ্ট হয় নাই। এই শ্মশান-যাত্রা দেখিয়া শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস মহাশয়ের শিশুপুত্র তাহার পিতাকে বলিয়াছিল, "বাবা, আমার ইচ্ছা হয় যে তোমার মৃত্যু হইলে সকলে তোমাকে সমাজবাবুর (সর্ব্বানন্দবাবুর) মতন সমারোহ করিয়া শ্মশানে লইয়া যায়।"

একমাত্র অভিভাবকের মৃত্যুতে বিপুল পরিবার একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল। এই সময়ে সর্ব্বানন্দবাবুর বড় পুত্র শ্রীমান্ হরিচরণকে তখনকার পোষ্টাফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হেরম্বরবাবু ডাকঘরে একটি চাকুরী দিলেন, কিন্তু তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসরের কয়েকমাস অধিক হওয়ায় তাঁহার চাকুরী থাকিল না। এই সময়ে কয়েকজন সংসার-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন, যে "সমস্ত পরিবার অনাহারে মরিবে, এখন ব্রাহ্মগিরি রাখিয়া দাও, দুই তিন মাস বেশীবয়সের কথা না বলিলেই এমন কি অধর্ম্ম হইবে?" কিন্তু হরিচরণ উত্তর করিলেন যে, "না খাইয়া মরিব তাহাও স্বীকার, তথাপি সর্ব্বানন্দ দাসের পুত্র হইয়া কখনই মিথ্যা বলিতে পারিব না।" এসকল কথা এই জন্য লিখিলাম যে, আমি যখন মনোরমাকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলাম, তখন বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মের সম্মান কিরূপে রক্ষিত হইতেছিল পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

এক্ষণ শ্রীযুক্ত কালীমোহনদাসমহাশয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। তিনি এক বাঙ্গালা স্কুলের পণ্ডিতি করিতেন, এই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে ব্রতী হইলেন। তিনি সরলবিশ্বাসী ব্রাহ্ম। তাঁহার হৃদয়টি এতই নির্ম্মল যে আমার সময়ে সময়ে ইচ্ছা হইত যে, আমি যদি তাঁহার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার খোলা প্রাণের অংশী হইতে পারিতাম তবে কতই না সুখী হইতাম। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ দাসমহাশয় ত্রিশ টাকা বেতনে কেরাণীর কার্য্য

করিতেন। এই ত্রিশটি টাকা আটটি পরিজনের উপজীবিকা ছিল, কখনো কখনো ব্রাহ্মসমাজ হইতে কালীমোহনবাবুকে কিছু কিছু দেওয়া হইত, তাহা আট দশ টাকার অধিক নহে। একবার দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা হইলে আমার মনে চিন্তা আসিল যে, দুর্ভিক্ষ হইলে এই পরিবারের কিরূপে দিন চলিবে? আমার প্রশ্নের উত্তরে চন্দ্রনাথবাবু সহাস্যমুখে একটি উত্তর দিলেন, সে উত্তরটি আজিও আমার প্রাণে জাগিয়া আছে। তিনি বলিলেন, "চিন্তা কি? যে ত্রিশ টাকা বেতন পাই, উহাকে দ্বিগুণ করিয়া লইলেই হইবে।" আমি বলিলাম, "কি করিয়া দ্বিগুণ করিবেন?" তিনি বলিলেন, "কেন? একবেলা আহার করিলেই বেতন দ্বিগুণ করা হইল।" আমি ভাবিলাম কালীমোহনবাবুর উপযুক্ত ভ্রাতা বটে!

তখন বরিশালের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অধিকাংশই অত্যন্ত গরীব ছিলেন, যে কয়েক ঘর অবস্থাপন্ন ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র জমিদার রাখালচন্দ্র রায় ভিন্ন ব্রাহ্মধর্ম্মের কি ব্রাহ্মসমাজের সহিত আন্তরিক যোগ প্রায় কাহারই ছিল না। অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই মজুমদার-পরিবারের সঙ্গে আমরা এমনই মিলিয়া গেলাম যে, দুইটি পরিবার যে হঠাৎ আসিয়া মিশিয়াছে তাহা বুঝিবার কারণ থাকিল না। কিন্তু এই মিলন অচিরে বিচ্ছেদে পরিণত হইল। মজুমদার-গৃহিণী ঢাকার ইডেনফিমেলস্কুলের শিক্ষয়িত্রী মনোনীতা হইলেন, বেতন স্থির হইল মাসিক চল্লিশ টাকা। যদিও তাঁহাদের বিচ্ছেদ বরিশালের ব্রাহ্মদিগের এবং ব্রাহ্মবন্ধুদিগের নিকট অত্যন্ত তীব্র হইয়াছিল, তথাপি তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া সকলেই এই কার্য্য গ্রহণের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করিলেন। উভয় পক্ষকেই অশ্রুপূর্ণ-নয়নে পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। মজুমদারমহাশয় কয়েক মাসের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়া সমধর্ম্মিণীর সহিত ঢাকা গেলেন। এই সময়ে ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় এম, বি, পরীক্ষায় প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং শ্রীমতী নির্ম্মলার সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে।

নূতন গৃহস্থালী

মজুমদার-পরিবার বরিশাল ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, আমরা এতদিন একটি প্রকাণ্ড তরুর আশ্রয়ে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া নিশ্চিন্তে বাস করিতেছিলাম,, আজ সে আশ্রয়তরু স্থানচ্যুত হইল। কাজেই আমরা উড়িয়া গিয়া আর একটি তরুতে বসিলাম। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন দত্ত মহাশয় বরিশাল জেলাস্কুলের একজন শিক্ষক, তখন তাঁহার বেতন ৫০ টাকা মাত্র ; কিন্তু তিনি 'বয়েজ বুক' (Boys' Book) প্রভৃতি ছোট ছোট ইংরাজী পুস্তক লিখিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। তখন সে ধরণের গ্রন্থ বড় বেশী প্রচলিত হয় নাই, আনন্দবাবুর পুস্তকের যথেষ্ট কাটতি ছিল। তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই 'মাষ্টারমহাশয়' বলিয়া ডাকিত, এখন হইতে আমিও তাঁহাকে 'মাষ্টারমহাশয়' বলিব।

মাষ্টারমহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ত্রিপুরা জেলার কালীকচ্ছগ্রামনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ধার্ম্মিকপ্রবর ৺আনন্দচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী। আনন্দ নন্দী মহাশয় 'আনন্দস্বামী' নামে পরিচিত ছিলেন। অনেকে তাঁহাকে 'দয়াময়' বলিয়াও ডাকিত, ইহার কারণ এই যে, তিনি লোকদিগকে 'দয়াময়' মন্ত্র প্রদান করিতেন এবং তিনি নিজেও দয়ার অবতার ছিলেন। তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষের একখানা জীবনচরিত হওয়া আবশ্যক। এস্থলে বেশী বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

মাষ্টারমহাশয়ের সহধর্ম্মিণীকে ব্রাহ্মসমাজের সকলেই 'নূতন ঠাকুরাণী' বলিয়া ডাকিত, আমিও এই গ্রন্থে তাঁহাকে 'নূতন ঠাকুরাণী'ই বলিব। মাষ্টারমহাশয়ের তিনটি কন্যা ও দুইটি পুত্র। নূতন ঠাকুরাণী সরল-হৃদয়া, সহৃদয়া, বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মপরায়ণা। মাষ্টারমহাশয়ও খুব সরল লোক।

মাষ্টারমহাশয়ের বাড়ীতে পাঁচখানা খড়ো ঘর, একখানা বাহিরে ও চারিখানা ভিতরে। ঘরগুলির চাল উলুখড়ের এবং বেড়া নলের ও হোগলাপাতার। একখানা ঘর কিছু বড় এবং ভাল খুঁটির উপর স্থাপিত, অপরগুলি ছোট ছোট, খুঁটিগুলি বাঁশের। তিনি দুইখানা

ছোট ঘর আমাকে দিলেন, একখানা শয়নগৃহ, অন্যখানা রান্নাঘর। বলা বাহুল্য যে তাঁহারা নিজেদের অসুবিধা করিয়াও আমাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন এবং আমাদের সুখসুবিধার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়াছেন। নূতন ঠাকুরাণী আমাদিগকে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। বাঁশের খুঁটির ঘর ঝড়ের সময়ে নড়িয়া উঠিত। আমরা পূর্ব্বে কখনো এরূপ ঘরে বাস করি নাই, তাই প্রথম প্রথম ভয় হইত, বুঝি ঘর পড়িয়া গেল, ক্রমে সকলই সহিয়া গেল।

এইবারে আমরা নূতন গৃহস্থ হইলাম। কতকগুলি মেটে হাঁড়িকলসী এবং যেসকল জিনিস একান্ত না হইলে নয় তাহাই কিনিলাম। প্রথম ঘরকন্না পাতিবার সময়ে নূতন ঠাকুরাণী খুব সাহায্য করিলেন। তিনি সমস্ত বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বোধ হয় এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমাকে কয়েকটি টাকা দেওয়া হইয়াছিল্। নতুবা নূতন সংসারপাতার খরচ কোথায় পাইলাম? কিন্তু ঠিক কথা মনে নাই। মাষ্টারমহাশয়ের পরিবারে একটী স্ত্রীলোক ছিল, তাহার নাম 'হেম', সম্পূর্ণ নামটা বোধ হয় হেমলতা, সে চাকরাণীর ও রাঁধুনীর কার্য্য করিত। চেহারা ও আচরণ দেখিয়া মনে হয় সে কোনো ভদ্রলোকের মেয়ে, অদৃষ্টের ফেরে পড়িয়া এই অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। তাহার বড়ই একটা খারাপ অভ্যাস ছিল, সে প্রতিদিন দুই আনার আফিং খাইত, এতদ্ভিন্ন তাহার অন্য কোনো দোষ ছিল না। হেম একসঙ্গে আমাদেরও বাজার করিয়া আনিত এবং অবকাশসময়ে মনোরমার গৃহকার্য্যেরও সাহায্য করিত। হেমকে মাষ্টারমহাশয়ের ছেলেমেয়েরা হেমদিদি ডাকিত, আমার ছেলেরাও সেইরূপ ডাকিতে লাগিল।

মাষ্টারমহাশয়ের মেয়ে সরলা, সুবালা ও অমলা আমাদের ছেলেদুটিকে লুফিয়া লইল। ছেলেরাও তাহাদিগকে বড়দিদি, মেজদিদি ও ছোটদিদি বলিয়া ডাকিত এবং ভালবাসিত। মাষ্টারমহাশয়ের পুত্রকন্যাগণ মনোরমাকে খুড়ীমা ডাকিত।

মনোরমা নূতন সংসারে গৃহিণী হইলেন। দু'বেলা রান্না করা, গৃহ পরিষ্কার করা, জল তোলা, বাসন মাজা ইত্যাদি সকল কার্য্যই তাঁহাকে করিতে হইল। তিনি অতিশয় আদুরে মেয়ে ছিলেন, এসকল কার্য্য কখনো করেন নাই এবং করিবেন এরূপ কল্পনাও মনে আসে নাই। যদিও কুকুটীয়ার দত্তপরিবারের অবস্থা খারাপ হইয়াছিল, তথাপি মনোরমার সেখানে যত্নের অবধি ছিল না। সেখানে তাঁহাকে কখনো সন্তানপালন করিতেও দেওয়া হয় নাই। এই বাইশ বৎসর বয়সেও তিনি সে বাড়ীর বালিকা কন্যা ছিলেন। সেই মনোরমা সহসা আসিয়া পাচিকা ও পরিচারিকা হইলেন। এক হাতে তাঁহাকে সংসারের সমস্ত কার্য্য করিতে হইল। এইসমস্ত কার্য্য মনোরমা এরূপ স্ফূর্ত্তির সহিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অনায়াসে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন যে দেখিলে কেহ নিশ্চয়ই মনে করিত যে বহুদিন হইতে তাঁহার এরূপ কার্য্য করার অভ্যাস আছে। আমার সঙ্গে আসার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মনোরমা যেরূপ যত্ন ও আদর পাইয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গের কোনো মধ্যবিৎ লোকের কন্যার ভাগ্যে সেরূপ কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু অনায়াসে অল্পদিনের মধ্যেই মনোরমা তাহা ভুলিয়া গেলেন। ক্ষুদ্র কুটীরঘরে সংসার পাতিয়া আপন হাতে রান্না করিয়া তিনি যখন আমাকে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিলেন, তখনি একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দে তাঁহার গণ্ডদেশ রক্তিম হইয়া উঠিল, ওষ্ঠাধরে মৃদু হাস্য দেখা দিল, নয়নযুগল উল্লসিত হইল। ইতঃপূর্ব্বে এরূপ স্বাধীনভাবে তিনি কখনো স্বহস্তে স্বামীসেবা করেন নাই। আমিও স্ত্রীর হাতের প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন ও তাঁহার পরিবেশন আজই প্রথম পাইলাম। আমাদের উভয়ের অন্তরে একটি মুক্তভাব উপস্থিত হইল।

আমরা প্রাতে সকলে মিলিয়া একটু উপাসনা করি, পরে মনোরমা সংসারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন; আমি লোকদের সহিত তর্ক করি, আলোচনা করি, বক্তৃতা করি, সমাজে আচার্য্যের কার্য্য করি, কিছু

কিছু লেখাপড়া করি এবং সময় পাইলে মনোরমার সংসারকার্য্যের সাহায্য করি। এই নূতন গৃহস্থালীতে প্রবৃত্ত হইয়া মনোরমার ধ্যানে বসিবার সময় হয় না, রাত্রের আহারের পরে কোনো কোনো দিন বসেন, রাত্রি প্রভাত হইলে আমি কাণে নাম বলিয়া বাহ্যস্ফূর্ত্তি সম্পাদন করি। এইরূপে এই বাড়ীতে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। এই দুই বৎসরের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

এই দুই বৎসর কিরূপে সংসার চলিল তাহা আগে বলা কর্ত্তব্য। প্রচারকের বৃত্তিস্বরূপ মাসিক ১২৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা বরিশাল-ব্রাহ্মসমাজ হইতে পাইতে লাগিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি যখন মনোরমাকে তাঁহার পিত্রালয় হইতে লইয়া আসি তখন মনোরমার ভ্রাতা তারকবাবু বাড়ীতে ছিলেন না। তিনি বাড়ী আসিয়া সমস্ত ঘটনা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন, মনোরমার যাহা কিছু অলঙ্কারপত্র ছিল এবং তাঁহার অন্যান্য জিনিসপত্র যাহা ছিল সে সমস্ত আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সেগুলি পাইয়া আমাদের নূতন সংসারে সংসার-কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কোনো জিনিসের অপ্রতুল রহিল না। কিন্তু অর্থাগম যে অন্য কোথাও হইতে কিছু হইয়াছিল তাহা মনে হয় না। এই অত্যল্প আয় দ্বারা যেরূপে আমরা দিন কাটাইয়াছি তাহাতে আমাদের শরীরের স্বাস্থ্য ও মনের আনন্দ কিছুই বিনষ্ট হয় নাই। মুলো বা ডাঁটা তরকারী দিয়া মসুরের ডাইল এবং নারিকেল দিয়া 'ঢেঁকিরশাক' রাঁধিয়া গরম গরম ভাত মনোরমা পরিবেশন করিতেন, আমাদের শরীর ও আত্মা উভয়ই অতুল আনন্দে তাহা গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হইত। ছেলেদের জন্য দুগ্ধের বন্দোবস্ত ছিল। মনোরমা এই নূতন সংসার পাতিয়াই নিরামিষ আহার ধরিলেন, জীবনে আর কখনো আমিষ আহার করেন নাই।

———

একটী বিশেষ অবস্থা

মনোরমার দীক্ষাগ্রহণ ও সমাধির অবস্থালাভের ন্যূনাধিক দুই বৎসর পরে, তাঁহার চব্বিশ বৎসর বয়সে, একদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলিলেন যে তাঁহার শারীরিক ভোগসুখেচ্ছা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তিনি একটি বিশেষ প্রবৃত্তির হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। আমি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, কেননা পূর্ব্বে এরূপ কথা আমি সাক্ষাৎভাবে কাহারও মুখে কখনও শুনি নাই। মনোরমার কথা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ ছিল না, কেননা প্রথমতঃ তাঁহার অসত্য বাক্য বলার সম্ভাবনা ছিল না, দ্বিতীয়তঃ বিশেষভাবে অনুভব না করিয়া একটা সাময়িক অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া তিনি একথা বলেন নাই, তাঁহার সেরূপ স্বভাব নয়; তৃতীয়তঃ ধার্ম্মিকা বলিয়া আপনাকে পরিচিত করার চেষ্টাকরা একান্তই তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ কার্য্য, চতুর্থতঃ মানুষের যে এইরূপ একটা অবস্থা হইতে পারে তাহা তিনি আদৌ জানিতেন না এবং কখনও কাহারও মুখে শুনেন নাই।

স্বামী যতটা বিশেষ করিয়া স্ত্রীকে এবিষয়ে প্রশ্ন করিতে পারে আমি তাহা করিলাম, তাঁহার উত্তর অতি পরিষ্কার। আমার সমস্ত প্রশ্ন এবং তাঁহার সমস্ত উত্তর লিখিতে পারা যায় না। তাঁহার শেষ উত্তর এই—"সে প্রবৃত্তির অস্তিত্বই আমার অনুভূত হয় না।" আমি বলিলাম, "এরূপ অবস্থালাভের জন্য তোমার কি কোনো প্রযত্ন ছিল?" উত্তর, "একেবারেই না, আমি কখনো মনেও ভাবি নাই যে এইরূপ একটা অবস্থা হইতে পারে।" তাঁহার কথায় আমার নিকট একটা নূতন জগৎ প্রকাশিত হইল। আমি গীতা প্রভৃতিতে পাঠ করিয়াছি যে, সাধকগণ প্রবৃত্তিকে পরাজয় করিতে পারেন কিন্তু একজন অবলা কোনও প্রকারের উগ্র তপস্যা না করিয়া জিতকাম হইবেন ইহা কখনও কল্পনা করি নাই। জিতকামই বা কেন বলি? তিনি ত প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করেন নাই, সে ত আপনিই মরিয়া গিয়াছে, কে তাহাকে

এরূপভাবে বিনা যুদ্ধে পরাস্ত করিল? ইহা সদ্‌গুরুপ্রদত্ত নামের মাহাত্ম্য ভিন্ন আর কি হইতে পারে? নিজের শক্তিতে কেহই এরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারে না, ইহাই আমার বিশ্বাস হইল।

মনোরমার এ প্রকার একটা অবস্থালাভের কথা আমি আমার কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট বলাতে তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, "বোধ হয় এ বিষয়টা বুঝিতে তিনি ভুল করিয়া থাকিবেন। কারণ ঐরূপ অবস্থা লাভ হইলে তাঁহার গর্ভধারণ সম্ভব হইত না। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার মনে একটু খট্‌কা জন্মিল। মনোরমাকে আমি বলিলাম যে, "তুমি যাহা বলিতেছ তাহা বোধ হয় শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিবে না।" তিনি সহাস্যে অথচ সজোরে বলিলেন, "যদি এমন কথা কোনো শাস্ত্রে থাকে তবে সে শাস্ত্র মিথ্যা।" তাঁহার কথা এই যে এমন কথা কোনো শাস্ত্রে থাকিতে পারে না। অতঃপর একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ও একজন সুবিজ্ঞ কবিরাজকে একথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহাদের উভয়েরই একই মত, একই কথা। তাঁহারা বলিলেন যে "এরূপ অবস্থালাভ হইলেও স্ত্রীলোক গর্ভধারণ করিতে পারে।" তাঁহারা এবিষয়ে অনেক চিকিৎসাশাস্ত্রোক্ত প্রমাণও দেখাইলেন। তাঁহাদের কথা শুনিয়া আমার সমস্ত সংশয় কাটিয়া গেল।

এই অবস্থালাভের পরে মনোরমা দশবৎসর দেহে ছিলেন, এই দীর্ঘকাল মধ্যে কখনও তাঁহার এই অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই।

নানাকথা

এই বাড়ীতে আমরা দুই বৎসরের অধিক কাল ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে আমাদের প্রথমা কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

এই সময়ে খৃষ্টানগণ খৃষ্টধর্ম্মে আমার বিশ্বাস জন্মাইতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন কি আমি যাহাতে খৃষ্টান হই সেজন্য তাঁহারা বিশেষ ভাবে একদিন প্রার্থনাও করিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড জয়নাথ

চৌধুরী মহাশয় প্রকৃত বিশ্বাসী ও ভক্ত খৃষ্টান ছিলেন, তাঁহার ন্যায় ত্যাগী ও সরল বিশ্বাসী খৃষ্টান আমি দেখি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ দুই তিন দিন তিনি আমার সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিতে আসিতেন। তিনি আমাকে ভালবাসিতেন এবং যিশুকে বিশ্বাস না করিয়া আমি যে অনন্ত নরকে যাইব এজন্য তিনি সত্য সত্যই দুঃখিত ছিলেন। একদিন সকালবেলায় আমাদের বাহিরের ঘরে বসিয়া উক্ত চৌধুরীমহাশয় ও আমি খৃষ্টানধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া বিচার বিতর্ক করিতেছিলাম, আমার একজন মাতুলও সেই সময়ে উপস্থিত হইয়া আমাদের বাদানুবাদ শুনিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ পাশের ঘর হইতে একটি সদ্যপ্রসূত সন্তানের ক্রন্দনধ্বনি উঠিল, ধাত্রী ডাকিয়া বলিল, "মেয়ে হয়েছে" (১১ই কার্ত্তিক ১২৯৪)। উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে, পাশের ঘরে কেহ সন্তান প্রসব করিতেছিলেন, অথচ এত কাছে থাকিয়াও কেহই বিন্দুমাত্র তাহা জানিতে পারেন নাই। মনোরমা খুব সুপ্রসূতি ছিলেন কিন্তু তাঁহার ধৈর্য্যও অসাধারণ ছিল।

দেবতার কৃপা

একবার পূজার ছুটীতে মাষ্টারমহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরলার বিবাহ দেওয়ার জন্য স্বদেশে ত্রিপুরা জেলায় সপরিবারে চলিয়া গেলেন। আমরা একাকী এই বাড়ীতে রহিলাম। শারদীয়পূজার সময়ে বরিশাল সহরটা একরূপ ছাড়া পড়িয়া যায়, কেননা সহরে বাসিন্দা লোক অতি অল্প, অধিকাংশই বাসাড়ে, তাহারা সকলেই বাড়ী যায়, দুর্গোৎসবের সময়ে বরিশালের যে হিন্দু বাড়ী যাইতে না পারে, সে আপনাকে অতীব দুর্ভাগা মনে করে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা সাধারণতঃ এই সময়ে সহরেই থাকেন, কেননা তাঁহারা অধিকাংশই বাড়ী ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছেন। মাষ্টারমহাশয় অনেক

বৎসরের পরে এবার দেশে গেলেন, আমরা বড়ই একলা পড়িয়া গেলাম। সহরের অধিকাংশ বাড়ীরই বাহির হইতে দরজা বন্ধ, ব্রাহ্ম-দিগের মধ্যে যাঁহারা আমাদের সংবাদ লইয়া থাকেন তাঁহাদের সকলের বাড়ীই অনেকটা দূরে; বিশেষ চেষ্টা-যত্ন করিয়াও একটা চাকর বা চাকরাণী পাওয়া গেল না। বাড়ীতে একটি পুকুর, পুকুরটি একেবারে ঘরের কোণে, বর্ষার প্রাবল্যে পুকুরের কাণায় কাণায় জল, এদিকে আমাদের মেয়েটী এখন হামাগুড়ি দিয়া অনেক দূর যাইতে শিখিয়াছে, কখন গিয়া পুকুরে পড়ে তাহার ঠিক নাই।

একদিন আমি বাহির হইতে আসিয়া দেখিলাম, মনোরমা মেয়েটীর কোমরে একটা কাপড় জড়াইয়া উত্তরের ঘরের বারান্দায় একটা খুঁটির সঙ্গে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া গৃহকার্য্য করিতেছেন। পাছে বালিকাটী হামাগুড়ি দিয়া অলক্ষিতে যাইয়া পুকুরে পড়ে এই জন্যই তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। আমি কাছে যাওয়া মাত্র কন্যাটী আমার দিকে দুই হাত বাড়াইয়া দিল, আমি তাহার বন্ধন মোচন করিয়া সস্নেহে তাহাকে কোলে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম। হঠাৎ এই সময়ে (জানি না কি কারণে) আমার গুরুদত্ত মন্ত্র আমার মনের মধ্যে রেলগাড়ীর চাকার মতন চলিতে লাগিল এবং নামানন্দে আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু মেয়েটী আমাকে কিছুতেই বসিতে দিতেছিল না, আমি চক্ষু বুজিয়া রহিয়াছি, তাহার সঙ্গে কথা বলিতেছি না, তাহাকে আদর করিতেছি না, ইহা তাহার অসহ্য হইল, সে আমার চক্ষুর মধ্যে আঙ্গুল দিয়া মুখের মধ্যে হাত দিয়া আমাকে তাহার দিকে তাকাইতে এবং তাহার সঙ্গে কথা বলিতে বাধ্য করিতেছিল। তখন আমার প্রাণের মধ্য হইতে এই প্রার্থনা আসিল যে, "হে ভগবন্, আমার মলিন ও শুষ্ক চিত্ত তোমার নামে প্রায়শঃ আসক্ত হয় না, যদি বা আজ তোমারই কৃপায় হঠাৎ তোমার নাম মধুময় হইয়া আমার নিকট অযাচিতরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেও আমার ভাগ্যদোষে বিঘ্ন উপস্থিত হইল। এই বালিকা

আমাকে কিছুতেই স্থির হইতে দিতেছে না।" এক পলকমধ্যে দরজায় ধাক্কা পড়িল, কবাট ঠেলিয়া একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "বাবু আপনারা চাকরাণী খুঁজিতেছেন শুনিয়া আমি আসিয়াছি।" আমি বলিলাম, "হাঁ, এই মেয়েটীকে কোলে করিয়া বাহিরে দাঁড়াও, একটু পরে কথা বলিব।" সে আমার কোল হইতে মেয়েটীকে লইল, বালিকা তাহার কোলে যাইতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিল না।

আমি ঘণ্টাধিককাল মনের আনন্দে চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়া রহিলাম। গুরুদত্ত নাম আমার প্রাণমন পুলকিত করিয়া আপনা-আপনি বিচরণ করিতে লাগিল। সে নামকে চালাইতে কি থামাইতে আমার কিছুমাত্র হাত ছিল না। রেলগাড়ী কোনো একটি ষ্টেশনে আসিয়া যেমন আপনি থামে, নামও সেইরূপ আপনি থামিয়া গেল, তখন আমি ভগবানের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া বাহিরে গেলাম এবং দেখিলাম চাকরাণীটী শীতে কাঁপিতেছে। তাহার নাম রঙ্গের মা, একসময়ে সে কিছুদিন আমাদের কাজ করিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম "রঙ্গের মা, তোমার কি হইয়াছে?" সে বলিল তাহার ভয়ানক জ্বর আসিয়াছে, সে কাজ করিতে পারিবে না। রঙ্গের মা কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ী চলিয়া গেল। তখন এই ব্যাপারটি দেবতার বিশেষ কৃপা বলিয়া আমার নিকট স্পষ্ট অনুভূত হইল। কিছু দিন হইতে একটা চাকর বা একটা চাকরাণীর জন্য কত লোককে বলা হইয়াছে, কত অনুসন্ধান করা হইয়াছে, কিন্তু হঠাৎ কাহার মুখে শুনিয়া রঙ্গের মা আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং যতক্ষণ লীলাময় হরি নামরূপে অবতীর্ণ হইয়া এই অধমের হৃদয়ে বিহার করিলেন, শুদ্ধ ততটুকু সময়ের জন্যই সে আমাকে অবসর প্রদান করিল। এই ঘটনাটীর যিনি যেরূপ ব্যাখ্যা করুন, উহা যে দেবতার কৃপা তাহা আমি স্পষ্টই বুঝিলাম। মনোরমাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম, তিনিও ইহা দেবতার বিশেষ কৃপা বলিয়াই বিশ্বাস করিলেন এবং

পরম পরিতুষ্টা হইলেন। তাঁহার সমর্থনে আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল, কেননা তিনি ঘটনাপুঞ্জের বিশ্লেষণ করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতেন না, অন্তরে সত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাকে ভালরূপ জানিতেন তাঁহাদের সকলেরই এবং আমারও তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বিশ্বাস ছিল।

নূতন বাড়ী

পূজার ছুটী ফুরাইয়া গেলে মাষ্টারমহাশয় সপরিবারে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছে, জামাতার নাম শ্রীযুক্ত হরকিশোর বিশ্বাস, ইনি এক্ষণ বরিশালে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্। কিন্তু হায়, তাঁহার সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সরলা পিতা-মাতার বক্ষে নিদারুণ শেলাঘাত করিয়া পতিকে গৃহশূন্য করিয়া কয়েকটি শিশুসন্তান রাখিয়া মায়িক দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সৌম্য পবিত্র মূর্ত্তি ও অমায়িক সরল স্বভাব এখনও আমাদের প্রাণে তাঁহাকে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। মাষ্টারমহাশয়ের পুত্র-কন্যাগণ সকলেই আমাকে 'কাকা' ও মনোরমাকে 'খুড়ীমা' বলিয়া ডাকিত, তাহাদের প্রতি আমাদেরও অপত্যস্নেহ জন্মিয়াছিল। মনোরমা সরলাকে খুব ভালবাসিতেন, সরলার মধ্যে যে কিছুমাত্র চাপল্য ছিল না, এই ভাবটি তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। মাষ্টার-মহাশয়ের কন্যা তিনটীই চমৎকার। মনোরমার দেহত্যাগের অনেক বৎসর পর সরলা দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই কথাটী যে লিখিলাম, ইহার বিশেষ কারণ আছে, মনোরমা যাহাদিগকে বিশেষভাবে স্নেহ করিতেন, তাহাদের কাহারও বিয়োগ-শোকই তাঁহাকে পাইতে হয় নাই। তাঁহার দেহত্যাগের পরে যেমন আমাদের পরিবারে তেমনই আমাদের বান্ধবমণ্ডলীতে শোকের ঝড় বহিয়াছে ও বহিতেছে, আনন্দপুরীতে ভাঙ্গন লাগিয়াছে।

ইহার কিছুদিন পরে মাষ্টারমহাশয় একটী পাকা বাড়ী ক্রয় করিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও নূতন বাড়ীতে চলিলাম। তাঁহার নূতন বাড়ীর সংলগ্ন অনেকটা খোলা জমি ছিল। মনোরমার যে যৎকিঞ্চিৎ গহনাপত্র ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া উক্ত জমিতে একখানি শয়নগৃহ ও একখানি রান্নাঘর প্রস্তুত হইল, বলা বাহুল্য ঘর দুখানি খড়ের ঘর।

যতদিন আমাদের ঘর প্রস্তুত হইয়া উহা বাসোপযোগী না হইল ততদিন আমরা মাষ্টারমহাশয়ের বাড়ীতেই রহিলাম। আমাদিগকে স্থান দিতে গিয়া মাষ্টারমহাশয়কে অনেক স্বার্থত্যাগ করিতে হইয়াছিল। নূতন ঠাকুরাণী এবং তাঁহার কন্যাগণ আমাদের সুখসুবিধার জন্য, যাহার যেমন সাধ্য যত্ন ও স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন। এই সময়ে আমাদের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ নিত্যরঞ্জন সান্নিপাতিক জ্বররোগে দীর্ঘদিন ভুগিয়াছিল, মাষ্টারপরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে থাকায় আমাদিগকে এ অবস্থায় কিছুই অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই।

আমরা যখন নূতন বাড়ীতে ঘর বাঁধিলাম এবং মাষ্টারমহাশয়ের বাড়ী হইতে নামিয়া নূতন ঘরে প্রবেশ করিলাম, সেই সময়কার একটী ঘটনা আজি মনে হইতেছে। যেসকল নমশূদ্র মাটি কাটিয়া আমাদের ঘরের পোতা বাঁধিয়াছিল, তাহাদিগকে একদিন খাওয়ান হইল। মনোরমা অতি যত্নে তাহাদিগকে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিলেন, মনে হয় যেন তাহাদের জন্য কিছু মিষ্টান্নও প্রস্তুত করা হইয়াছিল। আহারান্তে সেই নমশূদ্র অতিথিগণ তাহাদের পাতা উঠাইতে এবং স্থান পরিষ্কার করিতে নিবারিত হইল, মনোরমা স্বহস্তে তাহাদের পাতা ফেলিলেন এবং স্থান পরিষ্কার করিয়া গোময় দ্বারা লেপন করিলেন। তাহারা যতই সামান্য লোক হউক না কেন তাহাদিগকে যে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান হইয়াছে, অতিথি কি উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিবে?

নূতন ঘরে আসিয়া যেদিন মনোরমা কলসী কক্ষে লইয়া পুকুর

হইতে জল আনিতে গেলেন, মধ্যপথে কলসী লইয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন; নূতন ঠাকুরাণী প্রভৃতি দৌড়াইয়া আসিয়া ধরিলেন, কলসীটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কাপড় সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছে, শরীরেও কিছু আঘাত লাগিয়াছে, কিন্তু মনোরমা হাসিয়া কুট্‌পাট্‌। এ বাড়ীতে পুকুরটা একটু দূরে ছিল এবং কক্ষে বড় কলসী লইয়া জল আনিবার অভ্যাসও তাঁহার ছিল না। এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি এইজন্য লিখিলাম যে, কোন অবস্থাই তাঁহাকে মলিন করিতে পারে নাই। যখন কলসী লইয়া মনোরমা পড়িয়া গেলেন, তখন আমি অদূরে ছিলাম, দৌড়াইয়া কাছে গেলাম, তিনি ওষ্ঠাধরে হাসি চাপিতে চাপিতে ঘরে আসিলেন, সে দৃশ্য এখনও আমার চক্ষের উপর ভাসিতেছে।

বোলপুর যাত্রা

কিছুদিনের মধ্যে মনোরমার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল, অতিরিক্ত পরিশ্রমে আমারও শিরঃপীড়া জন্মিল। লাখুটীয়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ৺রাখালচন্দ্র রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা ৺সুশীলা দেবী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ; তিনি আমাদের শরীরের অবস্থা খারাপ দেখিয়া বোলপুরে শ্রীমন্মহর্ষির শান্তিনিকেতনে কিছুকালের জন্য আমাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন। আমরা বোলপুরে রওয়ানা হইলাম। এই সময়ে আমরা একটী হিন্দুস্থানী ঝি পাইয়াছিলাম। সেই ঝি এবং খুলনা জেলার মহেশ্বরপাশা গ্রামনিবাসী শ্রীমান্‌ উপেন্দ্রনাথ মজুমদার আমাদের সঙ্গে চলিল। বোলপুর পর্য্যন্ত যাওয়ার খরচ কোথা হইতে জুটিয়াছিল এখন মনে নাই।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীমহাশয় স্থানীয় ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসবোপলক্ষে বরিশালে গিয়াছিলেন, আমরা একই দিনে বরিশাল হইতে রওয়ানা হইলাম, তিনি পিরোজপুরে নামিবেন। ষ্টীমারে শাস্ত্রীমহাশয় আমাকে বলিলেন যে, "আমার আগামী কল্য

কলিকাতার সাধারণব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু বাধ্য হইয়া আমাকে পিরোজপুরে যাইতে হইল, অতএব আমি টেলিগ্রাফ করিয়া দিতেছি, তুমি আগামীকল্য সাধারণব্রাহ্মসমজে বক্তৃতা করিবে। বক্তৃতার বিষয় আমাকে বলিয়া দাও।" আমি তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না, বক্তৃতার বিষয় দিলাম 'ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মবিধান'। ইতঃপূর্ব্বে (আমি যতদূর জানি) সাধারণব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে মফঃস্বলের কোনও লোককে বক্তৃতা করিতে অধিকার দেওয়া হয় নাই।

সন্ধ্যাবেলায় আমরা খুলনা পৌঁছিলাম, সে সময়ে রাত্রিতে গাড়ী ছিল না, খুলনা হইতে কলিকাতা দিনের বেলায় মাত্র একখানা ট্রেণ যাতায়াত করিত, সুতরাং সে রাত্রি আমাদিগকে খুলনায়ই থাকিতে হইল। তখনকার খুলনার প্রসিদ্ধ উকীল ৺প্রাণহরি দাস মহাশয়ের দুই পুত্র ৺গোপালচন্দ্র দাস ও শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র দাস ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, তাঁহারা সযত্নে আমাদিগকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে মতবিরুদ্ধতাহেতু উভয় ভ্রাতা তখন পিতৃকোপে পড়িয়াছিলেন সুতরাং পিতার অর্থ থাকিতেও তাঁহারা দরিদ্রই ছিলেন। দরিদ্র না হইলে দরিদ্রকে কে আদর করিতে পারে? তাঁহাদের দুই ভ্রাতার ও বধূদ্বয়ের আদরযত্নে আমাদের পরম তৃপ্তিবোধ হইল। পরের দিন প্রাতে ৯টার মধ্যে আহার করিয়া আমরা ট্রেণে উঠিলাম, এই অল্প সময়ের মধ্যে এই বন্ধুপরিবারের মেয়েদের সঙ্গে মনোরমার আত্মীয়তা হইল। তাঁহাকে বিদায় দিতে তাঁহারা ব্যথিত হইলেন।

অপরাহ্ণ ৫টার সময়ে ট্রেণ শিয়ালদহ পৌঁছিল, আর ৬টার সময়ে বক্তৃতা। আমার প্রিয়বন্ধু ৺শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে পরিবারবর্গকে নামাইয়া দিয়া, হাতে মুখে একটু জল দিয়াই সারারণ ব্রাহ্মসমাজের দিকে ছুটিলাম, তখন ৫৷৷টা হইয়া গিয়াছে, আমি পৌঁছিলে অবিলম্বে ৬টা বাজিল এবং বক্তৃতা আরম্ভ হইল। সেদিনকার বক্তৃতায় আমি এই কথা বলিয়াছিলাম যে, "বুদ্ধিপ্রসূত ধর্ম্মমত

পাণ্ডুলিপির ন্যায়, পাণ্ডুলিপি যতক্ষণ রাজস্বাক্ষরযুক্ত না হয় ততক্ষণ উহা আইন বলিয়া পরিগণিত হয় না, সেইরূপ ধর্ম্মমতগুলি যতক্ষণ ভগবানের আদিষ্ট বলিয়া না জানা যায় ততক্ষণ উহার প্রতি শ্রদ্ধা হয় না, উহা অমান্য করিতে আশঙ্কা হয় না ; উহা অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মলাভ হয় না, রাজার স্বাক্ষর চাই ইত্যাদি।"

কলিকাতায় দুই তিন দিন থাকিয়া আমরা বোলপুরে রওয়ানা হইলাম। হাবড়ায় গিয়া জানিলাম, লুপলাইনের গাড়ী এইমাত্র ছাড়িয়া গিয়াছে, বৈকালে গাড়ী আছে, সে গাড়ী সন্ধ্যার সময়ে বোলপুর পৌঁছিবে। কি করিব, হাবড়ায় বসিয়া থাকা অথবা বাড়ীতে ফিরিয়া আসা অপেক্ষা একটা লোকাল ট্রেণ ধরিয়া কোন্নগর পর্যন্ত যাওয়াই ভাল মনে করিলাম, সেখানে কোনো একটা দোকানে রান্না করিয়া খাইব ভাবিলাম। মহেশ্বরপাশার শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ ঘোষ বি, এ, আমাদিগকে ট্রেণে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন, তিনিও কোন্নগর অবধি আমাদের সঙ্গে চলিলেন। সেখানে নামিয়া ষ্টেশনের কাছে একটা বাগানবাড়ী পাইলাম, মুদীদোকানও কাছেই ছিল। সেই বাগানের মালীকে বলিয়া সেখানে খিচুড়ী রান্না করা হইল, বিকালের ট্রেণ ধরিয়া সন্ধ্যাবেলা বোলপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ঠাকুরবাবুদের আদেশানুসারে বোলপুর শান্তিনিকেতনের আশ্রমধারী শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (ইনি এখন একজন বিখ্যাত বাংলা লেখক) মনোরমার জন্য ষ্টেশনে পাল্কী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা নির্দ্দিষ্ট ট্রেণে না পৌঁছায় বেহারাগণ ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া গিয়াছে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে, আমাদের আসা হইল না, তাই তিনি আর ষ্টেশনে লোক পাঠান নাই। কাজেই আমরা কি করিব, কোথায় যাইব স্থির করিতে পারিতেছিলাম না, অবশেষে একখানি গোরুর গাড়ী ভাড়া করা হইল। আমাদের নদী নালার দেশ, দেশের লোকেরা গোরুর গাড়ী কখনো চক্ষেও দেখে নাই, আমরাও জীবনে কখনো গোরুর গাড়ী চাপি নাই, গাড়ী কিছুদূর

চলিতে না চলিতেই মনোরমা বমি করিতে লাগিলেন, ছেলেগুলি কাঁদিতে লাগিল, শেষে উপেন ও আমি ছেলেদুটিকে সঙ্গে করিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। গোরুর গাড়ীর মতন এমন সুখের বাহন আর নাই, হয় পেটের ভাত হজম করিবে না হয় উদ্গিরণ করাইবে। যাহা হউক, প্রায় একঘণ্টার মধ্যেই আমরা শান্তিনিকেতনে পৌঁছিলাম। যে স্থানে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত সে স্থানটীর নাম 'ভুবনডাঙ্গা'।

বোলপুর শান্তিনিকেতন

রাত্রে আশ্রমধারী মহাশয় আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, শ্রান্তিবশতঃ আমরা সুখে নিদ্রা গেলাম। প্রভাতে উঠিয়া আমরা ঘুরিয়া ফিরিয়া আশ্রম দেখিতে বাহির হইলাম। বোলপুরে আসা সম্বন্ধে আমি যখন শ্রীশ্রীগুরুদেবের আদেশ চাহিয়াছিলাম, তখন আদেশ প্রদান করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "বোলপুর স্থানটী বেশ, খুব প্রকাণ্ড মাঠ আছে, সেদিকে তাকাইলে একটা অনন্তের ভাব প্রাণে জাগিয়া উঠে।" আজ বাহির হইয়াই তাঁহার সেই কথা স্মরণ হইল এবং তাঁহার কথিত ভাবটি হৃদয়ে অনুভব করিলাম। প্রকাণ্ড মাঠ; আমাদের দৃষ্টিব্যাপিকা রেখা উহার অর্দ্ধপথে নিবৃত্ত হইয়াছে। ছেলেদুটি মনের আনন্দে প্রাণ খুলিয়া মাঠে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আমাদের সকলের মনেই একটা নূতন দেশে আসার নূতন আনন্দ জাগিয়া উঠিল।

ভুবনডাঙ্গা বোলপুর সবডিভিশন হইতে দুই মাইল ব্যবধান। ডাঙ্গা অর্থ উচ্চভূমি, পশ্চিমে ইহাকে টাঁড় বলে। রায়পুরের সিংহ মহাশয়েরা এইসকল জমির স্বত্বাধিকারী, সুবিখ্যাত বারিষ্টার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (Mr. S. P. Sinha) মহাশয় এই পরিবারের উজ্জ্বল রত্ন। শান্তিনিকেতনের ছাদ হইতে সিংহমহাশয়দিগের বাড়ী দেখা যায়। উক্ত সিংহপরিবারের একজন কর্ত্তার সহিত প্রধান

আচার্য্য মহাশয়ের বন্ধুত্ব ছিল, তিনি তপস্যার জন্য এই ডাঙ্গাটীর কতকাংশ মহর্ষিকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে এই মাঠে দিনে ডাকাতি হইত, এখনও সপ্তপর্ণী বৃক্ষমূল খনন করিলে নাকি মানুষের মাথা পাওয়া যায়। দিব্য দোতলা প্রাসাদ, ঘরগুলিতে কার্পেট পাতা, আসবাব্ জিনিসপত্র সমস্তই ধনিজনোপযোগী। প্রাসাদের সঙ্গে সুন্দর বাগান, মাঝে মাঝে শালবৃক্ষ, সেখানে যা কিছু আছে সমস্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝরঝরে, অদূরে সপ্তপর্ণীবৃক্ষতলে মর্ম্মররচিত বেদী, সেই বেদীতে বসিয়া মহর্ষি উপাসনা করিতেন, সেখান হইতে সাঁওতাল পরগণার পর্ব্বতশ্রেণী নীলবর্ণ মেঘমালার ন্যায় প্রতিভাত হয়। সাধনের উপযুক্ত স্থান বটে।

আজকাল ভুবনডাঙ্গায় সে নির্জ্জনতা নাই, রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সুতরাং ছাত্র ও শিক্ষকগণে ভুবনডাঙ্গা পরিপূর্ণ; খেলাধূলা, গানবাদ্য, বক্তৃতা, অভিনয় ও অধ্যয়ন অধ্যাপনায় স্থানের অবস্থা অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তখন সেখানে একটী মাত্র ভবন ছিল 'শান্তিনিকেতন' কিন্তু এক্ষণ প্রকাণ্ড ও সুসজ্জিত ব্রহ্মমন্দির উঠিয়াছে, রবিবাবুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অনেক ঘর বাড়ী, তদ্ভিন্ন আরও কয়েকটা বাড়ী উঠিয়াছে। এক্ষণ সেখানে অনেক সদনুষ্ঠান হইতেছে, কিন্তু সেই নির্জ্জনতার গাম্ভীর্য্যটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তখন সেখানে গেলে মনে হইত যেন শুধু পরমার্থচিন্তার জন্যই এখানে আসা, এখন সেখানে গেলে অনেক কাজের কথা মনে আসে।

আশ্রমধারী অঘোরবাবু আমাদের সংসার পাতিয়া দিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের হুকুম ছিল যে, যতদিন আমি শান্তিনিকেতনে সপরিবারে থাকিব, আমার সমস্ত সংসারখরচ ঠাকুরবাবুদের সরকার হইতে দেওয়া হইবে। আমাদের আবশ্যকমত অঘোরবাবু সমস্ত জিনিসের জোগাড় করিয়া দিলেন। রান্না করার জন্য একটি ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু দুইদিন তাহার রান্না খাইয়াই আমরা বুঝিলাম যে, ইহার হাত হইতে মুক্তিলাভ না করিতে পারিলে রক্ষা নাই, কিন্তু তখন মনোরমার

শরীর অসুস্থ, কাজেই বাধ্য হইয়া আরও কিছুদিন তাহার কৃত ব্যঞ্জনরূপ পাচন সেবন করিতে হইল। তবে যথেষ্ট দুগ্ধ ছিল, এজন্য আহারের অসুবিধা হইত না।

আমরা ছেলেদেরে লইয়া সকাল বিকাল বেড়াইতাম, কন্যাটীকে হিন্দুস্থানী ঝি কোলে করিয়া লইত, উপেন এবং আমি ছেলেদুটির হাত ধরিয়া মনোরমাকে সঙ্গে লইয়া অনেক দূরে দূরে বেড়াইতে যাইতাম, ছেলেরা আমাদের হাত ছাড়িয়া দিয়া পাথর কুড়াইত এবং ছুটাছুটি করিত। ফিরিয়া স্নান করিয়া আমরা পারিবারিক উপাসনা করিতাম, অঘোরবাবু এবং কখনো কখনো তাঁহার পত্নী আমাদের উপাসনায় যোগ দিতেন। বোলপুরের কয়েকটি ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন, ইঁহাদের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়স্থান কুলীন-গ্রামের বসু রামানন্দের সন্তান শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু মহাশয় একজন, ইনি বোলপুরের একজন প্রধান উকীল। ইঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, এবং আমার সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। যেদিন সময় ও সুবিধা হইত সে দিন মনোরমা ধ্যানে বসিতেন, অঘোরবাবু প্রভৃতির নিকট ইহা গোপন রাখার চেষ্টা হইত, তথাপি বেশীদিন গোপন থাকিল না।

প্রাসাদপরিত্যাগ

শান্তিনিকেতনের দিব্য প্রাসাদে আমাদের বেশী দিন বাস করা হইল না। একদিন মনোরমা বলিলেন, "এ বাড়ী আমার ভাল লাগিতেছে না, এখানে বাস করিতে কেমন একটা ভাব মনে আসে, যাহা আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে মিশ খায় না।" আমি বলিলাম, "এমন চমৎকার বাড়ীতে বাস করা আমাদের অবস্থার লোকের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়, বিশেষতঃ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আমরা এখানে আসিয়াছি, এরূপ অবস্থায় এমন উৎকৃষ্ট প্রাসাদে বাস করিতে তোমার

ইচ্ছা হইতেছে না কেন?" মনোরমা আমার কথার উত্তরে বিশেষ কিছু বলিলেন না, তবে বুঝা গেল তাঁহার মনে কেমন একটা ভাব আসিয়াছে। যাহা হউক এ বিষয় লইয়া সেদিন আর কোনো কথা হইল না, কেননা বোলপুরে থাকিতে হইলে এই বাড়ীতেই থাকিতে হইবে, অন্য উপায় নাই।

ইহার পরে একদিন বিকাল বেলায় বেড়াইতে বেড়াইতে আমরা শান্তিনিকেতনের দক্ষিণ দিকে খানিকটা দূরে চলিয়া গেলাম। সম্মুখেই একটি জলাশয় দেখিলাম, সেটি একটি উচ্চ বাঁধে বেষ্টিত দহ, দহটি বেশ বৃহৎ; বৈকালিক সমীরসঞ্চারে উহাতে বীচিমালা নৃত্য করিতেছে। চারিদিকে তালবৃক্ষের শ্রেণী, সেই শ্রেণীবদ্ধ তালবৃক্ষরাজি নীলাকাশে মস্তক তুলিয়া বীচিভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে দহের জলে আপনাদের নৃত্যভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতেছে এবং মাথা নাড়িয়া অবিশ্রান্ত সোঁ সোঁ রবে একটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেছে। স্থানটি বেশ নির্জ্জন, দহের উত্তর তীরে একখানা খ'ড়ো বাংলা পড়ো ঘর হইয়া রহিয়াছে। ঘরের সম্মুখে পূর্ব্বদিকে উঠান, উঠানটি শ্রেণীবদ্ধ আমলকী বৃক্ষে ঘেরা, উহাকে আমলককুঞ্জ বলিলে ব্যর্থ নাম হয় না। এই স্থানটী মনোরমার বড়ই পছন্দ হইল, তিনি বলিলেন, যদি এই ঘরখানা আমাদের বাসের জন্য পাওয়া যায় তবে ভাল হয়। আমি মনে মনে ভাবিলাম যে, এরূপ প্রস্তাব শুনিলেও লোকেরা পরিহাস করিবে, এমন প্রাসাদ ছাড়িয়া সাধ করিয়া কোন ব্যক্তি কুটীরে বাস করিতে ইচ্ছা করে? যাহা হউক, তখন মনোরমার প্রতি আমার এতটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তিনি যাহা কিছু ইচ্ছা করিবেন তাহা কল্যাণকরই হইবে, কখনো অমঙ্গলজনক হইবে না। অতএব তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য মনে করিলাম। কিন্তু আমার মনে একটা আশঙ্কা জন্মিল, যদি বা এই বাড়ীতে বাস করার অনুমতি পাওয়া যায় (আমাদের শান্তিনিকেতনে বাসেরই কথা ছিল) তবু এরূপ নির্জ্জন স্থানে একেবারে সহায়সম্বলহীন হইয়া শিশুসন্তানগুলি লইয়া থাকা

উচিত কি না? আমার একটু ভয়ের সঞ্চার হইল, সে কথা মনোরমাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন, ভয়ের কোন কারণ নাই, আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিয়া আশ্রমধারী অঘোরবাবুকে আমাদের প্রার্থনা জানাইলাম। তিনি প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিলেন, পরে আমাদের প্রবল ইচ্ছা দেখিয়া এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম যে, ঐ আমলকীকুঞ্জই মহর্ষি মহাশয়ের প্রথম সাধন ভজনের স্থান, ইহা শুনিয়া ঐ স্থানটির উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিল এবং মনোরমা যে উৎকৃষ্ট স্থানই মনোনীত করিয়াছেন তাহা বুঝিলাম।

প্রাসাদ ছাড়িয়া আমরা কুটীরে আসিলাম, মূল্যবান্ পালঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে শয্যা পাতিলাম। মনোরমার মনের প্রফুল্লতা দেখিয়া বুঝিলাম, তিনি যেন কেমন একটা বদ্ধ ভাবের মধ্য হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। দহের জলে স্নান করিতে আমাদের বড়ই আনন্দ বোধ হইত। পাচক ব্রাহ্মণকে বিদায় করা হইল। মনোরমা দুবেলা স্বহস্তে রান্না করিতে লাগিলেন, আমরা প্রাণ ভরিয়া আহার করিয়া তৃপ্ত হইতে লাগিলাম। প্রত্যুষে উঠিয়া আমরা সংক্ষেপে পারিবারিক উপাসনা করিতাম, তাহার পর বেড়াইয়া আসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করা হইত। খোসাছাড়ান পানিফল দুই পয়সায় প্রায় একসের পাওয়া যাইত, উহা আমাদের জলযোগের একটা অঙ্গ হইল; খাঁটি দুগ্ধ তখন ষোল সের এক টাকায় মিলিত, মনে হয় আমাদের জন্য চারি সের দুগ্ধের বন্দোবস্ত ছিল। কখন কখন সুজীর পায়স অথবা মোহনভোগ দ্বারা আমরা জলযোগ করিতাম। মনোরমা যখন রান্না করিতেন, শ্রীমান্ উপেন ও আমি তখন কখনো গ্রন্থপাঠ, কখনো ধর্ম্মালোচনা করিয়া সময় কাটাইতাম। উপেন্দ্র সুকণ্ঠ গায়ক, তাঁহার মুখে ভগবানের নাম শুনিয়া আমরা বড়ই তৃপ্তি লাভ করিতাম। যখন আমাদের হিন্দুস্থানী ঝি গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকিত, তখন উপেন ও আমি ছেলেদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতাম। বেলা ১টার

সময়ে প্রায় অধিকাংশদিন মনোরমা ধ্যানে বসিতেন, চারিটার সময়ে আমি তাঁহার কাণে অস্ফুট স্বরে গুরুদত্ত নাম করিয়া তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিতাম, পাঁচ সাত বার নাম করিলেই তিনি একবার কাণ ফিরাইয়া নিতেন, মনে হইত যেন তাঁহার বাহ্যজগতে ফিরিতে ইচ্ছা নাই, তথাপি আমি পুনঃ পুনঃ নাম করিয়া তাঁহাকে অমৃতলোক হইতে এই অসার কোলাহলময় মৃত্যু-লোকে লইয়া আসিতাম। এক এক দিন তাঁহাকে জাগাইবার সময়ে আমার মনে হইত, আমি মহা পাপ করিতেছি। প্রাণপণ করিয়া যে অবস্থার বিন্দুমাত্র আভাস লাভ করিতে পারি না, অন্যকে সাংসারিক কার্য্যের অনুরোধে সেই অবস্থা হইতে জোর করিয়া ফিরাইয়া আনিতেছি; কিন্তু মনোরমা প্রতিদনই ধ্যানে বসিবার সময়ে বলিতেন যে চারিটার সময়ে আমাকে উঠাইও। ধ্যান ধারণার গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে পরিজনগণের প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞানও তাঁহার ক্রমশঃ গভীর হইতেছিল। একটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, পূর্ব্বে যেমন উপাসনা করিতে বসিলেই তাঁহার সমাধি হইত, বাধা দিতে পারিতেন না, আজকাল সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এখন সমাধির ইচ্ছা না করিলে আর সমাধি হয় না, এ অবস্থাটী বরিশাল থাকিতেই আরম্ভ হইয়াছে।

বিকাল চারিটার পরে মনোরমা ধ্যান হইতে উঠিয়া, সকলকে জলখাবার দিয়া নিজেও কিছু আহার করিলে আমরা সকলে মিলিয়া বেড়াইতে বাহির হইতাম। সন্ধ্যার সময়ে উপাসনায় যোগ দিয়া তিনি আবার সংসারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, এইরূপে কিছুদিন বেশ মনের আনন্দে কাটিল।

জ্যোতি দর্শন

একদিন আমি বোলপুর ষ্টেশনের দিকে বেড়াইতে যাইতেছিলাম, রাস্তায় একটি শালবন। তখন বেলা ৮টা হইবে। আমি শালবনের

শোভায় মুগ্ধ হইয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম, হঠাৎ শালবৃক্ষস্থ একটী দাঁড়কাকের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল, আর আমি চক্ষু ফিরাইতে পারিলাম না। সেই কাকের দেহে যে কতই জ্যোতির বিকাশ হইয়াছে, সে জ্যোতি যে কি অপূর্ব্ব জ্যোতি, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না! এই সময়ে প্রবল বেগে আমার অন্তরে গুরুদত্ত নাম চলিতে লাগিল, চরাচর আনন্দময় হইয়া গেল, আমি সেই জ্যোতির সাগরে ডুবিয়া গেলাম। কাকটি যখন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া যাইতে লাগিল, আমি তাহাকে অনুসরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে যখন উড়িয়া সুদূরে চলিয়া গেল, পলকের জন্য আমি যেন সমস্ত অন্ধকার দেখিলাম। আরও কত কাক রহিয়াছে, কিন্তু আর কাহারও মধ্যে আমার সে জ্যোতিদর্শন হইল না, আমার মনে হইতে লাগিল যেন এই কাকের মধ্য দিয়া দয়াময় হরি আমাকে তাঁহার অপূর্ব্ব জ্যোতির—ব্রহ্মজ্যোতির আভাস দেখাইলেন। যাঁহারা দার্শনিক পণ্ডিত, তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে, উহা আমার মস্তিষ্কের বিকারপ্রসূত ভ্রান্তিদর্শন, কিন্তু আমি এই দীর্ঘকাল আর একবার ঐরূপ দর্শনের আশা করিয়া রহিয়াছি। কাক চলিয়া গেলে আমি যেন কি অমূল্য রত্ন হাতে পাইয়া হারাইলাম বোধ হইল। আর ষ্টেশনে যাওয়া হইল না, ফিরিয়া বাড়ী আসিলাম, তাহার পরের দিন আবার সেই দৃশ্য দর্শনের আশায় লালায়িত হইয়া সেইরূপ সময়ে সেই শালবনে গেলাম, শালবৃক্ষের ডালে ডালে অনেক কাক দেখিলাম, কিন্তু যে বস্তু দেখিতে গিয়াছিলাম তাহা আর দেখিলাম না।

নলহাটী গমন

নলহাটীতে কয়েক জন ব্রাহ্ম সপরিবারে বাস করিতেন। ইঁহারা ইচ্ছা করিলেন যে, আমরা কয়েকদিন তাঁহাদের সেখানে গিয়া বাস করি এবং তাঁহারাই খরচপত্র করিয়া আমাদিগকে নলহাটীতে লইয়া

গেলেন। নলহাটীর ব্রাহ্মযুবকদিগের কথা আমি পূর্ব্বেই কিছু কিছু শুনিয়াছিলাম; একজন একবার গল্প করিয়াছিলেন যে, নলহাটীর ব্রাহ্মবাড়ীতে চুরি হইতে পারে না, কারণ চোরেরা জানে যে এই বাবুরা সারারাত্রি জাগিয়া উপাসনা প্রার্থনা করে। এই ব্রাহ্মগণের মধ্যে একজনের নাম ৺নীলকান্ত সিদ্ধান্ত, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালীপাড়া গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। এই সময়ের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একদিন আমি দার্জ্জিলিংব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা করিতেছিলাম, বক্তৃতার পরে উপাসনা হইল, উপাসনান্তে অনেক লোকের মধ্যে একটী লোকের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি তখনও চক্ষু উন্মীলিত করেন নাই, তাঁহার মুখমণ্ডলে একটা ব্যাকুলতার ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। উপাসনাভঙ্গ হইলে আমি আগ্রহসহকারে তাঁহার সহিত আলাপ করিলাম, তিনিই এই সিদ্ধান্ত মহাশয়। দার্জ্জিলিংএ তাঁহার সঙ্গ পাইয়া আমি বড়ই সুখী হইয়াছিলাম। তিনি সাধুস্বভাব ও ধর্ম্মার্থী ছিলেন, হিমালয়ের বনে বনে তাঁহার সহিত কত ভ্রমণ করিয়াছি, কত নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ভগবানের নাম করিয়াছি, আবার দার্জ্জিলিংকে পশ্চাতে রাখিয়া রঙ্গিৎ নদীর উৎপত্তিস্থলে সিকিমের সীমান্ত প্রদেশে উত্তুঙ্গগিরিরাজির মধ্যবর্ত্তি প্রচণ্ড বেগশালিনী কল্লোলিনী স্রোতস্বিনীর মধ্যস্থলে মগ্ন শৈলে উপবেশন করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, কখনো কোনো নির্ঝরিণীর পাদদেশে শিলাখণ্ডে মৃগচর্ম্ম বিস্তীর্ণ করিয়া, নির্ঝরিণীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া "অবশ পরাণ কেন জাগে না, জাগে না" বলিয়া সঙ্গীতের ছলে আমরা দুজনে চীৎকার করিয়াছি। সে নির্জ্জন প্রদেশে আমাদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া পরিহাস করিবার কেহ ছিল না। আজ নীলকান্ত সিদ্ধান্ত মহাশয়কে দেখিয়া সেসকল স্মৃতি প্রাণে জাগিয়া উঠিল। নীলকান্তবাবুর বিবরণ মনোরমা পূর্ব্বেই আমার মুখে শুনিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়াই তিনি পুরাতন আত্মীয় বলিয়া মনে করিলেন, উক্ত পরিবারের আর যাঁহারা ছিলেন তাঁহারাও অল্প

সময়ের মধ্যে চির-পরিচিতের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে ওঁকারনাথের সুপ্রসিদ্ধ মৌনীবাবার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ঘোষ, তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী কুমুদিনী, সহধর্ম্মিণী ৺স্বর্ণকুমারী এবং কুঞ্জবাবুর সম্পর্কিত দুইটী বিধবা মহিলা ছিলেন, বিনোদিনী নাম্নী একটী ৬।৭ বৎসর বয়স্কা বালিকা ছিল, আর কামিনীকুমার ঘোষ ছিলেন।

নলহাটীতে একটী ক্ষুদ্র পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ে একদিন নলহাটীর বন্ধুবর্গ লইয়া আমাদের কন্যার নামকরণ হইল। সেই ক্ষুদ্র পর্ব্বতের শিখরদেশে, অনন্ত আকাশের গায়ে, সাঁওতাল পরগণার পর্ব্বতমালার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমরা যখন বসিলাম, তখন আপনা আপনি আমাদের চিত্ত ভগবানের গুণগান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। মনোরমা সঙ্গে থাকাতে সকলেরই মন বিশেষ ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ ছিল। শ্রীমান্ উপেন্দ্র সঙ্গীত করিলেন, আমি উপাসনা করিলাম, একসের বাতাসা দ্বারা সকলে মনের আনন্দে মিষ্টিমুখ করিলেন, কন্যাটীর নাম রাখা হইল শ্রীমতী প্রেমলতা। ৬ই শ্রাবণ, ১২৯৬।

নলহাটীতে থাকাকালীন মনোরমা ২।১ দিন ধ্যানে বসিয়াছিলেন, আমাকেও বাধ্য হইয়া একটী বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। রেলওয়ের ম্যানেজার সুপ্রসিদ্ধ ৺রামগতি মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন, তিনি বিশিষ্ট হিন্দু।

আমি একটি বাউল-সঙ্গীত প্রস্তুত করিয়াছিলাম, শ্রীমান্ উপেন্দ্র সেটি গাহিয়াছিলেন। সেই গানটির কিছু কিছু এখনও মনে আছে, যথা—

অরূপের অপরূপ রূপ যে দেখেছে সেই মজেছে,
তার মূলাধারে সহস্রারে নিরাকারের ঢেউ ছুটেছে।
অন্যে তা বুঝবে কিবা, নয় রাত্রি নয় সে দিবা
সেদেশে রং ছাড়া এক ফুল ফুটেছে ;
সেই ফুলের গন্ধে অন্ধ হয়ে বিষয়বন্ধ টুটে গেছে।

ইত্যাদি

সভাপতি রামগতিবাবু সঙ্গীতটি শুনিয়া বলিলেন, "এ যে আমাদের হিন্দুর ভাব।" আমি কিন্তু হিন্দুর ভাব ব্রাহ্মের ভাব কিছুই ভাবিয়া গানটি প্রস্তুত করি নাই, এমন কি উহাতে আমার নিজের ভাবও কিছু ছিল না। মনোরমার অবস্থা দেখিয়া আমার মনে যে একটি ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল তাহাই আমি ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যদি উহাতে কিছু ভুল থাকে সে ভুল আমারই।

নলহাটী পরিত্যাগ করার সময়ে আমরা উভয় পক্ষই বিচ্ছেদ-বেদনা অনুভব করিয়াছিলাম। আমাদের মধ্যমপুত্র শ্রীমান্ নিত্যরঞ্জন, বিনোদা মেয়েটীর জন্য গাড়িতে উঠিয়াও "বিনি বিনি" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিল।

নলহাটী হইতে আমরা পুনরায় বোলপুরে আসিলাম এবং অল্প দিনের মধ্যেই বিশেষ কোনো কারণে বোলপুর পরিত্যাগ করিয়া বরিশাল অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বাঙ্গলা ১২৯৬ সালের ২৬শে আষাঢ় আমরা বোলপুর গিয়াছিলাম, ১৮ই শ্রাবণ বোলপুর পরিত্যাগ করিলাম।

আমরা যখন কলিকাতায় ফিরিলাম, তখনও শ্রীশ্রীগুরুদেব কলিকাতায় আছেন। একদিন তিনি মনোরমাকে কাছে বসাইয়া সমাধিস্থা হইতে বলিলেন, মনোরমা সমাধিস্থা হইলে গুরুদেব চক্ষু বুজিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। আমাদের বোধ হইল যেন তিনি সেই অবস্থা অবলম্বন করিয়া ধ্যানস্থা মনোরমার আত্মার অবস্থা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। কিছুকাল পরে তিনি মনোরমার ধ্যান ভগ্ন করিয়া দিলেন, মনোরমা গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলে গুরুদেব দিদিমাকে (ইনি গুরুদেবের শাশুড়ী) বলিলেন, "এটী হীরার টুক্‌রা, কোটিতে এরূপ গুটি পাওয়া ভার"।

এই দিন একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। মনোরমা যখন শ্রীগুরুদেবের নিকট বসিয়া আছেন, তখন আমাদের বাসা হইতে সংবাদ আসিল যে, হিন্দুস্থানী ঝি আমাদের কন্যাটীকে লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম এবং

মেয়েটিকে খুঁজিতে বাহির হইলাম, আমার গুরুভাই ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেকেই ত্বরান্বিত হইয়া নানা রাস্তায় ছুটিয়া গেলেন এবং এক এক রাস্তা হইতে এক এক দল ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিতে লাগিলেন যে, কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। আমিও ফিরিয়া গুরুদেবের নিকট ব্যাকুলতার সহিত বলিলাম যে, "ঝিটাকে বোধ হয় কোনো কুলীর আড়কাঠী ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে এবং মেয়েটীকে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে।" আমি অত্যন্ত ব্যাকুলতা ও উত্তেজনার সহিত এইসকল কথা বলিতেছিলাম, তখনও মনোরমা নিশ্চিন্ত হইয়া গুরুদেবের নিকট বসিয়াই আছেন, কিছুই বলিতেছেন না এবং তাঁহার মুখশ্রীতে কিছুমাত্র উদ্বেগের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না; বলিতে কি তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমি একটু ক্ষুণ্ণ হইলাম। তিনি যে মনের মধ্যে কিরূপ ভরসা পাইতেছেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। হয়ত, আমি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কিছু বলিতাম, এমন সময়ে শ্রীগুরুদেব সুকিয়াষ্ট্রীটের একটা গলির দিকে খুঁজিতে বলিলেন, (এই গলিটার মধ্যে বোধ হয় মণিকা প্রেস) আমি এবং আমার আর একটি আত্মীয় ছুটিয়া সেই দিকে গেলাম, গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম, সেই হিন্দুস্থানী ঝি আমাদের মেয়েটীকে কোলে করিয়া সেইখানে ঘুরিতেছে। সে রাস্তা হারাইয়া গিয়াছিল, বাড়ীর ঠিকানা কাহাকেও বলিতে পারে নাই, তাই এ গলি সে গলি ঘুরিতেছিল। কন্যাটি আসিলে মনোরমা তাহাকে সস্নেহে কোলে করিলেন।

শ্রীগুরুদেব যে মানস চক্ষে কন্যাটীকে দেখিতে পাইতেছিলেন, ইহা আমি একটা বুজরুকি বলিয়া মনে করি না এবং তাঁহার যে এই সকল শক্তি ছিল, তাহা প্রমাণিত হইলে তাঁহাকে যে কিছুমাত্র বড় করা হইল, এরূপ ধারণাও আমার নাই। মনোরমা যে এই অবস্থায় গুরুর প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহাই দেখাইবার জন্য এই ঘটনার উল্লেখ করিলাম

বরিশালে প্রত্যাগমন

আমরা বরিশালে ফিরিয়া আসিলাম, বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই আগ্রহ-সহকারে আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে আমাদের সংসারে পরিজন বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রীমান্ মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, রাজকুমার ঘোষ, চণ্ডীচরণ গুহঠাকুরতা, করুণাকুমার দাস, বেণীমাধব দে, রেবতীমোহন সেন প্রভৃতিকে লইয়া আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার গঠিত হইল। লোকে কথায় বলে যে, "এক গাছের ছাল অন্য গাছে লাগে না", অর্থাৎ অনেকগুলি পর লইয়া একটী একান্নবর্ত্তী পরিবার গঠিত হয় না। এই প্রাচীন প্রবাদ আমাদের নিকট ব্যর্থ হইয়াছিল। আমরা পরস্পরে এমনই মিলিয়া মিশিয়া ছিলাম যে, এক রক্তমাংসের ভ্রাতৃগণও সকল সময়ে সেরূপ থাকিতে পারে না। মনোমোহন নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ পণ্ডিত, ২০৲ টাকা বেতনে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। ২০৲ টাকা হইতে কিছু কিছু তাঁহার কোনো আত্মীয়কে দিতে হইত, নিজের খরচের জন্য কিছু রাখিতে হইত এবং অবশিষ্ট হইতে যথাসাধ্য আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারে দিতেন। রাজকুমার আদালতে সেক্‌সন্ রাইটারি করিতেন, ন্যায়পথে থাকিয়া যাহা কিছু পাইতেন, তাহা হইতে পিতামাতার সাহায্য করিতেন এবং যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা হইতে আমাদের সংসারে কিছু কিছু দিতেন। চণ্ডীচরণের কোনো আয় ছিল না, এ সময়ে তিনি একটি কুটীরঘর করিয়া সাধন ভজন করিতেন। তিনি বরিশালে থাকিতে ইচ্ছুক হইয়া মনোরমাকে চিঠি লিখিলেন, সে পত্রের মর্ম্ম এই যে, আমাদের বাড়ী ছাড়িয়া অন্য কোথাও থাকিতে তাঁহার ভাল লাগিবে না, কিন্তু আমাদের আর্থিক অবস্থা ভাবিয়া সঙ্কোচ উপস্থিত হয়, বিশেষতঃ মনোরমা "বড় লোকের আদুরে মেয়ে", "রান্না করার অভ্যাস তাঁহার নাই", ইত্যাদি।

উত্তরে মনোরমা লিখিলেন, "আমরা গরীব বলিয়া কি আপনি

আমাদের বাড়ীতে থাকিবেন না? আমি ভাল রান্না করিতে জানি না, তা কি করিবেন, যদি ডাল তরকারী আলুনী হয় তবে নূণ মাখিয়া খাইবেন, আর যদি লবণ বেশী হয় তবে জল ঢালিয়া লবণ কমাইয়া লইবেন।" এই চিঠিখানি পাঠ করিয়া চণ্ডীচরণ কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। বরিশালে আসিয়া আমাকে চিঠিখানা পড়িয়া শুনাইলেন, তখনও তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি বলিলেন যে, এই কয়েকটি ছত্র তাঁহার হৃদয়ে, আত্মীয়তা সরলতা ও অকৃত্রিমতার একটি উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়া দিয়াছে।

চণ্ডীচরণ জ্ঞাতিত্বসূত্রে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন, আমরা উভয়েই সমবয়সী ছিলাম। চণ্ডী মনোরমাকে খুড়ীমা বলিয়া ডাকিতেন এবং নিজের মায়ের সঙ্গে যেরূপ আবদার করিতে হয়, সেইরূপ করিতেন। আমার সঙ্গে তাঁহার কোনও তর্ক কি মতভেদ হইলে মনোরমাকে বলিয়া মীমাংসা করিতেন। মনোরমা যে মত দিতেন, তাহার উপরে কাহারও কোন কথাই তাঁহার নিকট গ্রাহ্য হইত না। শ্রীমান্ করুণাকুমার, সেই সময়ের বাগেরহাটের পোষ্ট মাষ্টার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিনাথ দাস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, সে বরিশাল জিলাস্কুলে পড়িত। হরিনাথবাবু মাতৃহীন করুণাকে মনোরমার নিকট রাখিয়া এতই নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, তিনি বলিতেন "করুণাকে ত আমি তাহার মায়ের কোলে রাখিয়াছি"। করুণাও মনোরমাকে মায়ের মত দেখিত, অথবা সে তাঁহাকে যেরূপ ভক্তি করিত ও ভালবাসিত, জীবনে কোনও স্ত্রীলোককে সেরূপ ভক্তি করে নাই, সেরূপ ভালবাসে নাই। শ্রীমান্ করুণার খরচ বাবদ তাহার পিতা মাসিক ৮৲ টাকা কি ১০৲ টাকা নির্দ্দিষ্টরূপে পাঠাইতেন।

শ্রীমান্ রেবতীর নিবাস বিক্রমপুর, মূলচর গ্রামে। তিনি খুলনা জেলার অন্তর্গত নলধা স্কুলে মাষ্টারি করিতেন। উক্ত বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণ সভায় আমি একবার নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম, সেই সময়ে তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ।

এস্থলে ৺সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীমান্ রেবতীমোহন নলধা গ্রামে যে সকল সৎকার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, সে সকল বর্ণনা করার লোভ পরিত্যাগ করিতে হইল। সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত দেবশিশু ছিলেন, তাঁহার নিঃস্বার্থ কর্ম্মযোগের ও পবিত্র চরিত্রের বর্ণনা করিয়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ যদি প্রকাশিত হয়, তবে বড়ই সুখী হইব। এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিলাম। শ্রীমান্ রেবতী, আমার সহিত সাক্ষাতের পরে, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বরিশালে আসিলেন এবং চিরদিনের জন্য আমাদের আপনার জন হইয়া রহিলেন। ইহার পরে তিনি সেটেলমেণ্ট আফিসে কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন, এক্ষণে ইনি কলিকাতার মূক-বধির-বিদ্যালয়ে প্রথম সহকারী শিক্ষক। শ্রীমান্ বেণীমাধবও আমাদের পরিবারে সন্তানের মতনই ছিলেন, সে সম্পর্ক চিরদিনের জন্যই রহিয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমাকে মাসিক ১২৲ টাকা দেওয়া হইত। বরিশালের অধিকাংশ ব্রাহ্মই গরিব ছিল; কতকগুলি পরিবার অনাথ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কাজেই সমাজ-ফণ্ডে টাকা ছিল না। আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারের যেরূপ আয় ছিল, তাহাতে অতিথি অভ্যাগত লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া কষ্টকর ছিল, একথা বলাই বাহুল্য। এ সময়ে বরিশালের একজন কবি, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ দাস মহাশয় আমাদের পরিবারকে লক্ষ্য করিয়া একটি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। সঙ্গীতটি বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, উহার কতকাংশ এইরূপ—

"মনোরঞ্জন মানুষ বড় সঙ্গতি"।
সঙ্গে জুটলো এসে রেবতী সংপ্রতি॥

রাজকুমারের রাইটারি আর মনোমোহনের পণ্ডিতি,
তারা, ম্যানেজ্‌মেণ্টের ভার নিয়েছে, তাই ষ্টেটের এত উন্নতি!
আছে, করুণ বেণী দুটি ছেলে কিবা মধুর প্রকৃতি,
তারা, চণ্ডীমণ্ডপ সার করেছে, তাদের ঘুচে গেছে দুর্গতি।

* * *

যার গৃহলক্ষ্মী মনোরমা তার কি আছে দুষ্কৃতি,
ঘরে বসে চাঁদ দেখা যায়, চল্‌ছে সদাব্রত অতিথি।
* * হবে বুঝি লাখপতি।" ইত্যাদি।

'মানুষ বড় সঙ্গতি' অর্থ মানুষ বড় সঙ্গতিপন্ন। বরিশালের অশিক্ষিত লোকেরা এইরূপ বলিয়া থাকে যে, "অমুক ব্যক্তি মানুষ বড় সঙ্গতি"। কবি অশিক্ষিত লোকের উক্তিরূপে সঙ্গীতটি রচনা করিয়াছিলেন। 'চণ্ডীমণ্ডপ সার করেছে'—অর্থ এই যে চণ্ডীচরণ সাধন ভজনের জন্য একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীমান্ করুণ ও শ্রীমান্ বেণী সেই ঘরে বাস করিতেন। চণ্ডীচরণের কুটীরটিকে 'চণ্ডীমণ্ডপ' বলা হইয়াছে।

'ঘরে বসে চাঁদ দেখা যায়'—এই কথাটার একটু ইতিহাস আছে। রান্নাঘরের একখানা চালা বে-মেরামত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। একদিন আমাদের একজন বন্ধু তাহা দেখিয়া মনোরমাকে বলিলেন যে, "একি? আপনার রান্নাঘরের যে চালা নাই?" উত্তরে মনোরমা সহাস্যমুখে বলিলেন, "ভালই হইয়াছে, জ্যোৎস্নারাত্রিতে রান্নাঘরে প্রদীপ জ্বালিবার দরকার হয় না"। এই সময়ে আমাদের শয়নঘরের চালারও সর্ব্বত্র খড় ছিল না, সুতরাং তাহার ভিতর দিয়াও চাঁদ দেখা যাইত, কবি উভয় বিষয়কেই লক্ষ্য করিয়াছেন। আমাদের সংসারের একরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিলাম। এই সময়ে প্রায়শঃ একটি চাকর বা চাকরাণী থাকিত, মনোরমার অসুস্থ অবস্থায় কখন কখন রান্নার জন্যও লোক রাখা হইয়াছে। আমি সংসারের কিছুই দেখিতাম না, সর্ব্বদা প্রচার লইয়াই ব্যস্ত থাকিতাম, কিন্তু যেভাবে সংসার চলিতেছে তাহা আমি বুঝিতে পারিতাম। এ সময়ে আমাদের পরিবারে মাছ মাংস আসিত না, সকলেই নিরামিষভোজী। এই একান্নবর্ত্তী পরিবারে মনোরমাকে সকলেই প্রাণের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন এবং তিনি যে সকলকেই খুব ভালবাসেন, এইরূপ বিশ্বাস সকলেরই ছিল। তাঁহার কার্য্য, বাক্য ও ব্যবহার সকলের নিকটই সমান প্রীতিকর ছিল। তিনি

ভালবাসা দেখাইতে জানিতেন না, হু'টা ভালবাসার কথা বলিতে কি লিখিতে পারিতেন না, তাঁহার কোনও কার্য্যেই প্রদর্শনের ভাব ছিল না; কিন্তু দুই দিন মাত্র আমাদের সঙ্গে বাস করিলে সকলেই তাঁহার আপনার হইয়া যাইত, তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসা ও সমদর্শিতা সকলকেই সহজে আকর্ষণ করিত। পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কে কোন্ জিনিস খাইতে ভালবাসেন, তাহা সর্ব্বদা তাঁহার মনে থাকিত। তিনি সকলকে তাঁহাদের স্ব স্ব প্রিয়খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন। তাঁহার ব্যবহারের মধ্যে কেহ কোন বৈষম্য অনুভব করিত না। মনোরমা যত বৎসর সংসার করিয়াছেন, তাহাতে কেহ কখনও বৈষম্য কিছু দেখেন নাই, তাই তাঁহার সংসারে কখনও অশান্তি বা মনোমালিন্য ঘটে নাই। এমন ঘটনা কখনও ঘটে নাই যে, পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে অথবা অভ্যাগত বন্ধুবান্ধব নরনারীগণের কেহ কখনও কোন ঘটনায় মনোরমার প্রতি বারেকের জন্যও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

দান-প্রত্যাখ্যান

বর্ষাকালে যখন ঘরের চালা দিয়া জল পড়িত, তখন মনোরমা মশারির উপরে ছেলেদের অয়েলক্লথ দিয়া কতকটা স্থানকে জল হইতে রক্ষা করিয়া, মেয়েটিকে কোলে করিয়া বসিয়া অনেক রাত্রি কাটাইয়াছেন, কিন্তু ইহা পরিবারস্থ লোকেরাও জানিতে পারে নাই; আমি মফঃস্বল হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই অবস্থা দেখিলাম। পরদিন কথায় কথায় আমি শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় মহাশয়কে এই কথা বলায়, তিনি সেই দিন ঘরামি ও খড় লইয়া আসিয়া আমাদের শয়নঘরের চালা মেরামত করিয়া দিলেন। কেদারবাবু তখন বরিশালের পাব্লিক ওয়ার্কের সুপার্ভাইজার্ ছিলেন। কেদারবাবু অত্যন্ত সদাশয় ও নির্ম্মলচরিত্র ব্যক্তি, আমার সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, কিন্তু আমি যে তাঁহার নিকট মনোরমার অয়েলক্লথ দিয়া বৃষ্টির জল

অবরোধের কথা বলিয়াছিলাম, তখন আমার এ কথা মনে হয় নাই যে, তিনি আমাদের ঘর মেরামত করিয়া দিবেন। যদি ইহা মনে হইত, তবে আমি তাঁহাকে কখনই সেকথা বলিতাম না। আমি মনোরমার সুখ্যাতি করিতে গিয়া অসাবধানে বলিয়া ফেলিয়াছি, পরে তাঁহার কার্য্য দেখিয়া আমাকে অপ্রতিভ হইতে হইয়াছিল; কেননা, এরূপভাবে কাহাকেও অভাবের কথা জানান আমাদের রীতি ছিল না।

এই সময়ে একদিন সঞ্জীবনীর সম্পাদক, আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের একখানা পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, মান্দ্রাজের মালাবারী মহাশয় সমাজ-সংস্কারের জন্য তাঁহার হাতে মাসিক ৫০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই টাকাটা তিনি কয়েকজন ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারকের মধ্যে বণ্টন করিয়া তাঁহাদিগকে সমাজ-সংস্কারকার্য্যে বিশেষরূপে প্রোৎসাহিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আমাকে উক্ত তহবিল হইতে মাসিক ১৫৲ টাকা দেওয়া স্থির হইয়াছে। কৃষ্ণবাবুর কথা এই যে, আমি ত সমাজ-সংস্কারের কার্য্য করিতেছিই, এ অবস্থায় সাপ্তাহিক কার্য্যের একটা রিপোর্ট পাঠাইলেই চলিবে, এজন্য আমার অতিরিক্ত বিশেষ কিছু খাটুনি পড়িবে না। যেদিন এই চিঠিখানা পাওয়া গেল, সেদিন রবিবার; আমি উপাসনা-মন্দিরে থাকিয়াই চিঠি পাইলাম। এই পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া ব্রাহ্মগণ এবং উপাসকমণ্ডলী সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং একবাক্যে বলিলেন যে, ইহা ঈশ্বরের দান, এই দান মাথা পাতিয়া লওয়া উচিত। যাহার মাসিক নির্দ্দিষ্ট আয় ১২৲ টাকা, তাহার যদি অতিরিক্ত ১৫৲ টাকা আয় হয়, তবে তাহা যে অত্যন্ত আনন্দজনক হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? যদিও আমি সংসারের বিষয় বিশেষ কিছু ভাবিতাম না, তথাপি এই টাকা সম্বন্ধে আমার অভিমতও অন্য সকলের অনুরূপই ছিল। আমি ঘরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই এই সংবাদটা আমাদের বাড়ীতে পৌঁছিয়াছে। পাড়ার ব্রাহ্ম নরনারী সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল।

যদিও মনোরমা পূর্ব্বে এই সংবাদ পাইয়াছেন, তথাপি আমি

আহার করিতে বসিয়া আবার তাঁহাকে কৃষ্ণবাবুর পত্রের মর্ম্ম শুনাইলাম। চাহিয়া দেখিলাম, এ সংবাদ শুনিয়া তাঁহার মুখশ্রীর কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, তিনি কিছুই বলিলেন না। তখন আমি তাঁহাকে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই বিষয়ে তাঁহার মৌনী থাকার কারণ কি? তিনি বলিলেন, এই টাকা গ্রহণ করা তাঁহার ভাল বোধ হয় না। আমি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। অর্থাভাবে যাঁহার সন্তানগণের ভরণপোষণের অসুবিধা হইতেছে, তিনি এমন ন্যায়পথে অর্থাগমের বিরোধী হইতেছেন কেন? মাসিক ১৫৲ টাকা পাইলে তখন অনেক ক্লেশনিবারণ হইতে পারিত। তাঁহার এরূপ দান প্রত্যাখ্যানের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অল্প কথায় সংক্ষেপে দুইটি উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন—"তুমি যে প্রচারকার্য্য করিতেছ, ইহাতে তোমার স্বাধীনতায় কিছুমাত্র আঘাত লাগিতেছে না। এই টাকা গ্রহণ করিলে একটু অধীনতা আসিবে; আর এক কথা এই যে, হয়তো কোনও সপ্তাহে সমাজ-সংস্কারসম্বন্ধে তুমি কিছু কর নাই, কিন্তু রিপোর্ট দেওয়ার কথা মনে হইলে তখন সেই জন্যই একটা বক্তৃতা দিতে ইচ্ছা হইবে, ইহাতে ক্রমে ক্রমে কপটতা আসিয়া পড়িতে পারে।"

আমি কিরূপভাবে বরিশালে প্রচারক ছিলাম, সে কথা না বলিলে এ স্থলে মনোরমার কথাগুলির স্পষ্টার্থ উপলব্ধি হইবে না। কলিকাতার সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণের সহিত কার্য্যনির্ব্বাহকসভার যেরূপ বাধ্যবাধকতা আছে, বরিশাল-ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহকসভার সহিত আমার সেরূপ বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধ ছিল না। আমি আমার ইচ্ছামত প্রচার করিতেছিলাম। সমাজ কিংবা কোনও কমিটি ইচ্ছা করিয়া আমাকে সাহায্য করিলে, তাহা গ্রহণ করিতে আমার আপত্তি ছিল না। কাহারও উপর আমার কিছুমাত্র দাবি ছিল না এবং আমার উপর কাহারও দাবি ছিল না। আমি আমার ইচ্ছামত যেখানে ইচ্ছা প্রচার করিতে যাইতাম, যেখানে যতদিন ইচ্ছা থাকিতাম, আমাকে হুকুম

করার কেহ ছিল না, আমাকে কাহারও অনুমতির অপেক্ষা করিতে হইত না। বরিশাল-ব্রাহ্মসমাজ আমার কার্য্যকে তাঁহাদের প্রচারকের কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন, এইমাত্র সম্পর্ক ছিল। একবার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি বন্ধুগণের কথায় আমি সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক হওয়ার জন্য আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিলাম এবং আমাকে প্রচারকরূপে গ্রহণ করিতে সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের তখনকার কার্য্য-নির্ব্বাহকসভার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অনেক সভ্যের বিশেষ ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু আবেদনপত্র পাঠাইয়া কিছুদিন পরেই আমি উহার প্রত্যাহার করিয়াছিলাম, মনোরমার অনিচ্ছাই ইহার প্রধান কারণ। আমি কোনও প্রকার বন্ধনে জড়িত না হই, আমার স্বাধীনতা ও বিবেকবুদ্ধি কিছুতে প্রতিহত না হয়, এ বিষয়ে তাঁহার সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এবং আমাকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখার জন্য তিনি সকল প্রকারের ক্লেশ স্বীকার করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। কৃষ্ণবাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলে পাছে আমার স্বাধীনতা খর্ব্ব হয়, তাঁহার মনে এই ভয় উপস্থিত হইয়াছিল, এ কথা হয়ত কিছুদিন পরে আমার মনেও উদিত হইত, কিন্তু মনোরমা আর যে কথাটি বলিলেন, তাহা আমার চিন্তার অতীত ছিল। একটা সাপ্তাহিক রিপোর্ট দিতে বাধ্য হইলে, তাহাতে যে কপটতা আসিতে পারে, এত কথা আমি ভাবি নাই। যাহা হউক, মনোরমার কথা শুনিয়া আমার প্রাণে অতুল আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি যে এত আর্থিক ক্লেশের মধ্যে এইরূপ ত্যাগ স্বীকার করিলেন, এতদূর অভাবের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার মনে যে এতটা সূক্ষ্ম বিচার আসিল এবং আমার স্বাধীনতায় পাছে বাধা পড়ে, এই ভাবনায় যে কোন প্রকারের সুখ সুবিধার দিকেই তাকাইলেন না, ইহাই আমার অতুল আনন্দের কারণ হইয়াছিল। আমি কৃষ্ণবাবুকে চিঠি লিখিয়া জানাইলাম যে, তিনি যে আমার জন্য এতটা করিয়াছেন তজ্জন্য শত শত ধন্যবাদ, কিন্তু কোনও বিশেষ কারণে আমি এই দান গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

———

জীবন-বীমা

জীবন-বীমা করা কর্ত্তব্য, ইহা বর্ত্তমান শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের একটা সাধারণ মত ; ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলে অবিবেচক বলিয়া গণ্য হইতে হয়। কোনও ধনী বন্ধু একবার আমার জীবন-বীমার কথা তুলিয়াছিলেন, পলিসির টাকা তিনিই দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। আবার অন্য কোন এক ধনী বন্ধু একবার কোনও এক স্বদেশী কোম্পানীতে আমার অনুমতি না লইয়াই আমার জীবন-বীমা করিয়াছিলেন, এমন কি আমাকে আবেদন করিতে কিংবা চিকিৎসকের সার্টিফিকেটও দিতে হয় নাই। আমি তীব্র প্রতিবাদপত্র লিখিয়া বন্ধুবরকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলাম।

আমার জীবন-বীমার কথা তুলিলে মনোরমা অসন্তুষ্ট হইতেন। তাঁহার মনের ভাব এইরূপ ছিল যে, পতির অবর্ত্তমানেও আমার কিছু সংস্থান রহিল এইরূপ ভাব অথবা এইরূপ একটা ভরসা স্ত্রীর মনে থাকা ভাল নয়! আর এক কথা এই যে, তিনি যে বিধবা হইবেন এ বিশ্বাস তাঁহার একেবারেই ছিল না। একবার আমি পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমিই আগে মরিব, তোমাকে বিধবা হইতে হইবে। চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লমুখ মলিন হইয়া গেল, তিনি স্থির গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যদি অদৃষ্টে থাকে তবে তাহা ঘটিবে।" আমি বড়ই অপ্রস্তুত হইলাম, আমার কথাটা যে তাঁহাকে ব্যথা দিবে, তাহা আমি ভাবি নাই।

লাল ও শ্রীধরচন্দ্র

ঢাকায় আমাদের গুরুভ্রাতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ শুনিয়াছিলেন যে, মনোরমার যে সমাধি হয়, উহা ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শের বিপরীত বলিয়া আমি তাঁহার ধ্যানের বিরোধী হইয়াছি। যাহাতে তিনি এইরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া দীর্ঘকাল ধ্যানস্থা না থাকেন এবং বিশুদ্ধ ভাষা

বিন্যাস করিয়া উপাসনা প্রার্থনা করেন, আমি তাঁহাকে সেইরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়া প্রচারিকা করার চেষ্টায় আছি। এই সংবাদ পাইয়া লালজী ও শ্রীযুক্ত শ্রীধরচন্দ্র ঢাকা হইতে নানাস্থান ঘুরিয়া প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য বরিশালে উপস্থিত হইলেন।

———

লাল

লালের সম্পূর্ণ নাম লালবিহারী বসু, বাড়ী শান্তিপুরে। পাঠশালায় তিনি বোধোদয় অবধি পড়িয়াছিলেন, সেইখানেই পাঠবন্ধ। লাল ৭।৮ বৎসর বয়সের সময়ে একটা আমগাছে উঠিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। আকাশের চারিদিকে চারিটা আগুনের গোলা কল্পনা করিয়া মনে মনে সেই গোলাচারিটিকে টানিয়া আনিয়া একটা কেন্দ্রে সংযুক্ত করিতেন। এই কার্য্যে তাঁহাকে অত্যন্ত মনঃসংযোগ করিতে হইত এবং এইরূপ করিতে করিতে এই কার্য্যে তাঁহার দৃঢ় একাগ্রতা জন্মিত, লোকেরা দেখিতে পাইয়া বসুদিগের বাড়ীতে খবর দিত যে তোমাদের ছেলেটি গাছে উঠিয়া ঘুমাইতেছে, পড়িয়া মরিবে।

দশ বৎসর বয়সের সময়ে লাল হরিবোলা হইলেন, পিতা তাঁহাকে হরিনাম করিবার জন্য একখানা ছোট কুটীর করিয়া দিলেন। ছেলেটির চরিত্রের মধ্যে নানাপ্রকারের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং এতটুকু বালকের জ্ঞানগর্ভ বাক্য শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইত।

লালের যখন ১২ বৎসর বয়স, তখন শ্রীশ্রীগুরুদেব একবার শান্তিপুরে গিয়াছিলেন। লাল আসিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্র-দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। লাল দীক্ষা পাইলেন, দীক্ষার পরেই অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার সমাধির অবস্থা লাভ হইল। লাল নামরসে নিমগ্ন হইয়া ৮।১০ ঘণ্টা একাসনে অতিবাহিত করিতেন। সেই ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মানন্দরসপান করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া গেল এবং দিব্য জ্ঞানের প্রকাশ হইল। যখন তাঁহার বয়স ১৪।১৫ বৎসর

তখন যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন, কি হিন্দুদর্শন, কি বৌদ্ধদর্শন, কি বৈষ্ণব ধর্ম্ম, কি খৃষ্টান ধর্ম্ম, কি মুসলমান ধর্ম্ম, সকল শাস্ত্রে সকল দর্শনে সকল তত্ত্বে তাঁহার আশ্চর্য্য অধিকার। এই সমস্ত লালজী পড়িয়া শিখেন নাই, তাঁহার ভিতর হইতে সমস্ত তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে! পবিত্রতা ও নির্ম্মলতাই যে, সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় তাহা লালজীকে দেখিলে বুঝা যাইত। ঢাকার রেভারেণ্ড মিঃ হে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত প্রভৃতি লালের সঙ্গে অনেক বিষয় লইয়া কথা বলিতেন। তাঁহার ভাষা এত মিষ্ট ছিল, কথা বলার ভঙ্গী এরূপ অপূর্ব্ব ছিল যে তাঁহার একটী কথাও কাহারও নিকট উপেক্ষিত হইত না। তিনি অত্যন্ত অল্পভাষী ছিলেন।

বরিশালে আসার পরে একদিন ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস ও বরদাকান্ত রায় লালজীকে একটু উপাসনা করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন, আমিও তাঁহাদের অনুরোধের সঙ্গে যোগদান করিলাম। লালজী উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিয়া ২।৪টি শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়া গেলেন, তাঁহার বাক্য নিবৃত্ত হইল, গভীর ধ্যানে কয়েক ঘণ্টা থাকিয়া লালবিহারী আবার বহির্জগতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাতে জীবে দয়া, নামে রুচি, সমদর্শিতাজ্ঞান ও সরলতা, গাম্ভীর্য্য এবং বালকত্ব প্রভৃতি গুণগ্রামের যেরূপ বিকাশ ও সমাবেশ দেখিয়াছি সেরূপ ভাব অতীব দুর্ল্লভ। সেই ষোল বৎসর বয়স্ক বালকের নিকট যে সকল তত্ত্বজ্ঞানের কথা শুনিয়াছি সে সকল সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। ষোল বৎসর বয়সেই সে অমূল্য রত্ন বঙ্গমাতার অঞ্চল-চ্যুত হইয়াছে।

অকিঞ্চন শ্রীধরচন্দ্র

সম্পূর্ণ নাম শ্রীধরচন্দ্র ঘোষ, নিবাস ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গা থানার অধীন কোন গ্রামে।

যৌবনকালে পুলিসের হেড্ কনেষ্টবল ছিলেন, কিন্তু সেই সময়েই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মে। প্রতিদিন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান' পাঠ করিয়া উপাসনা করিতেন। ঘুস খাইতেন না সুতরাং অত্যল্প বেতনে অতি কষ্টে তাঁহার সংসার চলিত। অন্যান্য হেড্ কনেষ্টবলদিগের মাসিক অন্ততঃ দুইশত টাকা আয়, তাহাদের স্ত্রীরা হাজার টাকার গহনা পরে কিন্তু শ্রীধরের স্ত্রীর গায়ে একভরি সোণাও নাই। একদিন স্ত্রী আবদার করিয়া বলিলেন, তাঁহাকে গহনা দিতে হইবে। শ্রীধর বলিলেন "আচ্ছা, তাই হবে"। এদিন উপাসনার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানের পরিবর্ত্তে শ্রীধরচন্দ্র সুবৃহৎ দণ্ডবিধির আইনখানা সম্মুখে রাখিয়া পাঠ করিতে বসিলেন। সরলা নবীনা-ভার্য্যা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রতিদিন উপাসনার সময়ে যে গ্রন্থ পঠিত হয় আজ তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুস্তক পাঠ করা হইতেছে কেন? স্বামী বলিলেন, "এই পুস্তকখানির নাম 'দণ্ডবিধির আইন', কোন্ অপরাধ করিলে কত বৎসর জেল খাটিতে হয় এই পুস্তকে তাহা লিখিত আছে। তুমি আমার নিকট অলঙ্কার চাহিয়াছ, আমার সামান্য বেতন হইতে টাকা বাঁচাইয়া গহনা দেওয়া অসম্ভব, কাজেই তোমাকে অলঙ্কার দেওয়ার জন্য আমাকে ঘুস খাইতে হইবে, আমি মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না কাজেই জেলে যাইব, তাই দেখিতেছি কতবৎসর জেল হওয়ার সম্ভাবনা।" স্বামীর কথা শুনিয়া স্ত্রী কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং পতির পায়ে পড়িয়া মিনতি করিয়া বলিলেন এমন ছার অলঙ্কারে তাহার কাজ নাই, সে আর কখনো গহনা পরার সাধ করিবে না। শ্রীধরের জীবনের সকল কার্য্যই এইরূপ রসময়। যে কার্য্য করিতে অন্যলোক কঠোরভাব ধারণ করিবে শ্রীধর সে কার্য্য সম্পাদন করিতে এমন একটা ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে একান্ত কঠোর ব্যাপারটাও সরস হইয়া উঠিবে। তাঁহার ন্যায় ত্যাগী, ভক্ত, সরল ব্যক্তি জগতে সুদুর্ল্লভ।

অল্প বয়সেই তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বর্গবাসিনী হইলেন। শ্রীধর

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, অতি নিষ্ঠার সহিত ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া দীর্ঘকাল ধর্ম্মসাধন করিলেন, শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট যোগ দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, সংসারাশ্রম সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া একান্ত নিস্পৃহ বৈরাগী হইয়া সদ্গুরুসঙ্গ ও তীর্থভ্রমণাদি করিলেন। দণ্ডেকের জন্য যে ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছে তাহার হৃদয়ে ভক্তিরসের মধুরতার একটি ছাপ চিরকাল লাগিয়া আছে। অকিঞ্চন সাধু শ্রীধরচন্দ্রের জীবনের কথা এখানে অধিক লিখিতে পারিলাম না, যদি ভাগ্যে থাকে তবে অন্য গ্রন্থে লাল ও শ্রীধরের চরিত্রসুধা আস্বাদন করিতে ও করাইতে ইচ্ছা রহিল।

পথে পথে নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিয়া লাল ও শ্রীধর ঢাকা হইতে বরিশালে উপস্থিত হইলেন। শ্রীধর যখন একতারা সংযোগে ভজন করিতেন তখন আমাদের চঞ্চল চিত্তকে সবলে আকর্ষণ করিয়া আপনার সহযোগী করিয়া লইতেন। তাঁহার সে ভজন প্রকৃতই ভজন, সে ভজনানন্দে তিনি নিজে মজিতেন, আমাদিগকেও মজাইতেন। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সঙ্গ পাইতেন তাঁহারা সহজে তাঁহার নিকট হইতে উঠিতে পারিতেন না।

কয়েকদিন আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া এবং আমাদের আচার ব্যবহার দেখিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, আমি গোঁড়া ব্রাহ্ম বলিয়া মনোরমার যোগসাধনে বাধা দিতেছি ইত্যাদি যে সকল কথা তাঁহারা শুনিয়াছিলেন, সেগুলি সর্ব্বৈব মিথ্যা। যখন সন্দেহ মিটিয়া গেল তখন শ্রীধরচন্দ্র আমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

একদিন মনোরমা ধ্যানে বসিলে কিছুক্ষণ পরে লালজীও অনতিদূরে একখানি আসনে ধ্যানে বসিলেন। লালজী ৮।১০ ঘণ্টাকাল ধ্যানস্থ থাকিলে আপনা হইতেই তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল, আরও অনেকক্ষণ পরে কর্ণে নাম করিয়া মনোরমার ধ্যানভঙ্গ করিতে হইল। দুইজনই বাহিরের হিসাবে একান্ত অশিক্ষিত, দুজনারই ধ্যানের সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানের ও পবিত্রতার বিকাশ হইয়াছে। তবে লালজী তত্ত্বজ্ঞানের কথা

যেরূপভাবে প্রকাশ করিতেন তাহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া আমাদের মনে হইত। সংক্ষিপ্ত ভাষায় সুগভীর-তত্ত্ব প্রকাশ করিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল, মনোরমার সেরূপ শক্তি কখনও প্রকাশ পায় নাই, সেরূপ প্রয়াসও কখনও দেখা যায় নাই। অনেক প্রশ্ন করিলে তাঁহার নিকট হইতে কদাচিৎ কোন কথা পাওয়া যাইত, যাহা বলিতেন তাহাও অতি সঙ্কোচের সহিত বলিতেন, বোধ হয় স্ত্রীলোক ও পুরুষের প্রকৃতির পার্থক্যেই এই পার্থক্য ঘটিয়াছিল। যাঁহারা লালকে ভালরূপ জানিতেন অথবা বিশেষভাবে দীর্ঘকাল তাঁহার সহিত মিশিয়াছেন তাঁহারা পরিষ্কার উপলব্ধি করিয়াছেন যে, তাঁহার চরিত্রে কোনদিক্ হইতে মলিনতার বিন্দুমাত্র সংস্পর্শ ঘটে নাই, তাঁহার স্বভাব একেবারেই শিশুর মতন ছিল, সে স্বর্গীয় ফুলে সংসারের ধূলি কখনো লাগে নাই, জ্ঞানের আলোকে সে ফুল সর্ব্বদা সমুজ্জ্বল ছিল। বাহিরের শিক্ষার সাহায্য না পাইয়াও ধ্যানের সঙ্গে কিরূপে তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হয়, লালের জীবন তাহার জীবন্ত-সাক্ষী ছিল।

মনোরমার ধ্যানের অবস্থা দেখিয়া বাল্যকালের একটী দৃশ্য সর্ব্বদা আমার মনে পড়িত। শীতকালে আমরা দল বাঁধিয়া কালীগঙ্গায় স্নান করিতে যাইতাম। কেহ ঘাটে বসিয়া একবার জলে হাত দিয়া হাত ফিরাইয়া আনিত, বড় শীত। কেহবা গামছাখানা ভিজাইয়া আস্তে আস্তে হাত পা মাজিত, একটু জল মাথায় দিত, একবার ভিজা গামছাখানা স-সঙ্কোচে পিঠে বুলাইয়া লইত, ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া শীত সহাইয়া লইত, শেষে আস্তে আস্তে জলে নামিয়া কোনরূপে একটী ডুব দিত। আর কোনো কোনো স্নানার্থিবালক, চেতলার পুলের উপরে উঠিয়া 'মা গঙ্গা' বলিয়া একেবারে ঝাঁপ দিয়া গঙ্গাগর্ভে ডুবিত। মনোরমার ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া এই শেষোক্ত বালকগণের গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দিয়া পড়ার মতন। হাতজোড় করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করা আর ধ্যানগঙ্গায় ডুবিয়া যাওয়া, ইহার মধ্যে কোন বিচার, বিবেচনা, চেষ্টা, তদ্বির ছিল না। আসন করিয়া বসিলেন, হাত

দুখানি জোড় করিয়া নমস্কার করিলেন, এক মিনিটের মধ্যে ধ্যানসাগরে ডুবিলেন, হাত দুখানি কোলের উপর পড়িয়া গেল। কত সাধু, সাধক, সন্ন্যাসী এবং উদাসী তাঁহাকে দেখিয়াছেন, সকলেই বলিয়াছেন যে এরূপ সহজ সমাধি তাঁহারা কেহ কখনও দেখেন নাই।

পরিজন

শ্রীমান্ রেবতীমোহন সেন, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, রাজকুমার ঘোষ, বেণীমাধব দে, করুণাকুমার দাস, চণ্ডীচরণ গুহঠাকুরতা, অন্নদাচরণ সেন ও তাঁহার পত্নী, আমি ও মনোরমা এবং আমাদের ৫টী সন্তান ও একটী চাকরাণী বা কখনো চাকর এই হইল আমাদের নির্দ্দিষ্ট পরিজন, ভগবানের কৃপায় অতিথি অভ্যাগত প্রায়শঃ থাকিত।

শ্রীমান্ রাজকুমার বিবাহ করিয়া আমাদের ঘরের কাছে ঘর তুলিয়া স্বতন্ত্র হইলেন। কিন্তু আত্মীয়তা বান্ধবতা সেইরূপই রহিয়া গেল। তাঁহার স্ত্রী নেপালী কন্যা। নেপালের মহামন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ জঙ্গবাহাদুরের মৃত্যুর পরে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়া নেপাল রাজান্তঃপুরে যখন রক্ত-তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, সেই ভয়ঙ্কর দিনে অন্তঃপুরের কয়েকটি বালিকা অন্ধকারের আশ্রয় লাভ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে। দীর্ঘদিন আত্মগোপনপূর্ব্বক বনে বনে ভ্রমণ করিয়া ইহাদিগের মধ্যে তিনজন কলিকাতায় উপস্থিত হয়। এই তিন বালিকার নাম, পুতুলী, বদানী ও ধানী। ইঁহারা নিরাশ্রয়ভাবে কলিকাতার রাস্তায় ঘুরিতেছিলেন, ইঁহাদের কথা কেহ বুঝিতে পারে না, ইঁহারা কাহারও কথা বুঝিতে পারেন না। ইঁহারা যখন দোকানের কাছে কাছে ঘুরিতেছিলেন তখন কতকগুলি লোক ইঁহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ভিড় করিতেছিল, এই লোকদিগের মধ্যে বোধ হয় কুতূহলী ও দুষ্ট-স্বভাব উভয় শ্রেণীর লোকই ছিল। এই ঘটনা ব্রাহ্মসমাজের কোন ভদ্রলোকের চক্ষে পড়ায় তিনি ইঁহাদিগকে সঙ্কেতে সাগ্রহে ডাকিয়া

লইলেন এবং কোনরূপে ইঁহাদের ভাষা ও অবস্থা বুঝিয়া অভয় ও আশ্রয় দান করিলেন, পরিণামে ইঁহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে তিনটি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মের বাড়ীতে কন্যার ন্যায় লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠা ধানীর বয়স তখন ১০ বৎসরের অধিক ছিল না। এই ধানীকে শ্রীযুক্ত উমাপদ রায় মহাশয় আশ্রয় দিয়া প্রতিপালন করেন। নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ধানীর নাম 'হিমাদ্রিবালা' রাখা হইল, স্নেহ করিয়া তাহাকে 'হিমু' বলিয়া ডাকা হইত। হিমু এই রায়-দম্পতিকে পিতামাতা বলিয়া ডাকিত এবং পিতামাতার মতনই ভালবাসিত ও ভক্তি করিত। রায়পরিবারের লোকেরাও তাহাকে ঘরের মেয়ে বলিয়াই জানিত। কয়েক বৎসরের মধ্যে হিমু বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিল এবং নেপালী একেবারে ভুলিয়া গেল। কিন্তু সেই রক্তারক্তির দিনের ভীষণ দৃশ্য সে কখনও ভুলে নাই। ভ্রাতা ভ্রাতার স্কন্ধে অসিধারণ করিয়া অন্তঃপুর কিরূপ রক্তাক্ত করিয়াছিল, অন্তঃপুরের সেই ক্ষুদ্র যুদ্ধের চিত্র এখনও তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত আছে। আজ হিমু প্রৌঢ়া, তাহার দৌহিত্রী জন্মিয়াছে, আজিও সেই ভীষণ দৃশ্যের কথা মনে পড়িলে সে চমকিয়া উঠে। এই হিমাদ্রিবালাই শ্রীমান্ রাজকুমার ঘোষের সহধর্ম্মিণী। রাজকুমার বয়রাগাদীর সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষ মহাশয়দিগের অতি ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি।

হিমু নববধূরূপে আসিয়া অনায়াসে আমাকে দাদা ও মনোরমাকে দিদি করিয়া ফেলিল। সে রাজকুমারের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ জানিত, কাজেই একদিনের জন্যও আমাদিগকে পর ভাবিতে তাহার অবকাশ হয় নাই। আমরাই তাহাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাহাদিগকে স্বতন্ত্র গৃহস্থালী পাতিয়া দিলাম, কেননা গৃহী মাত্রেরই কিছু বন্দোবস্ত করিয়া চলা আবশ্যক, আমাদের সঙ্গে থাকিলে সেইরূপ বন্দোবস্তের আশা নাই। রাজকুমার আমাকে যখন মুক্তকণ্ঠে 'দাদা' বলিয়া ডাকিত তখন আমার প্রাণে বড়ই আনন্দ হইত। একদিন সে আমার সঙ্গে আমাদের দেশে গিয়াছিল, সেখানে তাহার 'দাদা' ডাক শুনিয়া আমার

সহোদরা আমাকে বলিয়াছিলেন যে "রাজকুমার তোমাকে যখন উচ্চকণ্ঠে দাদা বলিয়া ডাকে, তখন তাহাকে ঠিক আমাদের সহোদর ভাই বলিয়া মনে হয়।" সে আমার দিদিকে সেইরূপ সরল ও অকুণ্ঠিত ভাবে 'দিদি' বলিয়া ডাকিত।

শ্রীমান্ বেণীমাধব, রেবতীমোহন ও চণ্ডীচরণ এই সময়ে আমাদের সংসারের অস্থায়ী পরিজন ছিলেন। বেণীমাধব নিঃসঙ্গভাবে দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত; যখন ইচ্ছা হইত আমাদের নিকট আসিয়া বাস করিত, মাঝে মাঝে পিতামাতার নিকটও থাকিত। সে মনোরমাকে 'মা' বলিয়া ডাকিত। রেবতীমোহন সেটেল্‌মেণ্ট অফিসে চাকুরী গ্রহণের পরে মাঝে মাঝে মফস্বল থাকিতেন, যখন সহরে আসিতেন তখন আমাদের পরিবারভুক্ত হইতেন।

চণ্ডীচরণ আজ ইহলোকে নাই। খুড়ীমা মনোরমার বাড়ীতে থাকা, তাঁহার রসুই খাওয়া এবং তাঁহার পরিবেশনে পরিতৃপ্ত হওয়া চণ্ডীচরণের জীবনে একটা বিশেষ সুখ ছিল। চণ্ডীচরণ আমার জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র। আমার সমবয়সী, বাল্যকাল হইতে আমাদের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল; আমরা প্রায় এক সঙ্গেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ও পরে গোঁসাইজীকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছি। আমাতে তাহাতে খুবই ভালবাসা ছিল কিন্তু চণ্ডী তাহার খুড়ীমাকে অধিক ভক্তি করিত। খাওয়া দাওয়া লইয়া তাঁহার সঙ্গে বালকের মতন আবদার করিত, আমাদের সে সংসারসুখের কথা মনে করিয়া আজিও হৃদয় উদ্বেলিত হয়।

শ্রীমান্ মনোমোহন আমাদের সংসারের কর্ত্তা হইল, বাধ্য হইয়া তাহাকে সংসারের ভার গ্রহণ করিতে হইল, নতুবা কে করে? মনোমোহনকে আমি ডাকিতাম 'ভাইটি', সে আমাকে দাদা ডাকিত এবং রাজকুমার, মনোমোহন, রেবতীমোহন মনোরমাকে 'বৌ ঠাক্‌রুণ' ডাকিত। এতগুলি পর লইয়া এত আত্মীয়তার সহিত এমন আনন্দময় সংসার কেহ কোথাও করিয়াছে কিনা জানি না। দরিদ্রতার মধ্যে এত

সুখ কে কবে দেখিয়াছে? কিন্তু এই সকল সুখের মূল কারণ ছিলেন মনোরমা। পরিবারের সকলেরই তাঁহার প্রতি এতটা বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল যে, সকলেই জানিত তিনি সকলকেই সমান ভালবাসেন, তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিতা নাই। বস্তুতঃ স্বামী পুত্র ও অন্যান্য দশজনকে লইয়া নিতান্ত দরিদ্রতার মধ্যে তিনি যেরূপ সকলের সহিত সমদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া কেহ তাহা করিতে পারে না। তাঁহার হৃদয় এরূপভাবে গঠিত হইয়াছিল যে একচুল এদিক্ সেদিক্ টলিতে পারিত না, সমস্ত ঠিক ঠিক ওজন মত। কলিকাতায় এক মুঙ্গেরী ডাল বিক্রেতা বলিত, "মা যেন গঙ্গাজল"।

লিখিতে লিখিতে মন কোথা হইতে কোথায় চলিয়া যায়, এক কথা বলিতে আর এক কথা আসিয়া পড়ে, হৃদয়কে সংযত ও রচনাকে সুশৃঙ্খল করিতে পারিতেছি না। মনোমোহনের 'ম্যানেজমেণ্টের' কথা বলিতে গিয়া কোথায় আসিয়া পড়িলাম। পাঠকপাঠিকা এই উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত লেখককে ক্ষমা করিবেন।

আমাদের সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা সুখ এই ছিল যে কাহারও মনে কিছু সঞ্চয়ের ভাব ছিল না এবং ভাল খাওয়া পরা আমাদের আদর্শ ছিল না। তথাপি মনোমোহনকে সংসারের কথা ভাবিতে হইত। একদিনের একটি ঘটনার উল্লেখ করিব।

বর্ষাকাল। একদিন শেষ রাত্রি হইতে মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে, প্রভাতে কেহ ঘর হইতে বাহির হইয়া দৈনিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেছে না। গর্জ্জন এবং বর্ষণ, বাংলা বাইবেলের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে 'আকাশের উনুই ভাঙ্গিয়া গেল'। মনোমোহনের হাতে টাকাপয়সা কিছুই নাই, অথচ বাজার না করিতে পারিলে পরিজনগণ বিশেষতঃ বালকবালিকাগণ উপবাস করিবে। এই মুষলধারার মধ্যে ঘরের বাহির হওয়ার উপায় নাই যে অন্যত্র গিয়া কাহারও নিকট হইতে কিছু ধার করিয়া আনিবেন। বিছানা হইতে উঠিয়া ছোট একটি টেবিলের সম্মুখে একখানা কেদারায় বসিয়া

মনোমোহন চক্ষু বুজিয়া প্রভাতের উপাসনা করিতেছেন, উপাসনায় মন বসিতেছে না, কেবলই মনে হইতেছে বালকবালিকাগণ কি খাইবে? বৃষ্টি ত কিছুক্ষণ পরে থামিবে কিন্তু হাতে যে কিছু সম্বল নাই। উপাসনায় চিত্ত নিবিষ্ট না হওয়ায় তিনি চক্ষু চাহিলেন এবং দেখিতে পাইলেন তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে টেবিলের উপরে একটি চক্‌চ'কে টাকা। অন্য কেহ যে কোথাও হইতে আসিয়া তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া টাকা রাখিয়া যাইবে সেরূপ কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। ঘরে কেহ প্রবেশ করিলে তিনি অবশ্যই টের পাইতেন। কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও কিছু জানা গেল না। মনোমোহন তখন যুবক এবং অত্যন্ত গোঁড়া ব্রাহ্ম, এ সকল অলৌকিক ঘটনা তিনি বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু ঘটনাটি তাঁহারও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।

তখনও আমি অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করিতাম কিন্তু উহাকে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক মনে করিতাম না। যেখান হইতে যে ভাবে যাহা কিছু আসে তাহাই ঈশ্বরের দান, তিনি প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সকল রকমেই দান করিতে পারেন। মা যখন শিশুকে ঝিনুকে করিয়া দুধ খাওয়ান তখন শিশুর মুখে ঝিনুকখানাই দুধ ঢালিয়া দেয় কিন্তু সেই ঝিনুকের পশ্চাতে একখানা মায়ের হাত আছে, নতুবা জড় পদার্থ কি দয়া করিতে পারে? সেইরূপ এই বিশ্বসৃষ্টির অন্তরালে বিশ্বজননীর হাত রহিয়াছে; লৌকিক ভাবে হউক আর অলৌকিক ভাবে হউক ঈশ্বরই একমাত্র দাতা। মনোরমার সম্পূর্ণ নির্ভরের অবস্থা ছিল, কোথা হইতে আসিল, কে দিল, কিরূপে চলিবে, তিনি এ সকল চিন্তা করিতেন না। যাহা পাইতেন তাহা রাঁধিতেন, সকলকে খাওয়াইতেন, ভূত ভবিষ্যতের চিন্তা তাঁহার কিছুই ছিল না। রেলগাড়ীর যাত্রী যেমন পথনির্ণয়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয় না, মনোরমাও সংসার কিরূপে চলিবে এ কথা ভাবিতেন না, তিনি টিকেট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিয়াছেন।

এই অধ্যায়ে আমাদের পাঁচটি সন্তানের উল্লেখ করিয়াছি, পাঠক আমাদের দুইটি পুত্র ও একটি কন্যার পরিচয় পাইয়াছেন। ১২৯৭

সনের ১লা ফাল্গুন তারিখে আমাদের আর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহার নাম যোগরঞ্জন। আর এই সময়ে আমাদের জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যরঞ্জনকে আমাদের নিকট আনা হইল।

সত্যরঞ্জন*

সত্যরঞ্জনকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়ার জন্য তাহার মাতুল শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দত্ত মহাশয় ফরিদপুর সহরে তাঁহার কার্য্যস্থলে লইয়া গিয়াছিলেন। এই সুযোগে মেজদিদির অনুপস্থিতিতে আমি ফরিদপুর যাইয়া তাহার মাতুল মহাশয়কে অনেক বুঝাইয়া শ্রীমান্‌কে বরিশালে লইয়া আসিলাম। তখন তাহার বয়স প্রায় দশ বৎসর। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, বালকের অনিচ্ছায় আমি তাহাকে ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত করিব না। বালক বয়োবৃদ্ধি সহকারে আপনাকে বড়ই দুঃখী মনে করিতেছিল, একদিকে পিতামাতার প্রতি প্রাণের স্বাভাবিক আকর্ষণ, অন্যদিকে মেজদিদি প্রভৃতির প্রতি অতুল ভালবাসা, এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া দোটানায় তাহার প্রাণ ফাটিয়া যাইত। সে স্বাভাবিক অত্যন্ত ভালবাসাপ্রবণ, কোনও পক্ষকে উপেক্ষা করাই তাহার পক্ষে সহজ কথা ছিল না। আমার সঙ্গে আসিবার সময়ে সে খুব কাঁদিয়াছিল। লোকেরা পিতামাতা হইতে তাহার মন ফিরাইবার জন্য ব্রাহ্মদিগের আচরণ সম্বন্ধে তাহাকে এত বীভৎস কথা শুনাইত যে, সে সকল শুনিয়া সে ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইত।

বরিশালে সত্যরঞ্জনকে লইয়া আসিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে তাহার খাওয়ার বন্দোবস্ত করিলাম। তবে সে সর্ব্বদাই আমাদের বাসায় থাকিত। তাহার মা তাহার কাছে বসিয়া

---

*১৩১৭ সনের ৮ই আশ্বিন ৩০ বৎসর বয়সে সত্যরঞ্জন মায়িক দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহার পবিত্র জীবনের বিশেষতঃ মৃত্যুকালের অপূর্ব্ব ঘটনা এই পুস্তকের উপসংহারে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইবে।

অন্যান্য ছেলেমেয়েদিগকে খাওয়াইতেন, কিন্তু তাহাকে কখনও সেই সঙ্গে খাইতে বলিতেন না। কয়েক দিনে সত্যরঞ্জন দেখিল খাদ্যাদি সম্বন্ধে আমাদের বাড়ীর এবং তাহার মামাবাড়ীর লোকেরা যে সকল বিভীষিকা দেখাইয়াছে, সে সকল সর্ব্বৈব মিথ্যা, তখন আমাদের ঘরে আদৌ মৎস্য মাংস আসিত না। একদিন মনোরমা সন্তানগণকে আহার করাইতেছেন, সতু (সত্যরঞ্জন) তাহাদের সঙ্গে আহার করিতে বসিয়া গেল। এই কয়দিন মায়ের সাক্ষাতে থাকিয়াও তাঁহার হাতে ও ভাইভগিনীদের সহিত একসঙ্গে না খাইতে পাইয়া সে অন্তরে একটা বিষম ক্লেশ অনুভব করিতেছিল।

একদিন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দিরে শ্রীমান্‌কে লইয়া গেলাম। বালক নিবিষ্টমনে উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিল, কিন্তু সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। বাড়ীতে আসিয়া বলিল, "এ কিরূপ উপাসনা? আমি ভাবিয়াছিলাম যে, লোকেরা অনেকক্ষণ ধরিয়া ধ্যান করিবে, তাহা ত মোটেই দেখিলাম না।" মুনিঋষিদিগের সম্বন্ধে সে যেরূপ শুনিয়াছিল, তাহারই একটা আদর্শ দেখিতে তাহার ইচ্ছা ছিল। আমি তাহার কথা শুনিয়া মনে মনে খুব সন্তুষ্ট হইলাম। ইহার কিছুদিন পরেই সেই বালক এমন নিবিষ্টমনে সামাজিক উপাসনায় যোগ দিতে লাগিল যে তাহার একাগ্রতা ও নিবিষ্টচিত্ততা দেখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস মহাশয় সহাস্যমুখে একদিন আমাকে বলিলেন যে, "জ্যেষ্ঠপুত্র যেরূপ গম্ভীরভাবে নিবিষ্টচিত্তে উপাসনায় যোগ দিতেছে, তাহাতে তোমাদের আর উপাসনার দরকার হইবে না, এই বালকই তোমাদের প্রতিনিধি হইবে।"

———

অতিথির সম্মান

আমাদের নূতন ঘরের ভিটি বাঁধা হইল। যে সকল নমশূদ্র মাটির কার্য্য করিয়াছিল, একদিন আমি তাহাদিগকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ

করিলাম। কলাপাতায় তাহাদিগকে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করা হইল। এ সময়ে কিছুদিনের জন্য আমাদের চাকর কিংবা চাকরাণী ছিল না। নমশূদ্রগণ আহারান্তে যথারীতি পাতা তুলিয়া স্থান পরিষ্কারের উদ্যোগ করিতেছিল, মনোরমা তাহাদিগকে বাধা দিয়া আপন হাতে পাতা ফেলিয়া স্থান পরিষ্কার করিলেন। বলিলেন, "আজ উহারা মজুর নহে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তি, সুতরাং উহাদিগকে নিজ হাতে স্থান পরিষ্কার করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।"

অদ্ভুত অতিথি

বরিশালে একটি অদ্ভুত অতিথি উপস্থিত হইল। তাহাকে যদি পাগল বলি তবে ধর্ম্মোন্মত্ত বলিতে হইবে। সে ব্যক্তি ছিল 'শানদার,' ঢুলিদের সঙ্গে শানাই বাজাইত, এই শ্রেণীর লোককে পূর্ব্ববঙ্গে 'শানদার' বলে। সে বলিত যে, পূর্ব্বে অমুক ঢুলির দলে শানাই বাজাইত, এখন সকল দলেই বাজাইতেছে। 'সকল দলেই বাজাইতেছে' কথাটার গভীর অর্থ আছে। সে অর্থ এই যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে পূর্ব্বে সে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, এখন সকল সম্প্রদায়ই তাহার নিজের দলে পড়িয়াছে অর্থাৎ কোন ধর্ম্মের সঙ্গেই তাহার বিরোধ নাই। এই সার্ব্বভৌমিক ভাব সে কাহারও নিকট শিক্ষা করে নাই, এই ভাব তাহাতে আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন সাধনপথে অগ্রসর হইলে সুগভীর তত্ত্বসকল আপনি প্রাণে ফুটিয়া উঠে, মুখস্থ করিয়া আওড়াইতে হয় না! চৈতা নামে এক বাউল ছিলেন (বোধ হয় সম্পূর্ণ নামটি চৈতন্যদাস হইবে), তাঁহার রচিত একটি সঙ্গীতের শেষ ছত্রটি ছিল, "চৈতা দেখে সব একাত্মা, আমি আত্মপ্রত্যক্ষ পেয়েছি"। চৈতা কখনও বেদান্ত পাঠ করে নাই, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান আপনি তাহার প্রাণে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহারই নাম 'ফোটাধর্ম্ম'।

আমাদের পাগল শানদারের প্রাণেও ধর্ম্ম ফুটিয়াছিল, তাহার সহিত

আলাপ করিয়া সকলেই আনন্দ লাভ করিতেন কিন্তু সে ব্যক্তি বলিত যে, সে এমন লোক সহরে দেখিল না যাহার উপর কলির প্রভাব কিছু না কিছু কার্য্য না করিতেছে। অমুকের বাড়ীতে আট আনা কলি, অমুকের বাড়ীতে চারি আনা কলি, এইরূপে সে সকলকেই কিছু কিছু কলির অধিকার বন্টন করিয়া দিত। একদিন শানদার আমার বাড়ীতে আহারের অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। আমি বলিলাম যে, ভদ্রলোকের পরিবারের মধ্যে যাইতে হইলে তাহাকে একটু ভদ্রভাবে চলিতে ও কথা বলিতে হইবে। সে বলিল, হুকুম না হইলে সে আমার বাড়ীতে ঢুকিবে না। আমি বলিলাম, "কাহার হুকুম ?" সে বলিল, "তোমার বাড়ীর দরজায় আমি দাঁড়াইয়া থাকিব, ভিতর হইতে (অন্তর হইতে) হুকুম আসিলে তবে অন্দরে প্রবেশ করিব নতুবা ফিরিয়া আসিব।" সে ব্যক্তি সত্য সত্যই সেইরূপ আচরণ করিল। আমাদের বাহির বাড়ীর মাঠে কিছুক্ষণ চক্ষু বুজিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল, পরে বলিল, "কোন ভয় নাই ভিতরে চল"।

মনোরমা থালা বাটি সাজাইয়া অতি যত্নে তাহাকে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিলেন। পাগল আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই মেয়েটি কি তোমার স্ত্রী ? এটির মধ্যে মোটেই কলির অধিকার নাই, এটি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।" মনোরমা সম্বন্ধে শানদার কোন কথাই জানিত না, তাহার এইরূপ মন্তব্য প্রকাশে আমি বিস্ময়ান্বিত হইলাম। তাহার আহারান্তেও মনোরমা নিজ হাতে এঁটো পরিষ্কার করিলেন।

মনোরমার এই ভাবটি ব্রাহ্মসমাজের সাম্যবাদের ফল নহে। শুনিয়াছি বাল্যকাল হইতেই অতিথির প্রতি তাঁহার সমুচিত শ্রদ্ধা ছিল, এ বিষয়ে তাঁহাকে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমিতি

স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু এবং ডেপুটিকণ্ট্রোলার ৺রজনীনাথ রায় প্রভৃতি কতিপয় ব্রাহ্মের উদ্যোগে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমিতি নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের সমস্ত ব্রাহ্ম লইয়া এই সমিতি গঠিত হইয়াছিল। ঢাকা সহরে ইহার কেন্দ্রস্থান নিরূপিত হইল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমিতি আমাকে তাহার প্রথম ও একমাত্র প্রচারক মনোনীত করিলেন। আমার সঙ্গে এই বন্দোবস্ত হইল যে, সমিতি আমাকে কর্ম্মচারীর মত খাটাইতে পারিবেন না। আমি আমার ইচ্ছামত প্রচারকার্য্য করিব। বস্তুতঃ এই সমিতির প্রচারক হইয়া আমার স্বাধীনতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল না। সেরূপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে আমি কদাচ তাঁহাদের প্রচারক হইতাম না।

ব্রাহ্মসমাজের কাজের জন্যই আমাকে বরিশাল ছাড়িয়া ঢাকায় যাইতে হইল। সুতরাং বরিশালের ব্রাহ্মগণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন।

বরিশাল হইতে বিদায়

বরিশাল হইতে বিদায় লইতে প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইয়াছিলাম, আজ বরিশালের কথা সমাপ্ত করিতেও প্রাণে ব্যথা পাইতেছি। বরিশালের কোনও কথাই ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু সে সকল কথার সঙ্গে মনোরমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ তেমন কিছুই নাই। বিশেষতঃ আমার প্রাণের দরদ লইয়া পাঠকপাঠিকাগণ যে বরিশালের কথা পাঠ করিবেন, এরূপ আশা কিছুতেই করিতে পারি না। যে একযুগকাল আমি বরিশালে বাস করিয়াছিলাম, সে সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিলেও একখানা বৃহৎ পুস্তক হইতে পারে।

ভক্ত জমিদার ৺রাখালচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ীকে তখন লোকেরা

শ্রীবাসের আঙ্গিনা বলিত। এরূপ নাম প্রদান করা যে অত্যন্ত অসঙ্গত তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু রাখাল বাবুর বাড়ী তখন নিরন্তর ভগবানের নাম গানে মুখরিত হইত। বেলা ৯টার পরে সমাজের উপাসনান্তে ভক্তগণ প্রায়শঃ সেখানে উপস্থিত হইতেন এবং খোল, করতাল ও পিয়ানো সংযোগে 'দয়াময়' নাম ও 'হরি' নামের ধ্বনি করিতেন। শ্রীমান্ অশ্বিনীকুমার দত্তের ন্যায় পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপনাকে ভুলিয়া সেই কীর্ত্তনের সঙ্গে অবিশ্রান্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা নৃত্য করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ উকিল ভগবদ্ভক্ত ৺গোরাচাঁদ দাস মহাশয় ভাবে বিভোর হইয়া সাষ্টাঙ্গ করিয়া সকলের পদধূলি গ্রহণ করিতেন। শান্ত ভক্ত ৺দ্বারকানাথ গুপ্ত মহাশয় ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া মাঝে মাঝে উচ্চৈঃস্বরে 'গুরুদেব শিব' বলিতেন। সাধননিষ্ঠ গৃহস্থ যোগী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র সেন মহাশয় বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ৩।৪ ঘণ্টা ধ্যানস্থ থাকিতেন। শ্রীমান্ রেবতী ও মনোমোহনের মধুর কণ্ঠের ভাবপূর্ণ সঙ্গীত, স্নেহাস্পদ রাজকুমারের ভক্তিমাখা কীর্ত্তন, বন্ধুবর নন্দকুমার ঘোষের গম্ভীর মধুর স্বর, সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ জমিদার রাখালচন্দ্রের অশ্রুপ্লাবিত গণ্ড ও ভাববিহ্বলতা, স্নেহাস্পদা ৺চারুবালা দেবীর কীর্ত্তনের সহিত পিয়ানোধ্বনি, আর কত কি বলিব! সমস্ত মিলিয়া মিশিয়া রাখালভবনকে আনন্দনিকেতন করিয়া তুলিয়াছিল। বস্তুতঃ তখন বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মভাবের একটা স্রোত বহিয়াছিল। বরিশালের ব্রাহ্মগণ অন্য কোথাও যাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। এমন কি, মাঘোৎসবের সময়েও কেহ বরিশাল ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইতেন না। সর্ব্বানন্দ বাবুর পরে শ্রদ্ধেয় বন্ধু কামিনীকান্ত গুপ্ত সমাজের সম্পাদক হইয়াছিলেন। ইনি মধুরপ্রকৃতি, সরল কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মানুরাগী। ৺গোরাচাঁদ দাস মহাশয় ফৌজদারীতে সর্ব্বপ্রধান উকিল ছিলেন। তখন বরিশালে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না, কিন্তু শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট সাধন গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার কর্ম্মবন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল। অধিকাংশ সময়ে তিনি ধর্ম্মবন্ধুগণের

সহিত রাখাল-ভবনে সময় যাপন করিতেন, মক্কেলগণ তাঁহাকে ডাকিয়া পাইত না, বলা বাহুল্য ইহাতে তাঁহার অর্থাগম কমিয়া গিয়াছিল। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন আমরা যেখানেই থাকি না কেন, প্রতি বৎসর তিনি মনোরমাকে মিষ্টান্ন ভোজনের জন্য পাঁচটি টাকা ও একখানা শাড়ী কাপড় দিতেন। মনোরমার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি বলিতেন যে, ইঁহার (মনোরমার) দৃষ্টি এতই পবিত্র যে, চক্ষের দিকে চাহিলে যিশুখ্রীষ্টের চক্ষুর মতন বোধ হয়। ইঁহার মনের অবস্থা উপলব্ধি করিবার শক্তিও আমাদের নাই। অশ্বিনী বাবু মনোরমাকে এত ভক্তি করিতেন যে, তাঁহার নামের সহিত 'দেবী' শব্দ যোগ করিয়া কথা বলিতেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

বরিশালের শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাক্তারপ্রবর শ্রীযুক্ত তারিণীকান্ত গুপ্ত মহাশয় আমার বরিশালে অবস্থানকালে যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে প্রগাঢ় যত্ন সহকারে আমাদের সমস্ত পরিবারের চিকিৎসা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের শরীর তাঁহার নিকট বন্ধক রহিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি শুধু যে নিঃস্বার্থভাবে চিকিৎসা করিতেন তাহা নহে, ঔষধপত্রও বিনামূল্যে দিতেন। একদিন তাঁহার কম্পাউণ্ডারকে আমি বলিলাম যে, তিনি যদি ঔষধের হিসাবটা লিখিয়া রাখেন, তবে কখনও সুবিধা হইলে আমি মূল্য দিতে পারি। আমার কথার উত্তরে তিনি বলিলেন যে, সেরূপ কিছু লিখিয়া রাখিলে ডাক্তারবাবু অসন্তুষ্ট ও দুঃখিত হইবেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ৺নবীনচন্দ্র সেন এবং কবিরাজ ৺মথুরানাথ সেন ও শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন প্রভৃতির নিকটও আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, তাঁহারা সকলেই আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

যেদিন আমরা নৌকাযোগে ঢাকায় রওনা হইলাম, সেদিন

মনোমোহন, রাজকুমার প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুবর্গ আমাদিগকে বিদায় দিতে নৌকায় আসিলেন। তাঁহারা অশ্রুপূর্ণনয়নে আমাদিগকে বিদায় দিলেন। সেদিনকার হৃদয়বেদনার কথা আজিও আমার মনে আছে। ইঁহারা মনোরমাকে মায়ের ন্যায় ভক্তি করিতেন, ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিতেন। মনোরমাও ইঁহাদিগকে নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। আমাদের সন্তানগুলি ইঁহাদের সকলেরই পরম স্নেহভাজন ছিল।

আমরা যেরূপ প্রাণে প্রাণে মিলিয়া মিশিয়া এক পরিবারের লোক হইয়া দীর্ঘকাল পারিবারিক সুখে ছিলাম, কদাচিৎ কোন পরিবারে সহোদর সহোদরার মধ্যে সেরূপ ভাব দেখা যায়। মনোমোহন, রাজকুমার প্রভৃতি অশ্রুপূর্ণনয়নে আমাদিগকে অভিবাদন করিয়া নৌকা হইতে উঠিলেন। মনোরমা তাঁহাদিগকে একটি কথাও বলিতে পারিলেন না। নৌকা ছাড়িয়া দিলে তিনি একদৃষ্টে তাঁহাদিগের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহারা চক্ষুর অন্তরাল হইলে তাঁহার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল এবং তিনি ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলেন, আমি অনেক কথা বলিয়া তাঁহাকে শান্ত করিলাম।

ঢাকা গমন

আমরা (বোধ হয়) কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে রওনা হইলাম। তখন বরিশাল হইতে নৌকাযোগে ঢাকা পৌঁছাইতে ৩।৪ দিন লাগিত। মধ্যপথে একদিন বড়ই সঙ্কট উপস্থিত হইল। বরিশাল হইতে রওয়ানা হইয়াই মনোরমা অতিশয় উগ্র-জ্বরে আক্রান্তা হইলেন। দুইদিন জ্বরের পরে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার ভয় হইল। সেইদিনকার রাত্রে এমনই কুজ্ঝটিকা হইয়াছিল যে, রাত্রিকালে মাঝিরা পদ্মাগর্ভে দিঙ্‌নির্ণয় করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িল। তখন

অনন্যোপায় হইয়া তাহারা দাঁড় ছাড়িয়া দিয়া বসিল, স্রোতোবেগে নৌকা কোথা হইতে কোথায় যাইতেছিল, কিছুই নির্ণয় করিবার উপায় ছিল না। কোনদিকেই কূল-কিনারা নাই, আমরা অকূলে ভাসিয়া চলিলাম। সর্ব্বদাই আমাদের মনে এই আশঙ্কা হইতেছিল যে, এই প্রবল স্রোতে ভাসিয়া নৌকাখানি যদি কোন মগ্ন-চড়ায় আঘাত পায় তবে তৎক্ষণাৎ ডুবিয়া যাইবে। তখন পদ্মা-নদীতে এরূপ মগ্ন-চড়ার অভাব ছিল না, তাহাতে ঠেকিয়া কত শত মহাজনের ভরা ডুবিয়াছে এবং কত আরোহীপূর্ণ নৌকা ধনপ্রাণ লইয়া অতলে নিমগ্ন হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। সুতরাং আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ ছিল। সেই সুগভীর জলে প্রবল স্রোতের মুখে নঙ্গর ফেলিয়া নৌকা ঠিক রাখার সুযোগ ছিল না। কাজেই প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের সমস্ত পরিবারবর্গের জলসমাধির জন্য মনোরমা ও আমি প্রস্তুত হইয়াছিলাম। বালক-বালিকাগণ এতটা বুঝিতে পারে নাই, তবে মাঝিদিগের কথাবার্ত্তায় ও ঝগড়া-বিবাদে অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক দুইটি পুত্র বুঝিতে পারিয়াছিল যে, আমরা কোনরূপ একটা বিপদে পড়িয়াছি। তাহারা কাঁদিতে লাগিল। এই অবস্থার মধ্যে মনোরমার অত্যুগ্র জ্বর ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত বমি হইতে লাগিল। এখন আমি কোন্ দিক্ দেখি? মনোরমার হাত ধরিয়া আমার মনে হইতেছিল যেন তাঁহার নাড়ী বসিয়া যাইতেছে। ভাবিলাম, বুঝি এতদিনের পর আমার সংসার নাটকের যবনিকাপতন হইল। কিন্তু এইরূপ সঙ্কটকালে এবং শারীরিক যাতনার মধ্যে মনোরমা অবিচলিতভাবে ভগবানের নামে মগ্ন আছেন, তাঁহার একটি শ্বাসও বৃথায় যাইতেছিল না। আমি যখন এই সঙ্কটে চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছি, তিনি তখনই স্থিরনেত্রে শান্ত ভাবে আমার দিকে চাহিতেছেন, তাহা দেখিয়া আমার আবিশ্বাসী অশান্ত চিত্ত কিছুকালের জন্য ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছিল।

সারা রাত্রি আমাদের নৌকাখানি স্রোতোমুখে ভাসিয়া যাইতেছিল, কোথায় যে যাইতেছে, আমরা কিছুই জানিতাম না। তখন পদ্মানদীতে

মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চড়া পড়িয়াছিল। আমাদের নৌকা যদি বিপথে যাইত, তবে হয়ত একটা চড়া ঘুরিয়া আবার পথে আসিতে একদিনের ফেরে পড়িতে হইত, কিন্তু প্রভাতের সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অদূরে একখানি গ্রাম দৃষ্ট হইল। আর একটু নিকটবর্ত্তী হইলে চিনিতে পারা গেল যে, আমাদের নৌকা সুপ্রসিদ্ধ 'লৌহজঙ্গ' (লৌজঙ্গ) গ্রামের নিকটে পৌঁছিয়াছে। এই কাষ্ঠময় তরণীখানি দয়াময় ভগবানের ইচ্ছায় সারারাত্রি ঠিক্ ঠিক্ সুপথ ধরিয়া চলিয়াছিল, একটুকুও এদিক্ সেদিক্ যায় নাই। এই অকূলে কূল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনোরমার জ্বরও ছাড়িয়া গেল।

পাঠক 'কালবৈশাখী' কাহাকে বলে জানেন ত? সু-নির্ম্মল আকাশ, কিছুর মধ্যে কিছু নাই, হঠাৎ বায়ুকোণে একটু মেঘের সঞ্চার হইল, দেখিতে দেখিতে মেঘ-খণ্ড বিস্তৃতি লাভ করিল, তাহার মধ্যে বিদ্যুৎ চম্‌কাইল, সঙ্গে সঙ্গে তুমুল ঝড় উপস্থিত হইয়া গাছপালা ভাঙ্গিয়া খড়ো ঘরের চালা উপ্ ছাইয়া বিপুল ধূলি উড়াইয়া, মাঠের রাখাল ও গরু মহিষগুলিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া হৈ রৈ ও হুলস্থূল বাধাইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে কোথায় চলিয়া গেল। ইহাকে পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন বিভাগে 'টাট্‌কা' বলে। ঝটিকা হইতে 'ঝট্‌কা' হইয়াছে। 'টাট্‌কা' শব্দ কোন্ শব্দের অপভ্রংশ বলিতে পারি না কিন্তু 'টাট্‌কা' বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ঝটিকা বলিতে সম্পূর্ণ তাহা বুঝায় না। যে প্রবল ঝটিকার পূর্ব্ব-সূচনা আগে প্রকাশ পায় না, তাহারই নাম 'টাট্‌কা'। তখন তখনই তৈয়ারী বলিয়া বোধ হয় উহার 'টাট্‌কা' নাম দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক প্রাকৃতিক জগতের মতন মনুষ্যজীবনে মাঝে মাঝে এইরূপ 'টাট্‌কা' আসিয়া থাকে। ইহা দ্বারা মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাস ও মানসিক বলের পরীক্ষা হয়। হঠাৎ ধাক্কা খাইয়া যে ব্যক্তি পড়িয়া না যায় তাহাকেই বলবান্ এবং সাবধান বলিতে হইবে। পাঠকপাঠিকা ক্রমশঃ দেখিতে পাইবেন, আমাদের পরিবারে অনেক 'টাট্‌কা' আসিয়াছে কিন্তু তাহার একটিতেও মনোরমাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই।

ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালা-ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরটী ঢাকা সহরের পাটুয়াটুলী নামক বড় রাস্তার উপরে একটি বড় কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটী দেখিতে খুব সুন্দর, উহার উত্তরদিকে মন্দিরের পশ্চাতে 'ব্রাহ্ম প্রচারক আশ্রম' একটি সুন্দর দোতালা বাড়ী। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ ধনী সাহাবংশীয় প্রতাপচন্দ্র দাস তাঁহার পিতার নামে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাজ-কমিটীর হাতে অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম অনুসারে এই আশ্রমের 'রাজচন্দ্র ব্রাহ্ম প্রচারক নিবাস' নাম হইয়াছে। আমরা এই ষোল-আনা আশ্রমটী আমাদের বাসের জন্য পাইয়াছিলাম, এবং পূর্ব্ব-বাঙ্গালা-ব্রাহ্ম-সমিতি আমাদের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের একরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। আমরা যেকোনরূপে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতাম, প্রয়োজন বাড়াইয়া কখনও ক্লেশ ভোগ করি নাই। ঢাকায় যাইয়াই মনোরমা একেবারে শয্যাগত হইলেন। ক্রমে ক্রমে এই অসুখ (ম্যালেরিয়া জ্বর) ভীষণ আকার ধারণ করিল, এমন কি অনেক সময়ে তাঁহার জীবনের আশায় আমরা নিরাশ হইয়া পড়িতাম। এই সময়ে সমাজের সম্পাদক ৺রজনীকান্ত ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দত্ত এবং চণ্ডীচরণ কুশারী, ৺নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ৺জগবন্ধু লাহা, ৺কালীনারায়ণ গুপ্ত, (শ্রীযুক্ত কে, জি, গুপ্ত মহাশয়ের পিতা) প্রভৃতি মহাশয়গণ সর্ব্বদাই আমাদের তত্ত্ব লইতেন। সুচিকিৎসক ৺জয়চন্দ্র ঘোষ মহাশয় অতি যত্নের সহিত আদ্যন্ত মনোরমার চিকিৎসা করিয়াছেন, তাঁহার নিকট আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞ আছি ও থাকিব।

মনোরমা ত একপ্রকার মৃত্যুশয্যায় শয়ান, এই সময়ের মধ্যে আমাদের বড় তিনটী পুত্র ও কন্যাটিও ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইল। সকাল বেলা উঠিয়া মনোরমাকে ঔষধ পথ্য দিয়া সন্তানগণকে কিছু খাওয়াইয়া দুইটি মাদুর পাতিয়া বালিস সাজাইয়া রাখিতাম, ২।৩ ঘণ্টা মধ্যেই একটির পর একটি করিয়া সন্তানগুলি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করিত, তাহাদের মুখের কাছে এক একটি করিয়া

সরা ও এক এক গ্লাস জল রাখিয়া দিতাম। তাহারা বমি করিত এবং নিজেরাই মুখ ধুইত। এই অবস্থার মধ্যেও আমার প্রচারের নেশা কিছুমাত্র কমে নাই, আমি ছাত্রসমাজে ও ব্রাহ্ম-সমাজে বক্তৃতা করিতাম, আলোচনায় যোগদান করিতাম, আচার্য্যের কার্য্য করিতাম এবং কখন কখন সহরের বাহিরে প্রচারের জন্য যাইতাম। আমার আহারনিদ্রার অবকাশ ছিল না।

বরিশাল হইতে ঢাকায় গিয়া নিজকে বড়ই বান্ধবশূন্য বোধ হইতে লাগিল। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে অনেক শ্রদ্ধেয় লোক ছিলেন, কিন্তু সেখানকার ব্রাহ্মসমাজে একটা জমাট ভাব ছিল না; একেত বড় সহর, তাহাতে সকলের মধ্যেই যেন একটু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাব ছিল। পুরাতন আত্মীয়ের মধ্যে আচার্য্য গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পরিবার পাইলাম কিন্তু তাঁহাদের বাসাবাড়ী সমাজ-মন্দির হইতে অনেক দূরে, বিশেষতঃ মজুমদার-গৃহিণীর ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত স্কুলে পড়াইতে হয় এবং বাড়ীতে রান্নাবান্না ও গৃহস্থালী করিতে হয়, তাঁহারা সর্ব্বদা আমাদিগকে দেখিতে অবকাশ পাইতেন না, তবে সময় পাইলেই মাঝে মাঝে আসিতেন। সমাজ-বাড়ীতে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ কুশারী মহাশয় থাকিতেন, তিনি আমাদের তত্ত্ব খবর সর্ব্বদা লইতেন কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকায় রাত্রে আমার কোন সাহায্য করিতে পারিতেন না। ক্রমান্বয়ে অন্ততঃ দুইমাস পর্য্যন্ত আমি দিবারাত্রে ২ ঘণ্টার অধিক ঘুমাইতে পারি নাই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দত্ত মহাশয়ের বাড়ী হইতে কখন কখন আমার ভাত আসিত, আমি পেট ভরিয়া ভাত খাইতাম না, মনে ভয় ছিল যদি আমি পীড়িত হইয়া পড়ি তবে কে এই রোগীদিগের সেবা কবিবে? মনোরমার উত্থানশক্তি ছিল না, তিনি রুগ্‌ণ সন্তানদিগের এবং আমার অবস্থা দেখিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন, মনে হইত যেন তিনি এই সময়ে আমার সাহায্য করিতে পারিতেছেন না বলিয়া অত্যন্ত মানসিক ক্লেশ ভোগ করিতেছেন।

দিনের পর দিন মনোরমার পীড়া কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে

লাগিল, পরিশেষে এমন অবস্থা উপস্থিত হইল যে আমি প্রতিদিন বিপদের আশঙ্কা করিতে লাগিলাম। তিনি এতই দুর্ব্বল ও রক্তশূন্য হইয়া পড়িলেন যে কখন কখন তাঁহার এক হাতে নাড়ী পাওয়া যাইত না। এই সময়ে তিনি পূর্ণ-গর্ভবতী, সকলেই আশঙ্কা করিতে লাগিল যে প্রসবের সময়ে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইবে।

আচার্য্য গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ উষারঞ্জন এই সময়ে ঢাকার সার্ভে স্কুলে পড়িত, পড়াশুনা তাহার কিছুই ভাল লাগিত না, সে বিদ্যালয় হইতে মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় আসিত এবং রোগীদিগের সেবায় আমার সাহায্য করিত এবং ঔষধপত্র আনিয়া দিত। আমি তাহাকে বলিলাম যে কেহ যদি রাত্রে দুই ঘণ্টার জন্য আমাকে অবকাশ দেয় তবে বাকি সমস্ত রাত্রি জাগিতে আমার কোন ক্লেশ হইবে না। সেই দিন হইতে উষারঞ্জন রাত্রে আমাদের বাড়ী থাকিতে লাগিল। আমি যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।

এই উপলক্ষে উষারঞ্জনের চিকিৎসা-বিদ্যার প্রতি অনুরাগ দেখিয়া আমি তাহাকে মেডিকেল স্কুলে ভর্ত্তি হইতে পরামর্শ দিলাম। আশ্চর্য্য এই যে মেডিকেল স্কুলে প্রবেশ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই সে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র হইয়া উঠিল, ইহার পরে প্রত্যেক বৎসরের পরীক্ষায় প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া নানাপ্রকারের পদক লাভ করিয়া শেষ পরীক্ষায়ও সে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিল এবং এক্ষণ কুমিল্লার ডাক্তার উষারঞ্জন একজন নামকরা সুচিকিৎসক।

আমাদের দেশের অভিভাবকগণ সন্তানের মতিগতি ও শক্তি সামর্থ্যের দিকে দৃষ্টি না রাখায় অনেক ছাত্রই কার্য্যক্ষেত্রে সফলকাম হয় না। উষারঞ্জন সার্ভে বিভাগে পড়িতে থাকিলে কোনও কালে যে তাহার কিছু সুবিধা হইত এরূপ মনে হয় না, যাহা হউক মনোরমার সেবা করিতে আসিয়া তাহার প্রকৃত পথ নির্ণীত হইয়াছিল।

ক্রমে পাড়া এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে কোন প্রকারের পথ্যই পেটে টিকিতে ছিল না, এক আউন্স দুধ খাওয়াইলে তৎক্ষণাৎ বমি

হইয়া যাইত। চিকিৎসক বলিলেন পেটে থাকুক আর না থাকুক দশ মিনিট অন্তর এক আউন্স দুধ দিতেই হইবে। সুপ্ দেওয়ার জন্য চিকিৎসক ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, মনোরমা নিরামিষাশী বিশেষতঃ মাংস খাইতে গুরুর নিষেধ আছে। চিকিৎসকের বিশেষ অনুরোধে আমিও চঞ্চল হইয়া উঠিলাম এবং এ বিষয়ের অনুমতি জিজ্ঞাসার জন্য গেণ্ডারিয়ায় শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট ছুটিয়া গেলাম। তিনি বলিলেন, ইচ্ছা হইলে পীড়ার অবস্থায় চিকিৎসকের উপদেশানুসারে সুপ্ খাইতে পারেন। ছুটিয়া আসিয়া আমি মনোরমাকে এ কথা জানাইলাম, তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তিনি (গুরুদেব) কি বলিয়াছিলেন যে উহা আমার খাওয়া কর্ত্তব্য ?" আমি বলিলাম তাহা বলেন নাই, তিনি বলিয়াছেন ইচ্ছা হইলে তুমি খাইতে পার। মনোরমা বলিলেন "ইহা আদেশ নহে, আমি সুপ্ খাব না, খেলে আমার কিছুমাত্র উপকার হবে না, খেতেও আমার ইচ্ছা নাই।" আমি বলিলাম যে, আমি অতি বিপন্ন, কিরূপ সঙ্কটে পড়িয়াছি তুমি তাহা দেখিতেছ। মনোরমার সেই মৃত্যুছায়া-পতিত মুখে হঠাৎ হাস্যরেখা প্রকটিত হইল, আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "কিছু হবে না।"

পীড়া যখন চরম সীমায় উঠিয়াছে, রোগিণী যখন জীবন মরণের সন্ধিস্থলে তখন একদিন (১৭ই মাঘ) ব্রহ্মমুহূর্ত্তে নিরাপদে, এমন কি বিনা ক্লেশে মনোরমা একটী সুকুমার কুমার প্রসব করিলেন। সেদিন পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রাহ্মসমাজের বালকবালিকার উৎসব, সকলে বলিল যে এই উৎসবের দিনে একটী নূতন বালকের আবির্ভাব হইল।

সন্তানটী এতই ছোট হইয়াছিল যে তাহাকে প্রসব করিতে কোন ক্লেশ হয় নাই। স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ ধাত্রী ৺ফুলমণি দাসী প্রসব-বেদনার সংবাদ পাইয়াই রাত্রিকালে উপস্থিত হইলেন, মজুমদার-গৃহিণীও তখনই আসিয়াছিলেন। সকলের অন্তরেই দারুণ আশঙ্কা ছিল, নিরাপদে প্রসব হওয়ায় সকলেই অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

মাঘ মাসের প্রারম্ভেই মাঘোৎসব আরম্ভ হইয়াছে, এই সময়ে

আমাদের অবস্থার কথা উপরেই বর্ণনা করিয়াছি কিন্তু উৎসবের মধ্যে আমাকে অনেক কাজ করিতে হইয়াছে, কখন বক্তৃতা কখন উপাসনা কখন আলোচনা, এমন দিন ছিল না যে দিন আমার একাধিক কর্ত্তব্য ছিল না। আমার কখন কি কাজ তাহা জানিতে পারিয়া মনোরমা তৎক্ষণাৎ আমাকে সেই কার্য্যে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন, আমি যখন তাঁহার শয্যাপাশ হইতে সহজে উঠিতে চাহি নাই, তিনি বলিয়াছেন "যাও কিছু হবে না।"

এই প্রসঙ্গে ধাত্রী ফুলমণি দাসীর সম্বন্ধে কিছু না বলিলে অন্যায় হইবে। তিনি খৃষ্টান ছিলেন, কলিকাতার নব্যপাত্রী রেভারেণ্ড বিমলানন্দ নাগ তাঁহার এক জামাতা। একবার নারায়ণগঞ্জে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে ফুলমণি প্রসব করাইতে গিয়াছিলেন। সে বাড়ীতে সমস্তই খড়ো ঘর, হঠাৎ বাড়ীতে আগুন লাগিল। যে ঘরে প্রসূতি শায়িত ছিল-সেই ঘরের চালা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, "আগুন আগুন" বলিয়া কোলাহল হওয়ায় সকলেই ঘরের বাহির হইয়া পড়িয়াছে, সকলেই আপনাপন প্রাণ ও জিনিসপত্র লইয়া ব্যতিব্যস্ত। এদিকে জরায়ুর মুখ ছাড়িয়া সন্তানের মাথা বাহির হইয়াছে, ওদিকে চালা পুড়িয়া ঘরের ভিতরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়িতেছে, ধাত্রীকে সকলে বাহির হইয়া আসিতে বলিতেছে, তিনি বলিলেন প্রসূতির সঙ্গে তিনি সেখানে পুড়িয়া মরিবেন তথাপি তাহাকে ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে পারিবেন না। ভগবানের কৃপায় অবিলম্বে সন্তান প্রসূত হইল, সন্তানটীকে কোলে লইয়া এবং অন্য একজনার সাহায্যে প্রসূতিকে ধরিয়া লইয়া ফুলমণি সূতিকাঘর হইতে বাহির হইলেন, তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া ঘরখানি পড়িয়া গেল। এই ঘটনাটী আমি একটি ভাল লোকের মুখে শুনিয়াছি। এই পুণ্যবতী ধাত্রীর অনেক পুণ্যকাহিনী অনেকের মুখে শুনা যায়। তিনি নিঃস্বার্থভাবে আমাদেরও খুব উপকার করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

সন্তান প্রসব হওয়ার পর হইতেই ভগবানের কৃপায় মনোরমা দিন

দিন সুস্থ হইতে লাগিলেন। অকিঞ্চন শ্রীধরচন্দ্র কোথা হইতে একটী চক্‌চকে সিকি সংগ্রহ করিয়া তাহা দিয়া নব কুমারটীকে দর্শন করিলেন। সেই একটি সিকির মূল্য আমাদের নিকট লক্ষ লক্ষ টাকা হইতেও অধিক মনে হইয়াছিল; তিনি যেভাবে এই কার্য্য করিলেন সে ভাবের তুলনা নাই।

নারায়ণগঞ্জ

এই সময়ে ঢাকায় বসন্তরোগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইল। এরূপ বসন্ত মহামারী ঢাকায় বহু বৎসরের মধ্যে হয় নাই। আমরা এই সময়ে ঢাকা ছাড়িয়া নারায়ণগঞ্জে গেলাম। কেবল বসন্তরোগের ভয়ে নহে, নারায়ণগঞ্জ বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান, সেখানে থাকিলে মনোরমার ও ছেলেদের শারীরিক উপকার হইবে ভাবিয়াই সেখানে গিয়াছিলাম। নারায়ণগঞ্জে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম কেহই ছিলেন না, ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী কয়েকজন উৎসাহী লোক ছিলেন। তন্মধ্যে তত্রস্থ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু নবকৃষ্ণ ভাদুড়ী, ডাক্তার গগনচন্দ্র রায়, বাবু হীরালাল ঘোষ ও ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত প্রভৃতিই প্রধান ছিলেন। যাহাতে আমরা নারায়ণগঞ্জে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারি, ইঁহারা সকলেই সেজন্য বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। আমরা মাসিক ৮ টাকা ভাড়ায় একটি বাড়ী লইলাম। ঐ বাড়ীতে তিনখানা ছোট ছোট খড়ের ঘর ছিল। অতি মনের সুখে আমরা সেখানে বাস করিতেছিলাম। বাড়ীর তিনদিকে মাঠ ছিল, ছেলেগুলি খুব ছুটাছুটি করিত। রেলওয়ে ষ্টেশন নিকটে ছিল, যতবার গাড়ী আসিত, ততবার ছেলেরা ছুটিয়া ছুটিয়া দেখিতে যাইত, আমরাও বাড়ীর বাহির হইয়া দেখিতাম। বাড়ীতে কয়েকটা বেগুন গাছ ছিল, তাহাতে ফল ধরিয়াছিল, সেগুলি দেখিতে ও তুলিতে আমাদের এত আনন্দ হইত যে বলিবার নহে। যতদূর মনে হয়, তাহাতে বলিতে পারি যে তখন

প্রাণে ক্লেশের লেশমাত্র ছিল না। মনোরমা মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, একটি সুকুমার কুমার প্রসব করিয়াছেন। ভয়ানক তরঙ্গ তুফানে পড়িয়া কষ্টে সৃষ্টে কূল পাইলে প্রাণে যেমন একটা আকাঙ্ক্ষাশূন্য প্রসন্নভাব উপস্থিত হয়, আমার প্রাণের ভাবও তখন সেইরূপ ছিল। মনোরমা কিছু কিছু গৃহকার্য্য আরম্ভ করিলেন। আমি বন্ধুবর্গের সহিত ধর্ম্মালাপ ও উপাসনাদি করিতাম, যতদূর সাধ্য গৃহকার্য্যেরও সাহায্য করিতাম। আমাদের বাসায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার পরে কীর্ত্তন, উপাসনা ও আলোচনা হইত। এই সময়ে পাড়ার মহিলারাও কেহ কেহ মনোরমার নিকট আসিতেন।

নারায়ণগঞ্জে যাওয়ার কিছুদিন পরে মনোরমা মাঝে মাঝে ধ্যানে বসিতে লাগিলেন। অসুস্থ থাকা গতিকে বহুদিন বসিতে পারেন নাই। নারায়ণগঞ্জে যখন বসিতেন, তখন আমি কাণে নাম বলিয়া বাহ্যজ্ঞান না জন্মাইলে ১০ ঘণ্টা হইতে ১৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সমাধিস্থা থাকিতেন। বরিশালে যেরূপ হট্টগোলে ও হুজুগে ছিলাম এবং ঢাকাতে যেরূপ ব্যতিব্যস্ত ছিলাম, নারায়ণগঞ্জে আসিয়া নানাকারণে তাহা অপেক্ষা অনেকটা স্থিরভাবে ছিলাম। তাহাতে মনোরমার অবস্থা দেখিয়া চিত্ত বড়ই আর্দ্র হইল এবং আমি কি করিয়া জীবন কাটাইতেছি ভাবিয়া আমার মন স্তম্ভিত হইল। এই সময়ে আমি একদিন ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে শ্রীগুরুদেবের নিকট গেলাম। আশ্রমের দক্ষিণ দিকে একটি আম্রবৃক্ষমূলে তিনি আসনে বসিয়া পাঠ করিতেছিলেন, নিকটে বেশী লোক ছিল না। আমি প্রণাম করিয়া কাছে বসিলাম, এবং মনোরমার অবস্থা তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি বলিলেন, "পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ভিন্ন এসকল অবস্থা লাভ হয় না।" আমি বলিলাম, "আপনারই কৃপা।" তিনি বলিলেন, "কৃপাও চাই, পাত্রও ঠিক হওয়া চাই। মনোরমা কেমন বাপের সন্তান, অমন লোক কলিতে দেখা যায় না।" মনোরমার ১৮ ঘণ্টা সমাধির কথা শুনিয়া গুরুদেব বলিলেন, "এ অবস্থা অতি চমৎকার,

কিন্তু এখনও ঈশ্বর-বিশ্বাস জন্মে নাই।" এ কথা শুনিয়া আমরা ভীত ও বিস্মিত হইলাম। যাঁহার ব্রহ্মনামে ১৮ ঘণ্টা ইচ্ছা-সমাধি হয়, একমাত্র নাম ভিন্ন যাঁহার নিকট সমস্ত জগৎ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত তাঁহার এখনও ঈশ্বর-বিশ্বাস হয় নাই এ কথার অর্থই বা কি এবং এরূপ হইলে আমরা আছিই বা কোথায়? তখন গুরুদেব আবার বলিতে লাগিলেন, "এখন যে অবস্থা ইহা নামানন্দের অবস্থা। ভগবানের নাম আনন্দময়, তাঁহার নামের আনন্দে নখ হইতে কেশাবধি আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, এ আনন্দের তুলনা নাই। এই আনন্দ-রস পান করিয়া আর অন্য সুখের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। নামানন্দ চুষিয়া চুষিয়া সাধক নিষ্পাপ হয়, তখন 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' আপনি প্রাণে ফুটিয়া উঠেন। তখন তাঁহার (সেই সাধকের) মুখ হইতে যাহা বাহির হয়, তাহাই শাস্ত্র, এবং তাঁহার প্রাণে যাহা ফুটিয়া উঠে, তাহাই ধর্ম্ম। শেখা ধর্ম্ম, মুখস্থ করা ধর্ম্ম, বিচারের ধর্ম্ম, ধর্ম্ম নহে। আমি যে মনোরমার ঈশ্বর-বিশ্বাসের কথা বলিতেছি তাহা এই রকম বিশ্বাস। লোকেরা যাহাকে 'বিশ্বাস' 'বিশ্বাস' বলে সে প্রকার সাংস্কারিক বা কাল্পনিক বিশ্বাসের কথা নহে। সাংস্কারিক বিশ্বাস, ভাবের বিশ্বাস অসত্য এবং অস্থায়ী। যাহা সত্য তাহা নিত্য। বীজ হইতে অঙ্কুর একবার বাহির হইলে, তাহা যেমন পুনরায় বীজে প্রবিষ্ট হয় না, সেইরূপ সত্য বিশ্বাস একবার জন্মিলে আর তাহা বিনষ্ট হয় না।" এই সকল কথা শুনিয়া প্রাণে আনন্দ, কৌতূহল ও আতঙ্ক লইয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে নারায়ণগঞ্জে ফিরিলাম। মনোরমার এমন একটি চমৎকার অবস্থা লাভ হইয়াছে, যাহা হইতে গভীর আধ্যাত্মিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, এই জন্য আনন্দ হইল। এ অবস্থার পরে কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহা দেখিবার জন্য কৌতূহল জন্মিল এবং আমার চঞ্চল ও অসংযত চিত্ত লইয়া আমি কেমনে ধর্ম্মলাভ করিব, এই চিন্তায় প্রাণে বড় আতঙ্ক উপস্থিত হইল। সেদিন গুরুদেব আরও

বলিয়াছিলেন, "যদি (মনোরমা) অবাধে বসিতে পারেন তবে ইঁহার জীবন দ্বারা লক্ষ লোকের উপকার হইবে।"

নারায়ণগঞ্জে আমার অপেক্ষায় ছেলেপিলেগুলি ষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছিল, আমি পৌঁছিলে তাহারা আমাকে ঘেরিয়া লইয়া চলিল, বাসার নিকট হইলে দুই একটি ছুটিয়া গিয়া শীঘ্র তাহাদের মাকে জানাইল যে বাবা আসিয়াছেন। তাহাদের মা ঘর হইতে বাহির হইয়া ঈষৎ হাসিমাখা মুখে একবার আমার দিকে চাহিলেন। দু'প্রহরের প্রবাসবাসের পরে আমি ঘরে ফিরিয়াছি, কিন্তু যদি কেহ দেখিত, ভাবিত বুঝি কত বৎসর পরেই আসিয়াছি। সেই পর্ণকুটিরে সেই বিষম দরিদ্রতার মধ্যে সংসার আমার সুখসন্তোষে পরিপূর্ণ ছিল। গুরুদেব যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার কিছুই মনোরমাকে বলিলাম না।

এই সময়ে মনোরমা প্রায় প্রতিদিনই ধ্যানে বসিতে লাগিলেন। সংসারের কার্য্যে বিশেষ ঠেকা পড়িলে দুই একদিন বসিতে পারিতেন না। একদিন শনিবার বেলা ১টার সময়ে মনোরমা ধ্যানে বসিলেন। শনিবারের দিবারাত্রি চলিয়া গেল, রবিবার সন্ধ্যা ৮টার সময়ে ধ্যান ভঙ্গ হইল। এই বত্রিশ ঘণ্টাকাল আমরা কয়েকজন পালা করিয়া নিয়ত তাঁহার নিকটে ছিলাম। নারায়ণগঞ্জের ব্রাহ্মবন্ধুগণ এবং দুই একটি মহিলাও ছিলেন। সেই বত্রিশ ঘণ্টা ধ্যানের আশ্চর্য্য অবস্থা দেখিয়া সকলেই একেবারে অবাক্ হইয়াছিলেন। এক মাসের কোলের সন্তান মনোরমার নিকটে দোলায় টাঙ্গান ছিল। মনে হইল সাক্ষাৎ ভগবান্ যেন শিশুকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। অতটুকু শিশুসন্তান, যে সর্ব্বদাই মায়ের কোলে থাকিত, সে বত্রিশ ঘণ্টা মায়ের কোল ছাড়া হইয়া একবারও কাঁদিল না। বালক কাঁদিলেই আমি বাধ্য হইয়া মনোরমার কাণে নাম বলিয়া ধ্যান ভঙ্গ করিতাম কিন্তু ভগবান্ ভক্তের সহায়, তিনি তাঁহার সাধকের প্রাণে সেদিন নূতন লীলা করিবেন বলিয়া যেন বালককে কাঁদিতে দিলেন না।

বালকের যখন অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে, তখন একপ্রকার অনতি-উচ্চ সামান্য শব্দ করিয়াছে, অমনি আমি কোলে করিয়া তাহার মায়ের কোলে দিয়াছি, কখন কখন অন্য কোন মহিলা বালককে মাতৃস্তন্য পান করাইয়াছেন। বালকটি আর কোন উদ্বেগই করে নাই। অন্যান্য দিন মায়ের কোল না পাইলে কতই না কাঁদিত, কিন্তু এই দুইদিন কেন সে এমন স্থির ও শান্ত রহিল কে জানে? আমাদের ১২ বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যরঞ্জন আমাকে বলিল "বাবা, আমি মায়ের ঘরের কাছে যাইয়া বড় বড় করিয়া কথা বলিতেছিলাম, কে যেন আমায় উপর হইতে বলিল, 'চুপকর, চুপকর,' আমি চারি দিক্ চাহিয়া কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলাম না, আমর বড় ভয় করিতেছে।" এই দিনকার ধ্যানে একটি বিশেষ ভাব লক্ষিত হইল। অন্যান্য দিন ধ্যানের সময়ে মুখশ্রী উজ্জ্বল হয়, অতিশয় দৃঢ় হয়, কোন বিশেষ সুখকর বস্তুকে শক্ত করিয়া ধরিয়া বসিলে যেমন অনুরাগ ও দৃঢ়তার চিহ্ন ললাটে ও কপোলে অঙ্কিত হয়, তেমনি হয়, শরীর ক্রমে প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্থির হয়, কিন্তু এবারে তদতিরিক্ত একটি নূতন ভাব হইল। ২৬ ঘণ্টা ধ্যানের পরে অবিরলধারে দুই চক্ষু হইতে দুইটি জলধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে ধারা কপোল বহিয়া বক্ষের ও ক্রোড়ের গাত্রবস্ত্র একেবারে ভিজাইয়া ফেলিল। পূর্ব্বে ধ্যানের সময়ে কখনও মনোরমার চক্ষে জল দেখা যায় নাই, কিন্তু এই দিনের চক্ষের জল সামান্য জল নহে, বৃষ্টি হইয়া গেলে চালার খড় বাহিয়া যেমন দর দর ধারা পড়ে, তেমনি ধারা। অবস্থা দেখিয়া আমার মনে হইল, আজ কিছু নূতন ঘটনা হইয়া থাকিবে। এই অশ্রুপাতের ৬ ঘণ্টা পরে মনোরমার বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল। অন্যান্য বারে ধ্যানের পরে তাঁহাকে যেরূপ দেখিতাম, এবারে তাহা অপেক্ষা কিছু বিভিন্ন দেখিলাম। সে বিভিন্নতা লিখিয়া জানান অসাধ্য। বত্রিশ ঘণ্টা পরে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া জোড়করে নমস্কার করিলেন এবং চক্ষু মেলিয়া আমাদের দিকে চাহিলেন। যে দুর্ব্বল শরীর লইয়া মনোরমা এক ঘণ্টা একভাবে

বসিতে পারিতেন না, আহার করিতে বসিলে যাঁহার পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরিয়া যাইত, তিনি ৩২ ঘণ্টা একাসনে থাকিয়া উঠিলেন, কিন্তু পা অবশও হয় নাই, ঝিঁঝিঁও লাগে নাই। এই ৩২ ঘণ্টার মধ্যে আহার কিংবা মলমূত্র পরিত্যাগ কিছুই হয় নাই। দুর্ব্বল শরীর, কেবল মৃত্যুশয্যা হইতে উঠিয়াছেন বলিলেই হয়, ঠিক সময়ে আহার না করিলে এ সময়ে কত কষ্টই হইত, কিন্তু এই ৩২ ঘণ্টা অন্ন না খাইয়া ক্ষুধা নাই, এবং শেষ চৈত্রের নিদাঘতাপে বত্রিশ ঘণ্টা জল পান না করিয়া পিপাসা নাই। শুনিয়াছি, চিকিৎসকগণ নাকি বলেন যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্রাব না হইলে অতিশয় যাতনা হয়, কিন্তু কোথায় সে যাতনা? এ ক্ষেত্রে বিধির বিধান বুঝি স্বতন্ত্র। মাঝখানে একটা দিন যে চলিয়া গিয়াছে, তাহা মনোরমার হিসাবই নাই। ইতিমধ্যে আমদের বাড়ীতে অতিথি আসিয়াছেন। বরিশাল-ব্রাহ্মসমাজের ভক্তি-ভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভাগিনেয় শ্রীমান্ সুখময় রায় আসিয়াছেন, মনোরমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কখন আসিয়াছেন?" আমি বলিলাম, "কবে আসিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলে না কেন?"

মনোরমা আমাদের খাওয়া দাওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, তুমি প্রায় দুইদিন খাও নাই, তুমি আগে খাও। মনোরমা বলিলেন, আমার ত মোটেই ক্ষুধা হয় নাই, তোমরা খাও, তবে আমি খাইব। আমরা আহার করিলে মনোরমা ২৷৩ খানা মাত্র সেঁকা রুটী খাইয়া কিছু জল পান করিলেন। রাত্রিতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এবারে যে তুমি বসিয়াছিলে, তাহাতে কি কিছু নূতন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে?" অনেকবার জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "হাঁ, কিছু ঘটিয়াছে।" আমি বলিলাম, "কি ঘটিয়াছে আমাকে বলিবে?" মনোরমা একটু হাসিলেন, কিছু বলিলেন না। সে হাসি দেখিয়া আমি বুঝিলাম, অবস্থার কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু সেদিন মনোরমা আমাকে কিছুই বলিলেন না। শ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন,

মনোরমাকে ভিতরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করা উচিত নহে। আমার মনে সেজন্য ভয় ছিল, কিন্তু গুরুর এ আদেশ আমি সম্পূর্ণ পালন করিতে পারি নাই। মনোরমাকে না জিজ্ঞাসা করিলে আমার প্রাণ আইঢাই করিত। নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থা অতি শোচনীয়, তাহাতে ঘরের মধ্যে এখন একটি আধ্যাত্মিক বিকাশ দেখিয়াও সেই বিষয় কিছু অনুসন্ধান না করিয়া কেমনেই বা নিরস্ত থাকি? রবিবার রাত্রি গেল, সোমবার দিবারাত্রি গেল, মঙ্গলবারের দিবা গেল, রাত্রিতে আমি বসিয়া ভাবিতেছিলাম আর চক্ষের জল ফেলিয়া কাঁদিতেছিলাম। মনোরমা বলিলেন, "ও কি করিতেছ?" আমি বলিলাম, "আমার নিজের অবস্থা এমন শোচনীয় যে বাহ্য জগতের অতিরিক্ত আমি কিছুই দেখি না, যদিও তোমার অবস্থা অন্যরূপ, কিন্তু তোমার মনের ভাবও অন্তর্জগতের ন্যায় আমার নিকট অবরুদ্ধ হইতে চলিল।" আমার কথা শুনিয়া ও অবস্থা দেখিয়া মনোরমা বিশেষ দুঃখিত ও কিছু অপ্রতিভ হইলেন, বলিলেন, "কি বলিব? অন্যান্যবার বসিলে যেমন নাম ভিন্ন অন্য কিছুই থাকে না, অতিশয় আনন্দে প্রাণ ভরিয়া যায়, দেহের অস্তিত্ব জ্ঞান থাকে না, এবারেও সেইরূপ সমস্ত, তবে কিছুক্ষণ পরে বোধ হইল যেন ঈশ্বর আমাকে বুকে করিয়া আছেন।" এই বলিয়াই মনোরমা নীরব হইলেন। আনন্দে ও আশায় আমার বুক কাঁপিতে লাগিল এবং গুরুদেব যে বলিয়াছিলেন "ইহার পরে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আপনি ফুটিবে" সেই কথা মনে হইয়া বিশ্বাসের আলো হঠাৎ আমার প্রাণে খেলিয়া উঠিল।

উপরোক্ত ঘটনার দুই চারিদিন পরে নারায়ণগঞ্জে আমাদের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ নিত্যরঞ্জনের ওলাউঠা হয়। সেই ভয়ানক রোগের হস্ত হইতে অব্যাহতির কোন আশা ছিল না। এই সময়ে নারায়ণগঞ্জের হিন্দু ও ব্রাহ্ম সকলেই যেরূপ উপকার করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া জানাইবার সাধ্য নাই। আশ্চর্য্য এই যে, আমি তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক ছিলাম এবং হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের একরূপ বিদ্রোহী ছিলাম

বলিলেই হয়, কিন্তু আমাদের এই বিপদে নারায়ণগঞ্জের হিন্দুগণ ব্রাহ্মগণ অপেক্ষা কোনরূপ কম সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই। সেখানকার হিন্দু সমাজের বক্তা একটি যুবক নিয়ত রোগী বালকের শিয়রে থাকিয়া শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। ঢাকা হইতে সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আমার পরম বন্ধু বাবু আলোকচন্দ্র দাস নারায়ণগঞ্জ গিয়া এবং সেখানে থাকিয়া তথাকার ডাক্তারগণের সঙ্গে মিলিয়া চিকিৎসা করেন। ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক বাবু চণ্ডীচরণ কুশারী, সম্পাদক বাবু রজনীকান্ত ঘোষ ও অন্যান্য কেহ কেহ নারায়ণগঞ্জ গিয়াছিলেন। রোগীর খুব খারাপ অবস্থা হইয়াছিল, এমন কি জীবনের আশা ছিল না। মনোরমা এই ব্যারামের মধ্যে একবারও অধীরা বা চঞ্চল হন নাই, তবে মায়ের অতুল স্নেহ ঢালিয়া দিয়া দিবারাত্রি শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। একদিকে শিশুসন্তানগণের সংরক্ষণ অন্যদিকে রোগী সন্তানের তত্ত্বাবধান, এই দুই করিতে তাঁহাকে রাতদিন কেবল এঘর ওঘর করিতে হইয়াছে। আমি কখনও কখনও ভাবী শোকে অধীর হইয়া অতর্কিতে চক্ষের জল ফেলিয়াছি, মনোরমা মা হইয়াও সেরূপ করেন নাই, কিন্তু কর্ত্তব্য ষোল আনা করিয়াছেন। ভগবানের কৃপায় বালকটির ক্রমে ভালর দিকে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল এবং কিছুদিনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বালক আরোগ্য লাভ করিল। সমস্ত পরিবারের উপর যে একটা চিন্তার ছায়া পড়িয়াছিল, তাহা কাটিয়া যাওয়ায় আবার পূর্ব্বের ন্যায় হাসিখুসি সুখ সন্তোষ আরম্ভ হইল। এই ঘটনার কিছুদিন পরে বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার গুহ (চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেকটার) আমাকে চট্টগ্রাম যাওয়ার জন্য টেলিগ্রাম করিলেন। আমি পরিবারবর্গকে পুনরায় ঢাকায় রাখিয়া চট্টগ্রাম যাত্রা করিলাম।

চট্টগ্রাম

আলিয়ারগঞ্জ হইতে চারিদিনে গরুর গাড়ীতে আমাকে চট্টগ্রাম যাইতে হইয়াছিল। সেখানে আমি এক মাসের অধিককাল ছিলাম। তখন চট্টগ্রামে সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের কোন প্রভাব ছিল না এবং উক্ত সমাজের কোন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন না, এক মাসের চেষ্টায় শ্রীমান্ হরিশ্চন্দ্র দত্ত ও ষোড়শীমোহন নামক দুইটী ভদ্র পরিবারের যুবককে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিলাম। ইহাই বোধ হয় চট্টগ্রামে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রথম দীক্ষানুষ্ঠান। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীমান্ হরিশ্চন্দ্রই চট্টগ্রাম সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও আচার্য্য। এখানে আমার চট্টগ্রামের ধর্ম্মপ্রচারের কথা লিখিব না, কেননা সে কথা অতি বিস্তৃত এবং সে সকলের সহিত মনোরমার বিশেষ সম্বন্ধ কিছু নাই। তবে তিনি সবে মৃত্যুশয্যা হইতে উঠিয়াছেন, সন্তানগণ রুগ্‌ণ, তাঁহাকে সাহায্য করিবার কেহ নাই, এরূপ অবস্থায় তিনি যেরূপ প্রসন্নমনে আমাকে আমার কর্ত্তব্য কার্য্যে উৎসাহিত করিয়া চট্টগ্রামে পাঠাইয়াছিলেন তাহা আমি কখনও ভুলিব না।

অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমে চট্টগ্রামে আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম, এমন কি কয়েক দিনের জন্য আমাকে হাসপাতালে থাকিতে হইয়াছিল। হাসপাতালের ডাক্তার শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বসু মহাশয় আমার বিশেষ আত্মীয়, তিনিই যত্ন করিয়া আমাকে তাঁহার ঘরে রাখিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী যুবকদিগের মধ্যে অনেকেই আমার সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে শ্রীমান্ ব্রহ্মমোহন ঘোষ একজন প্রধান।

চট্টগ্রাম হইতে মারহাট্টা নামক উৎকৃষ্ট ষ্টিমারে কলিকাতা রওনা হইলাম। ৩৬ ঘণ্টায় উহা কলিকাতা পৌঁছিবে এরূপ কথা ছিল কিন্তু কোন কারণে উহা সমুদ্রমধ্যে প্রায় ২৪ ঘণ্টা নঙ্গর করিয়া রহিল। আমি আহারান্তে জাহাজে উঠিয়াছিলাম এবং দুইবেলা খাওয়ার উপযুক্ত লুচি ও মিষ্ট সামগ্রী সঙ্গে লইয়াছিলাম, দ্বিতীয় দিনে তাহা ফুরাইয়া গেল, তৃতীয় দিনে প্রায় সমস্ত দিনই অনাহারে ছিলাম। জাহাজে

অনেক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত যাত্রী ছিলেন, তাঁহারা মনের সুখে খানা খাইলেন। কেবল কয়েকজন মাড়োয়ারী এবং আমি অনাহারে রহিলাম। আমার অনাহারে থাকার কারণ এই যে, সমস্ত খাদ্যবস্তুই মাংস ও ডিমের সংস্রবে আসিয়াছিল, সুতরাং সে সমস্তই আমার অখাদ্য, কেননা মাংস ও ডিমের সংস্পৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করা আমার সাধনপথের বিরুদ্ধাচার।

অতিকষ্টে তৃতীয় দিবস রাত্রি প্রায় ১০টার সময়ে আমাদের জাহাজ মেটেবুরুজ পৌঁছাইল। সেখান হইতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে যে বাড়ীতে আমি উঠিব, দেখিলাম বাহির হইতে সে বাড়ীর দরজায় তালা বন্ধ আছে। দুর্ভিক্ষের লোকের মতন অন্য এক বাড়ীতে উঠিয়া "শীঘ্র ভাত" বলিয়া একেবারে একটি বন্ধুর একখানা প্রস্তুত আসনে বসিয়া পড়িলাম; ইহার পরের দিন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুরোধে তালতলা 'হরিসেনা' সম্প্রদায়ের উৎসবসভায় যোগদান করিলাম। শাস্ত্রী মহাশয় সেই বিপুল জনতার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া আমার উপর বক্তৃতার ভার অর্পণ করিয়া চলিয়া গেলেন। উৎসাহে মাতিয়া আমি দুই ঘণ্টার অধিককাল সেই সভায় বক্তৃতা করিলাম, পরে সকলের সঙ্গে হাঁটিয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে শঙ্কর ঘোষের লেনে 'ন্যাশন্যাল মিত্রের' বাড়ীতে আসিলাম, ৺নবগোপাল মিত্রকে লোকেরা 'ন্যাশন্যাল মিত্র' বলিত।

দীর্ঘকালের অনিয়ম ও কঠোর পরিশ্রমে আমার স্বভাব-সুস্থ শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর গত দেড় মাসের অত্যধিক পরিশ্রমের ফল ফলিতে কালবিলম্ব হইল না।

'হরিসেনা' দলে বক্তৃতার পরের দিন উপরোক্ত বাড়ীতে আমার আত্মীয় ও গুরুভাই শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মজুমদার মহাশয়ের ঘরে আহার করিতে বসিয়া আসনের উপরই ঢলিয়া পড়িলাম, তিনদিন পরে আমার চেতনার সঞ্চার হইয়াছিল।

এই বাড়ী হইতে পাল্কী করিয়া ৯১।১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে আমার পরম বন্ধু ৺শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে আমাকে লইয়া যাওয়া

হইয়াছিল, সেখানে আমার মাথা মুড়াইয়া প্রতিদিন প্রায় পঁচিশ সের করিয়া বরফ দেওয়া হইয়াছে, তিনদিন পর্য্যন্ত এ সকল ব্যাপারের কিছুই আমি জানি না। বন্ধুবর ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস ও প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়দ্বয় চিকিৎসা করিতেছিলেন। তিনদিন পরে আমার হুঁস হইল, অনুভব করিলাম যে আমার মাথায় কোনও একটা ঠাণ্ডা জিনিস দেওয়া হইয়াছে। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় এই সময়ে বাতের পীড়ায় পীড়িত ছিলেন। আমি যে গলিতে ছিলাম সে গলিতে গাড়ী কিম্বা পাল্কী প্রবেশ করিতে পারে না। নীলরতন বাবুও হাঁটিতে পারেন না, তথাপি লাঠিভর করিয়া তিনি আমাকে দেখিতে আসিলেন। প্রাণকৃষ্ণবাবু ও সুন্দরী বাবুই রীতিমত চিকিৎসা করিলেন এবং তাঁহাদের সুচিকিৎসার ফলে শীঘ্রই আমি আরোগ্য লাভ করিলাম।

তাঁহাদের সঙ্গে আমার যেরূপ ঘনিষ্ট বান্ধবতা ছিল এবং এখনও আছে তাহাতে এই উপলক্ষে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া একটা বেজায় অসভ্যতার কার্য্য হইবে। প্রিয়বর শ্রীচরণ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্নেহাস্পদা শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী যেরূপভাবে এই রোগশয্যায় আমার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের মত আত্মীয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই হইয়াছে। যদি সেই সকল কার্য্যের জন্য আজি এই সুযোগে আমি তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি তবে আমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট অত্যন্ত তফাৎ হইয়া পড়িব। আহা! আমার সেই ধর্ম্ম-পরায়ণ সরল-চিত্ত প্রিয় সুহৃদ্ শ্রীচরণ বহুকাল হইল আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অভাবে এই সংসারে আমি একজন পরম আত্মীয় হারাইয়াছি।

চট্টগ্রামে এবং কলিকাতায় আমি পীড়িত হইয়াছিলাম, সে সকল সংবাদ মনোরমাকে দেওয়া হয় নাই, সংবাদ জানিলে তিনি কলিকাতায় ছুটিয়া আসিবেন, তাঁহার ভগ্নশরীর পথের ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবে কি না এই ভয় করিয়া শ্রীচরণ প্রভৃতি তাঁহাকে আমার পীড়ার সংবাদ

দেন নাই, আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলে তাঁহাকে জানান হইল এবং অল্পদিনের মধ্যেই আমি ঢাকায় রওয়ানা হইলাম।

শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত আমরা ঢাকায় ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে যে সকল বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা সংক্ষেপে লিখিব।

চিরকুমার শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ কুশারী মহাশয় বিবাহিত ও অবিবাহিত জীবনের সুখ দুঃখ ও ফলাফল সম্বন্ধে একদিন কথা বলিতেছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে, "মনোরমার মতন স্ত্রী পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে আমিও বিবাহ করিতাম। সেদিন দেখিলাম তিনি অনেক বেলায় আহার করিতে বসিয়াছেন, কয়েক গ্রাস মুখে দিয়াছেন মাত্র, এমন সময়ে এক দুঃখিনী আসিয়া উপস্থিত, তৎক্ষণাৎ থালাশুদ্ধ সমস্ত ভাত ডাল তরকারী তাহাকে দিয়া দিলেন।"

প্রচারক-নিবাসের সংলগ্ন পূর্ব্বদিকের বৃহৎ বাড়ীতে নর্ম্মাল স্কুল ছিল। সেই স্কুল-বাড়ীর নীচের একটা ঘরে এক পাগলী থাকিত, সে ভিক্ষা করিয়া খাইত এবং আপন মনে কত কি কথা বলিত, কখন কখন গানও করিত। একদিন দেখিলাম, আশ্রমের আঙ্গিনায় মনোরমা তাহার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা কহিতেছেন এবং অতি মনোযোগপূর্ব্বক তাহার কথা শুনিতেছেন। জানা গেল যে, ঢাকা সহরের উপর তাহার ছোটখাট একটী বাড়ী ছিল, একদিন সে কোন কার্য্য উপলক্ষে ঢাকা সহরের অনতিদূরে কোন গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিল, তিন চারি ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, তাহার ঘরবাড়ী সমস্ত চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং তাহার মা, পতি, পুত্রকন্যা, সকলেই মরিয়া রহিয়াছে! যে বিষম দেবরোষ টর্ণেডোরূপে প্রকাশ পাইয়া ঢাকা সহরের নবাব প্রভৃতি ধনীদিগের সৌধমালা এক পলকে ধূলিসাৎ করিয়াছিল, সেই ভীষণ অগ্নিবাত্যা এই দুঃখিনীর ক্ষুদ্র কুটীরকেও উপেক্ষা করে নাই। এই খণ্ড-প্রলয়ে যে শত শত মনুষ্য ও জীবজন্তুর জীবন বিনষ্ট হইয়াছিল তাহাতে এই দুঃখিনীরও সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কুটুম্ব-বাড়ী বেড়াইতে যাইয়া তিন ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল

তাহার কেহই নাই। এই নিদারুণ আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া সে পাগল হইয়া গিয়াছে। পরিজনগণের স্মৃতি যখন মনে উদিত হয়, তখন সে কাঁদিয়া খুন হয়। যখন সে স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন নাচে, গায়, ভিক্ষা করে, রান্না করে, খায় দায়। সমস্ত কথাগুলি শুনিয়া মনে হইল এমন লোক যতক্ষণ পাগল থাকে ততক্ষণই তাহার সুখ। পূর্ব্বস্মৃতিগুলি যখন মনে উদিত হয়, তখনও সে সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারে না, মনে হয় যেন একটা অর্দ্ধবিস্মৃত স্বপ্নের ঘটনা আবছায়ার মত তাহার প্রাণে জাগিতেছে এবং সে অনেক কষ্টে সেগুলিকে মনের মধ্যে টানিয়া আনিতেছে। দুই চারি কথা শৃঙ্খলা করিয়া বলিতে না বলিতে সম্পর্কশূন্য অন্য কথা বলিয়া ফেলে। একটা কথা মাঝে মাঝেই বলিত "আহা, সব রে'খে বেড়াতে গেলাম, ফিরে এসে দেখ্‌লাম কেউ নাই।" মাঝে মাঝে সে ধর্ম্মকথাও বলিত, সংসারটা যে অত্যন্ত অসার, একটা ধোঁকার কাটি, সেটা বোধ হয় সে বুঝিয়াছিল।

মনোরমা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাহার কথা শুনিতেন, তাহাকে নানা প্রশ্ন করিতেন, ভিক্ষা দিতেন এবং কখন কখন খাওয়াইতেন। পাগলী মনোরমাকে বড় ভালবাসিত। এতকাল পরে সে যেন তাহার একজন 'দরদী' পাইয়াছিল, তাঁহার নিকট হইতে সে সহজে উঠিত না।

ঢাকাতে একটা কাক আমাদিগকে বড়ই উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। আশ্রমে একটী মাত্র পায়খানা, উহার ছাদ নাই, একটা আমগাছ পেছন হইতে পায়খানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে কাক বাসা করিয়া ডিম পাড়িয়াছে। ডিম ফুটিবার পূর্ব্বে পক্ষিমাতা কোন উদ্বেগই করে নাই কিন্তু ডিম ফুটিবার পরেই অত্যাচার আরম্ভ করিল, যে কেহ পায়খানায় যাইত তাহারই মাথায় ঠোকর মারিয়া রক্ত বাহির করিয়া গালে আঁচড় দিত। স্নেহময়ী পক্ষিজননী মনে করিত, কেহ বুঝি তাহার বুকচেরা ধন চুরি করার জন্য আসিয়াছে। আমাদের দুই

তিনটি ছেলেকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে, ছাতি মাথায় দিয়া লাঠি হাতে করিয়া আমরা পায়খানায় যাইতাম কিন্তু ইহাতেও বালকবালিকাগণ নিরাপদ্ হইতে পারে নাই। একটু অসাবধান হইলেই কাকমাতা তাহাদের গালে কপালে চঞ্চু বসাইয়া দিত, তাহারা চিৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের নিকট ছুটিয়া আসিত। আমরা ভাবিলাম যে, যতদিন শাবকগুলি উড়িতে না শিখিবে ততদিনই আমাদিগকে এই ক্লেশ পাইতে হইবে, ইহা হইতে রক্ষা পাওয়ার অন্য উপায় নাই। একদিন আমাদের একটি ছেলের মাথায় এমনই ঠোকর মারিল যে তাহার মাথায় গভীর গর্ত্ত হইল এবং তাহা হইতে অবিশ্রান্ত রক্তধারা ছুটিতে লাগিল। বস্তুতঃ ক্ষুদ্রবল এই কাকপক্ষীর অত্যাচারে আমাদের শান্তির সংসারে একটা বিশেষ অশান্তি উৎপন্ন হইল। উহার বাসা ভাঙ্গিয়া উহাকে তাড়াইয়া দেওয়া অতি সহজ কিন্তু সেরূপ সংকল্প আমাদের মনে আসে নাই, কেননা শাবকগুলি কোথায় যাইবে? একদিন অনন্যোপায় হইয়া আমরা মনে করিলাম যে, এই উৎপাতের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হউক, সেই সর্ব্বদর্শী দেখিতেছেন যে আমরা সত্য সত্যই কিরূপ অসুবিধায় পড়িয়াছি। আমরা স্বামী-স্ত্রী প্রার্থনা করিলাম, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহার পর হইতে পক্ষিমাতা আমাদের উপর আর কোন অত্যাচারই করিল না। আমরা ছাতা ও লাঠির সাহায্য গ্রহণ না করিয়া উহার বাসার নীচে গমনাগমন করিতে লাগিলাম, সে একব্যার এদিকে একবার সেদিকে মাথাটী নাড়িয়া চক্ষুটাকে একবার বাম গোলকে একবার ডান গোলকে ঘুরাইয়া বুদ্ধিমানের মতন সাব্যস্ত করিল যে, সে আর আমাদিগকে বিরক্ত করিবে না। ইহারই ৩।৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে সে আমাদের ছেলেটিকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে কিন্তু এই সময় হইতে আর কখন কোন ক্রুদ্ধভাব দেখায় নাই। ইহা কি ঈশ্বরকৃপা, না উইলফোর্স? আমরা ত ঈশ্বরকৃপা বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছি। কোন সাংসারিক বিষয়ের জন্য মনোরমা ভগবানের

নিকট প্রার্থনা করিতেন না। আজ আমার বিশেষ অনুরোধে করিলেন এবং প্রার্থনাও পূর্ণ হইল। ইহার পরে আর কখনও তিনি এইরূপ প্রার্থনা করেন নাই। একবার অত্যন্ত সাংসারিক ক্লেশে বিচলিত হইয়া আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, আমরা ত ধনদৌলত চাহি না, যাহাতে আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া সাধন ভজন করিতে পারি তুমি যদি ভগবানের নিকট এই জন্য প্রার্থনা কর তবে আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই সে প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।

আমার কথার উত্তরে মনোরমা বলিলেন, "এখন আমার কোন প্রার্থনাই আইসে না, ভগবান্ সকলই দেখিতেছেন, তাঁহাকে কি জানাইব? যাহা করিতে হয় তিনিই করিবেন, তিনি কি প্রার্থনার অপেক্ষা রাখেন?" এইরূপ কথা আমরা অনেকেই মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছি কিন্তু যখন সন্তানগণ অন্নবস্ত্রের অভাবে ক্লেশ পায়, তখন স্নেহময়ী জননীর এইরূপ নির্ভর, আর আমাদের মুখস্থ করা কথার মধ্যে অনেক প্রভেদ। আমি নিজে কতশত উচ্চ দরের কথা জানি, কিন্তু বিপদের সময়ে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি কৈ?

'মুখস্থ করা কথা' বলিতে যাইয়া একটি অশীতিপর বৃদ্ধার কথা মনে পড়িল, তিনি আমাদের স্নেহভাজন শ্রীমান্ রেবতীমোহনের বৃদ্ধা জননী। পুত্রের কাঁধে চড়িয়া ৺জগন্নাথ দর্শন করিয়া মাতা কলিকাতা আসিয়া একটী পৌত্রীর সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাইলেন এবং তাহাকে দেখিবার জন্য দেশে (বিক্রমপুরে) যাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পুত্র মাতাকে বুঝাইলেন, "মা, এখন আর তোমার সংসার লইয়া ব্যস্ত থাকা উচিত নয়, যাহা ঘটে ঘটুক, তুমি এখানে থাকিয়া প্রতিদিন গঙ্গাস্নান কর, সংসারে যে কেহ কাহারও নয়, তাহা ত বুঝিয়াছ"। তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী জননী আপনার উজ্জ্বল চক্ষুর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া স্থিরভাবে বলিলেন, "এগুলি তোদের মুখস্থ করা কথা।" পুত্র নির্ব্বাক্ হইলেন। বস্তুতঃ বর্ত্তমান যুগে আমরা কতকগুলি উচ্চতত্ত্বকথা মুখস্থ করিয়াছি, সেগুলি যে

আমাদের জীবন হইতে অনেক দূরের বস্তু, তাহা না বুঝিতে পারিয়া পরকে বুঝাইবার বেলায় সেইগুলির আবৃত্তি করি কিন্তু বিপদের সময়ে উহা আমাদিগকে আশ্রয় দিতে পারে না। ধর্ম্মমতকে ধর্ম্মবিশ্বাস বলিয়া ধরিয়া লওয়ায় পরিণামে এই ভুল গুপ্তভাবে নাস্তিকতার সৃষ্টি করে। এই আত্মপ্রবঞ্চনা ক্রমে ক্রমে এমনই অভ্যস্ত হইয়া যায় যে একটা বিষম আঘাত না পাইলে উহা ধরা পড়ে না। মুখে মুখে রঘুবংশ কুমারসম্ভব পড়িয়া, পরীক্ষা দেওয়ার সময়ে অক্ষর চিনিতে পারে না, তখন নাকের জলে চক্ষের জলে একাকার হইয়া উঠে। উচ্চতত্ত্ব মুখস্থ করিয়া রাখার এই বিষম দোষ।

অশিক্ষিতা (অর্থাৎ নূতন ধরণে যাঁহারা শিক্ষিতা নহেন) স্ত্রীলোকদিগের 'মুখস্থ করা' তত্ত্বজ্ঞান নাই, সাধনফলে তাঁহাদের হৃদয়ে যাহা ফুটিয়া উঠে তাহা সত্য ও নিত্য, আর যাহা হৃদয়ে ফুটে নাই, তাহা লইয়া তাঁহারা গোমর করেন না, তাই বৃদ্ধা-জননী সুশিক্ষিত ধার্ম্মিক পুত্রকে অনায়াসে বলিয়াছিলেন যে "এগুলি তোদের মুখস্থ করা কথা"। মনোরমার মুখস্থ করা কোন সম্পত্তি ছিল না, যে সকল তত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ে ফুটিয়াছিল সেগুলির খবর তিনি আগে জানিতেন না।

চিত্তরঞ্জন

কিছুদিন হইতে আমাদের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জনের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য ভাবের বিকাশ হইল, তখন তাহার বয়স সাত বৎসর মাত্র। আমরা যেদিন বরিশাল হইতে নৌকাযোগে ঢাকা রওয়ানা হইলাম, সেই দিন কি তাহার পরের দিন হইতে বালক বলিতে লাগিল যে, পরমেশ্বর তাহার সহিত কথা বলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম "কি রকম কথা বলেন?" সে উত্তর করিল যে "তোমরা কেউ শুনিতে পাও না, আমি পষ্ট শুনি, আমার পেটের ভিতর থে'কে কথা বলেন।"

'হৃদয়' প্রভৃতি শব্দ সে জানিত না, তাহার কথার অর্থ এই যে, বাহির হইতে নহে অন্তর হইতে সে কথা শুনিতেছে। কিছুকাল আমরা তাহাকে লইয়া অনেক কৌতুক করিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই অপ্রতিভ হইল না বরং অধিকতর দৃঢ়তার সহিত নিজের কথা সমর্থন করিল।

সেদিন প্রবল প্রতিকূল বাতাসে আমাদের নৌকা অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না, মাঝিরা প্রাণপণ করিয়াও দুই ঘণ্টায় এক মাইল যাইতে পারিতেছে না। বেলা প্রায় ১১টা, তখন চিত্তরঞ্জনকে বলা হইল যে পরমেশ্বর যদি তোমার সঙ্গে কথা বলেন তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর যে কখন বাতাস ফিরিবে? বলামাত্র বালক চক্ষু বুজিয়া বসিয়া বিড়বিড় করিয়া অস্পষ্ট ভাষায় পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল এবং কিছুক্ষণ পরে বলিল যে "পরমেশ্বর বলিলেন ৩টার পরে বাতাস ফিরিবে।" তিনটা চারিটা কাহাকে বলে সে তাহা ভাল করিয়া বুঝিত না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বিকাল বেলায় সত্য সত্যই আমাদের প্রতিকূল বাতাস অনুকূল বহিতে লাগিল। আমরা এই ঘটনাটাকে দৈবাৎ (coincidenco) বলিয়া ধরিয়া লইলাম।

মনোরমার পীড়ার মধ্যে একদিন অত্যুগ্র জ্বর হইয়া পড়িল, এমন কি আমাদের সকলের মনেই এই আশঙ্কা জন্মিল যে আজ আর রক্ষা নাই। অন্যান্য সন্তানগুলি সকলেই মায়ের শয্যাপাশে উপস্থিত, কেবল চিত্তরঞ্জনকে দেখা গেল না। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখা গেল একটা কোণে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে, আর চক্ষু বুজিয়া বিড়বিড় করিয়া কি কথা বলিতেছে, কিছুক্ষণ পরে সে মুখ ফিরাইয়া আমাকে দেখিতে পাইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সে এখানে একাকী এরূপভাবে দাঁড়াইয়া কি কারতেছিল? বালক বলিল, "মায়ের জ্বর ছাড়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেছিলাম।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি উত্তর পাইলে?" তখন বালক বলিল, "পরমেশ্বর বলিলেন, ভয় নাই, ৭টার সময়ে জ্বর ছাড়িয়া যাইবে।" সত্যসত্যই ৭টার কিছু পূর্ব্বে জ্বর ছাড়িয়া গেল।

চিকিৎসক কিংবা আমরা কেহই এত শীঘ্র যে এই প্রবল জ্বর ছাড়িবে সেরূপ প্রত্যাশা করি নাই। এইরূপ মাঝে মাঝেই সে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিত এবং তাঁহার কথা শুনিতে পায় বলিয়া প্রকাশ করিত, তাহার সকল কথাই মিলিয়া যাইত। তবে আমরা এ পর্য্যন্ত এই সকল কথার উপর বিশেষ নির্ভর করি নাই কিন্তু একদিনের একটা ঘটনা আমাদিগকে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে সে ঘটনা লিখিত হইবে।

ইহার মধ্যে একদিন আমরা সন্তানগণ সহ গেণ্ডারিয়ার আশ্রমে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে দেখিতে গেলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আমরা অদূরে বসিলাম এবং কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জনের ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে বলিলাম। মনোরমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই বালক দীক্ষা পাইতে পারে কি না? শ্রীশ্রীগুরুদেব বালককে বলিলেন "তুমি ঐ আমতলায় যাইয়া বসিয়া তোমার পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা কর যে তুমি তাঁহার কি নাম সাধন করিবে?" এই আমগাছতলায় ঠাকুরের আসন ছিল, তিনি প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া এইখানে বসিতেন, এই বৃক্ষ হইতে অনেক সময়ে অবিশ্রান্ত মধুক্ষরণ হইত। ঠাকুরের আদেশ পাওয়া মাত্র চিত্তরঞ্জন সেই আমতলায় ছুটিয়া গেল এবং সেখানে বসিয়া চক্ষু বুজিয়া অস্পষ্ট ভাষায় কি বলিল। পরে ছুটিয়া আসিয়া গুরুদেবকে বলিল যে, পরমেশ্বর তাহাকে একটি নাম বলিয়া দিলেন, সে নামটি বালক আমাদের অগোচরে ঠাকুরকে বলিল। তিনি বলিলেন "তুমি এক্ষণে এই নামই জপ করিবে এবং পিতামাতার বাধ্য হইয়া চলিবে।" গোঁসাইজী আমাদিগকে বলিলেন যে, ইহার এই শক্তির এখন বেশী বিকাশ হইবে না, লেখাপড়া ও বিষয়কার্য্যের গোলযোগে ইহা চাপা থাকিবে, তাহার পরে আবার ইহার প্রকাশ হইবে, তখন স্থায়ীভাব আসিবে।

এই ঘটনার পরেই শ্রীশ্রীগুরুদেবের ইঙ্গিতে আমি ধর্ম্ম-প্রচারকের কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম। তিনি আমাদিগকে একটি ব্রত প্রদান করিলেন

১। অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিবে না।

২। কাহারও নিকট কিছু (অর্থ বা খাদ্য পরিধেয় ইত্যাদি) চাহিবে না।

৩। কাহারও নিকট আপনাদের কোনও প্রকার অভাব জানাইবে না।

৪। ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ কিছু প্রদান করিলে তাহা লইবে, অভিমানে প্রত্যাখ্যান করিবে না।

৫। -ভাগলপুর, গয়া, হাজারীবাগ, গিরিডি, পচম্বা ও বৈদ্যনাথ এই সকলের মধ্যে যে কোন স্থানে বাস করিবে।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে বলিতে গেলে আজিই প্রথম আদেশ পাইলাম, পূর্ব্বে কখনও "ইহা করিবে" এইরূপ আদেশ করেন নাই, সেরূপ করা তাঁহার রীতি ছিল না। শিষ্যদিগের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে তিনি সর্ব্বদাই ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি ভিন্ন সেরূপ স্বাধীনতা আর কে দিতে পারিবে? কয়েকটি ঘটনা মনে হইতেছে।

একবার আমি প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে, সারাদিন আমি কি কি কার্য্য করিব, কিরূপভাবে জীবন কাটাইব আমাকে তাহার একটা রুটিন্ করিয়া দিন। তিনি একখানা কাগজে ২৪ ঘণ্টার কর্ত্তব্য লিখিলেন এবং নিম্নে লিখিয়া দিলেন যে "এইরূপভাবে চলিলে জীবন গঠিত হইবে," "এইরূপভাবে চলিবে" এমন কথা লিখিলেন না, হুকুমকরা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ কার্য্য ছিল।

একদিন সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে উপরের ঘরে তিনি পাঠ করিতেছিলেন, আমরা কয়েকজন কাছে ছিলাম। নীচের ঘরে শিষ্যগণ আনন্দ-কোলাহল করিতেছিলেন। আমাদের পাঠশ্রবণের ব্যাঘাত হওয়াতে গুরুদেব বলিলেন "এত গোলমাল কিসের?" স্বামী দেবপ্রসাদ নিকটে বসিয়াছিলেন, তিনি ছুটিয়া নীচে গেলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "গোলমাল করিতে বারণ করিয়া আসিলাম," একথা শুনিয়া গুরুদেব বলিলেন "আমি ত বারণ করিতে বলি নাই"।

ভাড়ার বাড়ীতে লোহা পুঁতিতে লোকদের কিছুমাত্র দরদ লাগে না, ঝুর ঝুর করিয়া আস্তর খসিয়া পড়িতেছে, সমস্ত দেওয়াল ফুটো হইয়া যাইতেছে সেদিকে কাহারও খেয়াল নাই। সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাড়ীতে একদিন কেহ কেহ 'বেদরদী' হইয়া দেয়ালে লোহা পুঁতিতেছিলেন, গোঁসাইজী তাঁহাদিগকে কিছু বলিলেন না কিন্তু কথা প্রসঙ্গে একদিন জানাইলেম যে "পরের বাড়ীতে লোকেরা যখন দরদ শূন্য হইয়া লোহা পোঁতে, তখন তাহাদের প্রত্যেক আঘাত আমার বুকে লাগে"। বলা বাহুল্য যে সেইদিন হইতে সকলের সুশিক্ষা হইল।

এইরূপ ঘটনা কত বলিব? তিনি কখনও কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। কৃপা করিয়া আজ আমাদিগকে তিনি যে বিশেষ ব্রতে ব্রতী করিলেন, মনোরমাই এই কৃপার অধিকারিণী। ঠাকুর একস্থানে (মৌনাবস্থায়) স্বহস্তে লিখিয়াছেন "মনোরঞ্জনের এখনও নির্ভরের ভাব আসে নাই, কিন্তু মনোরমার নির্ভরের অবস্থা"। 'হরিবোল' বলিয়া একটা তালগাছের উপর হইতে হাত পা ছাড়িয়া দেওয়া যেমন অসমসাহসিকের কার্য্য, তখন ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারকের পদ পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে সেইরূপ সাহসের কার্য্য হইয়াছিল। ৬টী সন্তান এবং আমরা স্বামী-স্ত্রী এই আটটি পোষ্য লইয়া স্বচ্ছন্দে সংসার চলিতেছিল, কিন্তু আগামী কল্য যে কোথায় দাঁড়াইব, কিরূপে সংসার চলিবে তাহার কিছুই বন্দোবস্ত নাই, একটি টাকা সঞ্চিত নাই, কোথাও হইতে (সাংসারিক দৃষ্টিতে) একটি টাকা আসার আশা নাই। ইহার উপর ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমার তখনও বিশেষ আকর্ষণ ছিল, সে সমাজে আমার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, আমার প্রতি সে সমাজের সকলেরই ভালবাসা ছিল, সেখানে যশ ছিল, মান ছিল, তখনও আমার প্রচারের নেশা ছিল কিন্তু এক পলকে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। কোথা হইতে হঠাৎ এত নির্ভর এত সাহস আসিয়া পড়িল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। চিত্ত এতদূর প্রসন্ন হইল যে, মনে হইল আমি যেন মায়ার বাহু-বন্ধন হইতে

মুক্তিলাভ করিলাম। যাঁহার সাহায্যে আমি এই কঠোর ব্রতে ব্রতী হইতে সাহসী হইলাম, যাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমি ভবিষ্যৎ চিন্তা ভুলিবার শক্তি পাইলাম, সমস্ত সাংসারিক দুর্গতিকে তুচ্ছ করিতে পারিলাম, সেই জীবন-সহচরী, সহধর্ম্মিণী মনোরমার অভাবে আজ আমার জীবন শক্তিশূন্য, আশাশূন্য, নির্ভরশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। আজ ষোলবৎসরকাল আমি বায়ু-বিতাড়িত শুষ্ক পত্রের মতন স সার-কাননে আশ্রয়শূন্য হইয়া উড়িয়া বেড়াইতেছি।

আমরা আমাদের ব্রত পালন করিতে প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু গুরুদেব যে স্থানে যাইতে বলিয়াছেন তথায় যাওয়ার উপায় কি? খরচ কোথা হইতে আসিবে?

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয়ের অনুজ শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ সরকার (ডাকনাম নানুবাবু) আমাকে 'দাদা' ও মনোরমাকে 'বউদিদি' ডাকেন, শ্রীমান্ কিছুদিন হইল ঢাকায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রথম রোজগারের ৫০টি টাকা তিনি মনোরমার শরীর শোধরাইবার জন্য অর্পণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, বলিয়া গেলেন তিনি কলিকাতায় পৌঁছিয়াই টাকা পাঠাইবেন। আমি ভাবিলাম এই টাকাটা আসিলেই আমরা এখান হইতে রওয়ানা হইব। শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জনকে বলা হইল যে, "তোমার পরমেশ্বরের নিকট জিজ্ঞাসা কর যে, কবে নানুবাবুর টাকা আসিবে।" বালক তখনই চক্ষু বুজিয়া বসিয়া গেল এবং বিড়বিড় করিয়া প্রার্থনা করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল যে, "পরমেশ্বর বলিলেন, বুধবারে টাকা আসিবে।" সেই বয়সে সে ক, খ, লিখিতে শিখে নাই, বারের হিসাবও কিছু জানে না। আমরা তাহার প্রত্যাদেশের উপর তেমন কিছু আস্থা স্থাপন করিলাম না।

বুধবারের সকালে বালককে বলা গেল যে, আজ বুধবার, আজ টাকা আসিবে তুমি বলিয়াছ। আজ বুধবার শুনিয়া বালক সকাল হইতে গেটের কাছে আনাগোনা করিতেছে, তাহার বিশ্বাস যখন

পরমেশ্বর বলিয়াছেন তখন টাকা অবশ্যই আসিবে। গেটের কাছে পোষ্ট পিয়নের দেখা পাইয়া আমাদের চিঠি আছে কিনা শ্রীমান্ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এবং পিয়ন একখানা চিঠি দিলে সে দৌড়াইয়া আমাদিগকে আনিয়া দিল। সে জানিত না যে এরূপ চিঠির মধ্যে টাকা থাকার সম্ভাবনা নাই। বালক বড়ই আশায় উৎফুল্ল হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, তাহার ঈশ্বরের বাক্য সত্য না হইলে সে যে অত্যন্ত মনোবেদনা পাইবে তাহা তাহার মুখশ্রীতে প্রকটিত হইতেছিল। পত্র খোলা হইলে সে বুঝিল ইহাতে টাকা নাই, শুধু তাহা নহে, শ্রীমান্ নান্নু লিখিয়াছেন যে, "আজ (সোমবার) টাকা পাঠাইব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু সুবিধা হইল না, যত শীঘ্র পারি পাঠাইব।" সোমবারে কলিকাতা হইতে টাকা পাঠাইলে ঢাকায় উহা বুধবারে পৌঁছাইত, কিন্তু সোমবার যখন পাঠান হয় নাই তখন বালকের কথা সত্য হওয়ার আর সম্ভাবনা নাই।

আমি ভাবিলাম, পরলোকগত কোন আত্মা হয়ত বালকের সঙ্গে কথা বলিয়া থাকে, বালক তাহাকেই ঈশ্বরের বাক্য মনে করে। আত্মাদের (অনেকেরই) ভবিষ্যৎ দর্শনের শক্তি নাই, কিন্তু তাহারা অনেকে লোকের মন বুঝিতে পারে। এইরূপ কোন আত্মা হয়ত নান্নুবাবুর মনের ভাব বুঝিয়াছিল যে, তিনি সোমবারে টাকা পাঠাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, সেই জন্যই বুধবারে টাকা আসার কথা বলিয়াছে। সোমবারে যে টাকা পাঠাইতে তাঁহার সুবিধা হইবে না, এতটা ভবিষ্যৎ দর্শনের শক্তি সে আত্মার ছিল না। যাহাদের পরলোকগত আত্মার অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস নাই, তাহারা আমার এই মীমাংসাকে কুসংস্কার মনে করিবে।

বালক কিন্তু কোনও কথায়ই প্রবোধ মানিল না, তাহার পরমেশ্বর যাহা বলিয়াছেন, তাহার কি অন্যথা হয়? টাকা কেহ পাঠাক আর নাই পাঠাক, টাকাকে আসিতেই হইবে। সে কিছুক্ষণ অন্তরই গেটের কাছে যাইয়া পিয়নের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, আমরা

এত করিয়া বুঝাইলাম, সে আমাদের কোন কথাই বিশ্বাস করিল না। তাহার কথা এই যে, পরমেশ্বর যখন বলিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই টাকা আসিবে। কয়েক ঘণ্টা পরে বালক চিত্তরঞ্জন এক পিয়নকে সঙ্গে করিয়া হাসিতে হাসিতে আশ্রমে প্রবেশ করিল এবং আমাকে ডাকিয়া বলিল "বাবা, টাকা এসেছে।"

আমরা সকলেই ভাবিলাম, বোধ হয় অন্য কোথাও হইতে কেহ টাকা পাঠাইয়া থাকিবে। জিজ্ঞাসা করিলাম, কত টাকা? পিয়ন বলিল "৫০ টাকা"। কে পাঠাইয়াছে? উত্তর "উপেন্দ্রনাথ সরকার।"

নীচে নামিয়া টাকা গ্রহণ করিলাম, কুপনে লিখিত আছে, "সকালবেলার চিঠিতে লিখিয়াছিলাম যে আজ টাকা পাঠাইতে পারিব না, কিন্তু বিকালবেলায় হাতে টাকা আসিয়া পড়ায় টাকা পাঠাইলাম।" বালকের আনন্দ তখন দেখে কে, তাহার নাক মুখ চোক্ ও হাসি তখন যেন বলিতেছিল যে "পরমেশ্বরের কথা কি মিথ্যা হয়?"

ঢাকায় অভিনব ঘটনা

আর একটা ঘটনার কথা লিখিতে হইবে। যদিও এই ঘটনার সহিত মনোরমার বিশেষ সাক্ষাৎসম্বন্ধ কিছু নাই, তথাপি এই ঘটনাটী আমাদের পরবর্ত্তী সাংসারিক জীবনের সঙ্গে এরূপ ভাবে সংশ্লিষ্ট যে উহার উল্লেখ না করিলে এই গ্রন্থ একান্তই অসম্পূর্ণ থাকিবে, শুধু তাহা নহে, অনেক কথার মর্ম্ম অত্যন্ত জটিল হইবে। বিষয়টা এই, —মাঘোৎসবের মধ্যে ১৩ই মাঘ, নগর-সংকীর্ত্তনের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। সকালে সামাজিক উপাসনার পরে সকলে নগর-কীর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, ১টার সময়ে কীর্ত্তন বাহির হইবে। বেলা প্রায় ১১টার সময়ে ৩।৪ টি অপরিচিত যুবক আমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন যে, গেণ্ডারিয়ার আশ্রম হইতে

গোঁসাইজীর অনুমতি লইয়া তাঁহারা আমার নিকট আসিয়াছেন। ব্যাপারটা এই যে, একটী নব্য উকীল (বি, এল্,) আজ কয়েক দিন হইতে একটা উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহার শরীর সুস্থ ও সবল ছিল, হঠাৎ একদিন দেখা গেল তিনি শয়ন করিয়া পড়িয়া আছেন, কাহারও সঙ্গে কথা কহিতেছেন না, এমন করিয়া দাঁতে দাঁত লাগাইয়া আছেন যে এক ফোঁটা জল তল করাবার উপায় নাই। ২।৩ দিন এইরূপ নিরম্বু উপবাসে থাকায় তাঁহার শরীর এত দুর্ব্বল হইয়াছে যে, এখন প্রকৃতপক্ষে উত্থানশক্তি আছে কিনা সন্দেহ। ডাক্তার কবিরাজগণ কিছুই প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না, অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে। এই অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, কোন প্রকারের দৈব প্রতিকার আছে কিনা জানিবার জন্য এই যুবকগণ গেণ্ডারিয়ায় শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট উপদেশ লাভ করিতে গিয়াছিলেন, তিনি আমার নিকট সকল কথা বলিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিতে যুবকদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। যুবকগণ উক্ত উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত উকীলের বিধবা মাতা ও বালিকা বধূর দুঃখের দোহাই দিয়া এই সকল কথা আমাকে বলিলেন।

তখন মাঘোৎসব আমার মাথার ষোল আনা অধিকার করিয়া আছে, এই নূতন ব্যাপারটী আমার মস্তিষ্ক-রাজ্যে সহসা একটা বিপ্লব উপস্থিত করিল। আমি বুঝিতে পারিলাম না যে, আমার প্রতি কেন এরূপ আদেশ হইল এবং কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমি উকীলটীকে আরোগ্য প্রদান করিব? যাহা হউক আমি যুবকদিগের সঙ্গে রোগীর বাড়ীতে গেলাম। শাঁখারীবাজারের একটা বাড়ীতে একটী দোতলা ঘরে রোগী মাটিতে পড়িয়া আছেন, তাঁহাকে দেখিলে জীবিত কি মৃত হঠাৎ বুঝা যায় না। আমি গৃহে প্রবেশ করিলে রোগীর মাতা সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ঢাকার সুবিখ্যাত পালোয়ান সংযতচিত্ত পার্শ্বনাথ (পরেশবাবু) সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি উকীল বাবুর বিশেষ বন্ধু। আমাকে কি করিতে হইবে বুঝিতে

না পারিয়া ভাবিলাম যে, আমি চক্ষু বুজিয়া প্রার্থনা করিব, সেই অবস্থায় মনে যাহা উদিত হইবে তাহাই গুরুর ইচ্ছা বলিয়া মানিয়া লইব। আমি পরেশবাবুকে এবং আমার সঙ্গীয় যুবকগণকে ঘরের বাহিরে যাইতে অনুরোধ করিলাম। তাঁহারা সকলেই বাহিরে গেলেন, আমি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চক্ষু বুজিয়া রোগীর নিকট বসিলাম, মনে হইল যেন শব-সাধন করিতে বসিয়াছি। কিছুক্ষণ পরে আমার শরীরে বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় একটা বিশেষ শক্তি অনুভব করিলাম, সে শক্তি আমার শরীরে ও মনে এমনই বলের সঞ্চার করিল যে, আমার মনে হইতেছিল যেন আমি ইচ্ছা করিলেই এই রোগীকে আরোগ্য প্রদান করিতে পারিব। তৎক্ষণাৎ আমি তাঁহার একখানা হাত শক্ত করিয়া ধরিলাম, রোগী চক্ষু খুলিয়া আমার দিকে চাহিলেন, আমি সজোরে বলিলাম "উঠিয়া বসুন," অমনি তিনি উঠিয়া বসিলেন। আমি তাঁহার উভয় হস্ত আমার উভয় হস্ত দ্বারা শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিলাম "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ," অমনি রোগী বলিয়া উঠিলেন—"শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।" ক্রমশঃ আমার মনের বল অধিক হইতে অধিকতর হইতেছিল। আমি বলিলাম—"আপনার কোনও ব্যাধি নাই," রোগী সহাস্য মুখে বলিলেন "না, আমার কোন ব্যারামই নাই।" আমি বলিলাম "এখনই আপনার কিছু খাইতে হইবে।" রোগী বলিলেন "আপনি বলিলেই খাইব।" আমি দরজা খুলিয়া সকলকে ডাকিলাম, অন্তরাল হইতে তাঁহারা আমাদের পরস্পরের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, দরজা খোলা হইলে পরেশবাবু ও রোগীর মাতা সবেগে ঘরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাদের তখনকার মনের ভাব, বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতা তাঁহাদের বাক্যে ও মুখশ্রীতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছিল। আমার আদেশমতে প্রায় এক পোয়া হালুয়া আনা হইল এবং আমার অনুরোধে রোগী এতই ব্যস্ততার সহিত উহা গিলিতেছিলেন যে, হালুয়া গলায় ঠেকিয়া যাইতেছিল কিন্তু ভোক্তার সেদিকে দৃষ্টি রাখার শক্তি ছিল না, আমি জল পান করিতে

বলিলাম, জল পান করিয়া দুই মিনিটের মধ্যেই তিনি খাদ্য নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। রোগীর ঘরে আমার প্রবেশ হইতে তাহার আরোগ্যলাভ ও হালুয়া ভক্ষণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য সম্পন্ন হইতে মোটের উপর আধ ঘণ্টার অধিক সময় লাগে নাই। হালুয়া আনিতেই অধিকাংশ সময় গিয়াছিল। রোগীর হাতে একখানা 'গীতা' দিয়া আমি বলিলাম যে ইহা পাঠ করিতে থাকুন, নিয়মিতরূপে আহার করুন, কথা বলুন এবং মনে রাখুন যে আপনি আরোগ্যলাভ করিলেন। রোগী বলিলেন "তাহাই করিব।" আমি নিজে বিস্ময়মগ্ন হইয়া প্রচারাশ্রমে চলিলাম, সিঁড়ি দিয়া নামিতেছি তখন অনতিউচ্চ রমণীকণ্ঠ হইতে নির্গত এই কথা আমার কাণে প্রবেশ করিল, "এ লোকটা মানুষ, না দেবতা?"

আমি আশা করিয়াছিলাম, পরের দিন সংবাদ পাইব যে, রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়া, বিষয়কর্ম্মে মনোযোগী হইয়াছেন। কিন্তু আমি যখন কোনও সংবাদ পাইলাম না, তখন সংবাদটা জানিতে আমার আগ্রহ হইল, অনুসন্ধানে জানিলাম যে, কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোকের প্ররোচনায় তাঁহাকে ব্রাণ্ডি প্রভৃতি বলকারক ঔষধ খাওয়ান হইয়াছে, রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় এবং স্থায়ী আরোগ্যলাভের প্রত্যাশায়ই এরূপ করা হইয়াছিল, আরও কিছু কারণ ছিল, সেটা 'দলো' ভাব। ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারকের দ্বারা এমন একটা বুজরুকী হইল, ইহা প্রচারিত হওয়া ব্রাহ্মবিদ্বেষী গোঁড়া হিন্দু আখ্যাধারী কেহ কেহ একেবারেই পছন্দ করেন নাই। ডাক্তারই আরাম করিয়াছে, যাহাতে এইরূপ রটনা হয়, তাহাই তাঁহারা সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার ফল যাহা ফলিল, তাহা অত্যন্ত সাংঘাতিক অর্থাৎ রোগী অবিলম্বে পুনরায় পূর্ব্বেকার অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। সংকীর্ণ মতের গণ্ডীতে যাহারা আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ের ভাব সর্ব্বত্রই একরূপ। দেখিয়াছি হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান অনেকের মধ্যেই এই 'দলো' ভাব। পরমহংসদেব

বলিয়াছেন যে, জল না পচিলে দল হয় না, কথাটি বেদবাক্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যাহা হউক, লজ্জাবশতঃই হউক, অথবা অন্য যে কারণেই হউক আমাকে আর ডাকা হইল না। আমি গেণ্ডারিয়া যাইয়া শ্রীগুরুদেবকে সমস্ত বিবরণ বলিলাম, তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝিলাম যে আমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়াছে। রোগীর আত্মীয়েরা আগ্রহ প্রকাশ না করিলে আর আমাকে কিছু করিতে হইবে না।

আমার এই শক্তি লাভে গুরুদত্ত ব্রত পালন করা আমাদের পক্ষে যে কিরূপ কঠিন অগ্নি-পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ পরবর্ত্তী ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে অনায়াসে দেখিতে পাইবেন। একটি কথা মনে রাখিবেন, শ্রীশ্রীগুরুদেব নিজের হাতে লিখিয়া গিয়াছেন যে "মনোরঞ্জন বাবুর এখনও নির্ভরের অবস্থা আসে নাই, কিন্তু মনোরমার সম্পূর্ণই নির্ভরের অবস্থা।" যদি মনোরমার বিন্দুমাত্র সাংসারিক ভাব থাকিত, যদি বিন্দুমাত্র অর্থলিপ্সা, সুখলিপ্সা থাকিত, তবে ব্রত পালন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইত। তিনি অম্লানবদনে স্বামী ও শিশুসন্তানগণ লইয়া কখন উপবাসে, বহুদিন অর্দ্ধ উপবাসে কাটাইয়াছেন, অথচ মুখ ফুটিয়া চাহিলে তখন সহস্র সহস্র টাকা অনায়াসে আসিতে পারিত।

আমার প্রচারক অবস্থায় ঢাকা অবস্থানকালে আমার সংস্রবে সেখানে যে সকল বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার কয়েকটির উল্লেখ সংক্ষেপে করিব।

মুসলমান-সুহৃদ্-সম্মিলন-সভা

তখন (ইং ১৮৯২ সালে) ঢাকায় 'মুসলমান-সুহৃদ্-সম্মিলনী' নামে একটি সভা ছিল। ঢাকা সহরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলমান এবং স্কুল কলেজের মুসলমান ছাত্রগণ উক্ত সভায় সভ্য ও

সাহায্যকারী ছিলেন। বরিশালের বর্ত্তমান উকীল খান্ বাহাদুর হেমায়েত উদ্দীন সাহেব এবং মৌলবী আবদুল আজিজ প্রভৃতি খুব উৎসাহী সভ্য ছিলেন। এই মুসলমান-সুহৃদ্-সভার বার্ষিক উৎসব হইয়াছিল, সে সভায় মাদ্রাসার সমস্ত শিক্ষকগণ এবং নবাবপরিবারের কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই বৃহৎ মুসলমান 'সুহৃদ্-সভার' সমারোহপূর্ণ বার্ষিক উৎসবে বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলমান সভাস্থলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সেইদিন সভায় সভ্যগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমাকে সভাপতি মনোনয়ন করিয়া সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। সভার বক্তারূপে একজন মুসলমান বলিয়াছিলেন যে, আজ আমাকে তাঁহারা যে পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, কোনকালে কোন স্থানে মুসলমান ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে এরূপ পদ প্রদান করা হয় নাই। বক্তা আরও বলিলেন যে, আমার প্রতি তাঁহাদের কতদূর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তাহা এই সভাপতি মনোনয়নের দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে। আমিও তাঁহাদের এই আদরে আপ্যায়িত এবং তাঁহাদের প্রদত্ত গৌরবে বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছিলাম; বস্তুতঃ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর সভাপতিত্বে মুসলমানের জাতীয় সভার উৎসব বাঙ্গালাদেশে আর কখনও হয় নাই। ভারতের অন্যত্র হইয়াছে কিনা জানি না। সেদিনকার দৃশ্য অতি চমৎকার হইয়াছিল। আমাকে সভাপতি করিয়া মুসলমান বন্ধুগণ যেরূপ অপূর্ব্ব উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন, সভাসদ্গণের সহাস্য মুখমণ্ডলে সেই উদারতার পবিত্র প্রকাশ সমস্ত সময়ে সভাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। সমস্ত সভ্যগণ সকল বিষয়ে একজন ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী সভাপতির অনুশাসনের নিকট এতই বাধ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাকে এতই মান্য করিয়া চলিয়াছিলেন যে তদ্দ্বারা সেই সভাস্থলে মুসলমান জাতির বিশিষ্ট উদারতা ও সভ্যতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বলিতে হইবে না যে, ইহা মুসলমানগণেরই গুণের কথা, ইহাতে আমার কোন কৃতিত্ব ছিল না। তবে যে কারণেই হউক আমি যে তাঁহাদের

স্নেহভাজন ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলাম সে কথা বলিতে আমি সঙ্কোচ বোধ করিব না।

সেদিনকার সভায় তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা হইয়াছিল, যদি বলি যে একটা তর্কের ঝড় বহিয়াছিল অথবা বিতণ্ডার তরঙ্গ খেলিয়াছিল তাহাতে অতিরিক্ত কিছু বলা হইবে না। সেরূপ তর্ক ও বিতণ্ডা না হইলে সভার কোন মূল্য থাকিত না। বিষয়বিশেষ লইয়া কেহ কেহ উত্তেজিত হইয়াছিলেন কিন্তু কেহই সভ্যতার সীমা লঙ্ঘন করেন নাই, সভাপতির অনুশাসন বিন্দুমাত্র উপেক্ষিত হয় নাই। একটি বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। বিষয়টী স্ত্রী-শিক্ষা। স্ত্রী-শিক্ষা প্রদানে কাহারই অমত ছিল না কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী ও পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন লইয়া মতান্তর হইল, বিশেষতঃ মুসলমান মহিলাদিগকে বর্ত্তমান বাঙ্গলা ও ইংরাজী ইতিহাস পড়ান উচিত কিনা ইহাই বিশেষভাবে আলোচনার বিষয় হইয়াছিল।

নব্য-দলের কয়েকজন বলিলেন, "ইতিহাস পড়িলে ক্ষতি কি?" প্রবীণ দল হইতে উত্তর উঠিল যে, ইংরাজী ইতিহাসের ত কথাই নাই, বাঙ্গলা ইতিহাসগুলিও ইংরাজের লিখিত ইতিহাসেরই অনুবাদ, উহাতে মুসলমানের ধর্ম্মের ও পূর্ব্বপুরুষের গ্লানির কথা লিখিত আছে। পরীক্ষা পাশ করার জন্য বালকগণ উহা পড়িতে বাধ্য হয়, স্ত্রীলোকগণকে মুসলমানগণ কেন সেই বিষ খাওয়াইবেন? মুসলমান রমণীগণ ত চাকুরী করিতে যাইবেন না, যে তাঁহাদিগকে পরীক্ষা পাশ করিতেই হইবে?

ইহার প্রত্যুত্তরে একজন উঠিয়া বলিলেন যে, হিন্দুরা তাঁহাদের কন্যাগণকে ত বর্ত্তমান ইতিহাস পড়াইতেছেন? এই কথা বলামাত্র দূরস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। সম্ভ্রান্ত পরিচ্ছদ পরিহিত, উন্নতনাসা উজ্জ্বলচক্ষু আজানুলম্বিতবাহু একজন দীর্ঘকায় লোক, হস্ত উত্তোলন করিয়া সমস্ত লোকদিগকে অতিক্রম করিয়া দ্রুতপদে সভাপতির দিকে অগ্রসর হইলেন এবং মৌলবী

আবদুল আজিজ (তখন বি, এ, পড়িতেন, ইনি সংস্কৃতে ফাষ্ট আর্ট দিয়াছিলেন) সাহেবকে বলিলেন যে, যেন তাঁহার বক্তব্য তিনি বাঙ্গলা করিয়া সভাপতি মহাশয়কে বুঝাইয়া দেন। বক্তা উত্তেজনার সহিত অনর্গল খাস উর্দ্দু ভাষায় তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কথার মর্ম্ম এই যে হিন্দুগণ বহুবৎসর পরের দাসত্ব করিতে করিতে আত্মমর্য্যাদা হারাইয়াছে, তাহারা যাহা খুসী করিতে পারে কিন্তু আমাদের মহিলাগণকে স্বধর্ম্মের ও পিতৃপুরুষের নিন্দাগ্লানি পড়িতে দিব কেন?

বক্তা যখন বলিলেন, "এই হাতে এখনও তলোয়ারের গন্ধ আছে" তখন তাঁহার প্রসারিত সুদীর্ঘ দক্ষিণহস্ত গর্ব্বভরে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল, তাঁহার বক্তৃতাকালে ঘন ঘন করতালীতে সভাস্থল মুখরিত হইয়া উঠিল এবং প্রচণ্ড ঝটিকাবসানে প্রকৃতি যেমন প্রসন্ন ও প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করে, তাঁহার বক্তৃতান্তে সভামণ্ডপ সেইরূপ ভাব ধারণ করিল।

সেদিনকার সভায় (আমার যতদূর মনে হয়) এই বক্তার মতই জয়যুক্ত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মমিলন

আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহের পর 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ' দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেল। এক দলের নাম হইল, 'নব-বিধান' এবং অন্য দলের নাম হইল 'সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজ'। মফঃস্বলের ব্রাহ্ম-সমাজগুলিও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। নববিধানীগণ অর্থাৎ কেশবচন্দ্রের দল ঢাকার ব্রাহ্ম-মন্দিরের আধিপত্য হারাইলেন, উহা নূতন দলের হস্তগত হইল। সেই হইতে এত বৎসর পর্য্যন্ত (প্রায় ২৫ বৎসর) নব-বিধানী ব্রাহ্মগণ কেহ কখনও 'পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে' পদার্পণ করেন নাই। আমি যেদিন এই মন্দিরে পণ্ডিত শশধর

তর্কচূড়ামণি ও পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ স্বামীর বক্তৃতার প্রত্যুত্তর প্রদান করিলাম সেই দিনই ঢাকার নববিধান-সমাজের আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায়, সম্পাদক ডাক্তার দুর্গাদাস রায় ও গোপীমোহন সেন এবং দুর্গানাথ বসু, ঈশান বাবু, বৈকুণ্ঠ বাবু প্রভৃতি প্রচারকগণ সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর এই মন্দিরে প্রথম সম্মিলিত হইলেন। সেদিন উভয় দলের ব্রাহ্মগণের মন সুপ্রসন্ন ও বিদ্বেষশূন্য হইয়াছিল।

আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া উপরে যে সকল কথা লিখিত হইল সে সকল আমাদের বাঙ্গলা দেশের জাতীয়-জীবনের অতীত ইতিহাসের অংশবিশেষ, নতুবা শুধু আত্মগৌরব প্রকাশের জন্য এই কথাগুলি বলিতে আমি সঙ্কোচবোধ করিতাম। আর এক কথা এই যে, আমি যখন প্রচারকের কাজ পরিত্যাগ করিলাম তখন ঢাকায় আমার কিরূপ প্রতিপত্তি ছিল তাহা জানিতে পারিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীশ্রীগুরুদেব আমাকে কত বড় দৃঢ়-বন্ধন হইতে মুহূর্ত্তের মধ্যে মুক্ত করিয়াছেন এবং আরও বুঝিতে পারিবেন যে মনোরমার মতন নির্ভরশালিনী, সহধর্ম্মিণী না পাইলে আমাকে কতস্থানে কত বাধা পাইতে হইত। শ্রীশ্রীগুরুদেব নিজের হাতে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, সমাধির অবস্থায় মনোরমাকে যে দেখিবে, তাহার আত্মজ্ঞান হইবে, দেহাত্মবুদ্ধি নষ্ট হইবে।

ঢাকা হইতে বরিশাল

ঢাকা হইতে বরিশাল হইয়া ভাগলপুর রওয়ানা হইব ইহাই সঙ্কল্প করিলাম। নৌকাযোগে হাঁসেরকান্দি যাইয়া আমরা ষ্টিমার ধরিলাম, এই ষ্টিমার নোয়াখালী ও বরিশাল যাতায়াত করিত। বরিশাল সহর হইতে একমাইলের অধিক দূরে কয়লাঘাটা নামক স্থান ছাড়িয়া ষ্টিমারের ষ্টেশন ছিল। শ্রীমান্ মনোমোহন ও রাজকুমার ষ্টিমারঘাটে উপস্থিত ছিলেন, একখানি ডিঙ্গি নৌকা করিয়া আমরা বরিশাল রওয়ানা

হইলাম, মাঝি সহিত এগার জন নৌকায় উঠায় ক্ষুদ্র নৌকাখানি বেশ বোঝাই হইয়াছিল। নদীতে তরঙ্গ উঠায় আমাদের ডিঙ্গিখানা ডুবুডুবু হইল। মনোরমা এবং সন্তানগণ কেহই সাঁতার জানে না, সময়ে সময়ে আমাদের মনে আশঙ্কা হইতে লাগিল বুঝি বা ভরা ডুবিয়া যায়। নৌকাখানি কেনারায় লইতে মাঝিকে অনুরোধ করা হইল, সে বলিল কেনারায় বড় বেশী ঢেউ লাগিবে। কোনরূপে ত্রাহি ত্রাহি করিয়া আমরা খালের মুখ পাইলাম, তখন শ্রীমান্ রাজকুমার বলিলেন "আমার বিশ্বাস ছিল বৌঠাকুরুণ (মনোরমা) যখন নৌকায় আছেন তখন নৌকা ডুবিবে না"। এই কথাটি বলিবার জন্যই এই কয়েক ছত্র লিখিলাম। রাজকুমার অতিশয় গোঁড়া ব্রাহ্ম, তাঁহারও মনোরমার প্রতি এতটা বিশ্বাস ছিল যে তিনি নৌকায় থাকিতে নৌকা ডুবিবে না।

বরিশাল হইতে নরোত্তমপুর

বরিশাল হইতে আমরা নরোত্তমপুর গেলাম। সেখানে আমার ভগিনী-বাড়ী। আমরা কত দিনের জন্য কোথায় যাইতেছি তাহার ঠিকানা নাই, এই যাত্রার পূর্ব্বে রাস্তায় একবার দিদির সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতে আমরা ইচ্ছা করিলাম। আমার ভগিনীপতি তখন সুপ্রসিদ্ধ পোর্টক্যানিং কোম্পানীর ম্যানেজার, তখন দিদিদের ধুমধামের সংসার। নরোত্তমপুর ও বাণারিপাড়া বলিতে গেলে কলিকাতা ও কালীঘাটের ন্যায় অদূরবর্ত্তী গ্রাম। আমাদের নিজ বাড়ীতে তখন এমন কেহ ছিলেন না যিনি আমাদিগকে তখনকার অবস্থায় সাদরে গ্রহণ করিবেন, দিদি আমাদিগকে প্রাণের সঙ্গে গ্রহণ করিলেন, আমাদিগকে পাইয়া তিনি যেন হাতে আকাশ পাইলেন।

নরোত্তমপুরে আমরা এক সপ্তাহের অধিক ছিলাম না। এই সময় মধ্যে একটা হুলস্থুল কাণ্ড উপস্থিত হইল। মনোরমাকে দেখিবার

জন্য নরোত্তমপুর, বাণারিপাড়া এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে অনবরত স্ত্রীলোক পুরুষের সমাগম হইতে লাগিল। দর্শকবৃন্দের আগ্রহের কথা কি বলিব, একটি বালক সময়মত নৌকা না পাইয়া খাল সাঁতারিয়া আসিয়াছিল। আমি দেখিলাম, আমি বক্তা ও ধর্ম্মপ্রচারক কিন্তু আমাকে দেখিতে বড় কাহারও আগ্রহ নাই, যে লোক বক্তৃতা করে না, ধর্ম্মের কথা বলে না, সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মার্থী তাঁহাকে দেখিতেই ছুটিয়া আসিতেছে।

মনোরমা নিয়মিতরূপে সকাল ৮টার সময়ে ধ্যানে বসিয়াছেন, নরোত্তমপুরের ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের স্ত্রীলোকগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন, বৃদ্ধা ও বিধবাগণ তাঁহার কাছে বসিয়া মালা জপ করিতেছেন। বেলা ৩টা বাজিয়া গেল, তাঁহাদের স্নানাহার নাই। আমি একজন বৃদ্ধা বিধবাকে বলিলাম যে, আপনারা এত বেলা অবধি কেন উপবাস করিয়া রহিয়াছেন? তিনি বলিলেন, "খাওয়া ত চিরকালই আছে, এমন শুভদিন, এমন সৎসঙ্গ আমরা কবে পাইব?" নিকটবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ গাভা গ্রামে রাধাচরণ ঘোষ দস্তিদার নামে এক সুরসিক পুরুষ বাস করিতেন, তিনি যেমন রসিক তেমনই সচ্চরিত্র ছিলেন। ঠাট্টাতামাসা ও পরিহাস-রসিকতা ২৪ ঘণ্টার জন্য তাঁহার অনুচর সহচর ছিল, সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। তিনি যে কোন অবস্থায় যে কোন অবস্থার লোকের মধ্যে উপস্থিত হইতেন, তখনই সকলের সকল অবস্থা ভুলাইয়া দিয়া সকলের মধ্যে আনন্দ ছড়াইয়া দিতেন। তাঁহার মলিন মুখ আমরা কখনও দেখি নাই। একদিন তিনি মনোরমাকে ধ্যানের অবস্থায় দেখিতে আসিলেন। আমাকে বৈঠকখানায় পাইয়া দুই একটা রসিকতার কথা বলিলেন, আমি ভাবিলাম যে, মনোরমাকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ ঠাট্টা তামাসা করিয়া যাইবেন। শুনিলাম তিনি রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ সেই ধ্যানস্থ-মূর্ত্তি দেখিলেন, একটিও কথা বলিলেন না, চলিয়া যাইবার সময়ে আমার নিকট দিয়া গেলেন, আমার সঙ্গে একটিও কথা বলিলেন না।

আমরা (যাহারা বৈঠকখানায় বসিয়াছিলাম) চাহিয়া দেখিলাম দুইটি অশ্রুধারা তাঁহার গণ্ড বাহিয়া পড়িতেছে, মুখশ্রী অত্যন্ত গম্ভীর।

ধর্ম্মের সহিত বুজরুগী জড়ান সকল দেশেরই একটি সাধারণ প্রথা। অধ্যাপক ম্যাকস্‌মুলার তাঁহার Six Systems of Hindu Philosophy নামক গ্রন্থে পাতঞ্জল দর্শনের সমালোচনাসূত্রে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্থির করিতে পারেন নাই যে ধর্ম্মের সহিত অলৌকিক শক্তির সম্বন্ধ কি? পাতঞ্জল দর্শন পড়িয়াও তিনি যে ইহা কেন বুঝিতে পারেন নাই ইহাও খুব আশ্চর্য্যের বিষয়। মানব-মন অনন্ত জ্ঞানের ও অশেষ শক্তির খনি। পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেটুকু লইয়া নাড়াচাড়া করে সেটুকু মানবজ্ঞানের বহির্ভাগ মাত্র। চিত্ত সংযত হইলে অন্তরের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। তখন মানুষ এমন সকল শক্তি লাভ করে, ব্যবহারিক জ্ঞানের তুলনায় সে সকল অলৌকিক বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশের যোগ-সাধনায় চিত্তবৃত্তিনিরোধই সাধনার প্রথম ও প্রধান অঙ্গ; সুতরাং সাধকের নিকট হইতে অসাধারণ শক্তির প্রত্যাশা করা মূর্খতার পরিচায়ক নহে। তবে সোণালু বস্তুমাত্রই যেমন সোণা নহে, সেইরূপ অসামান্য শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই ধার্ম্মিক নহে। যোগের পথে চলিতে অনেক শক্তি উৎপন্ন হয়, এই জন্যই যোগীদিগের নিকট লোকেরা অসাধারণ শক্তির প্রত্যাশা করে এবং কিঞ্চিৎ শক্তি যাঁহাতে দেখিতে পায় তাঁহাকেই সাধক বলিয়া মনে করে।

আমরা নরোত্তমপুর থাকিতে দিদিদের বাড়ীর নিকটে একটি স্ত্রীলোক কয়েকদিন হইতে প্রসব-বেদনায় কষ্ট পাইতেছিলেন, একজন মহিলা মনোরমার নিকট আসিয়া উক্ত স্ত্রীলোকটির সু-প্রসবের উপায় বিধান করিতে অনুরোধ করিলেন। সঙ্কোচে মনোরমার মুখ রক্তবর্ণ হইল, তিনি কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। বহুক্ষণ অনুরোধেও যখন কোন ফল ফলিল না তখন পূর্ব্বোক্ত মহিলা একটি পানের খিলি আনিয়া মনোরমার হাতে দিলেন এবং বলিলেন, "বউ মা, তুমি এই

খিলিটি তোমার হাতে ধরিয়া আমাকে দাও, ইহা খাইয়া নিশ্চয়ই প্রসূতি খালাস হইবে।" মনোরমা অনেকক্ষণ সেই পানের খিলিটি হাতে করিয়া বসিয়া থাকিলেন, কিছুতেই এই বুজরুগীর প্রশ্রয় দিতে তাঁহার সাহস ও ইচ্ছা হইল না। পরে গুরুজন সম্পর্কীয় মহিলাগণের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে সঙ্কুচিত হইয়া খিলিটি পূর্ব্বোক্ত মহিলার হস্তে অর্পণ করিলেন। বিশ্বাসের ফলেই হউক অথবা প্রসবের সময় উপস্থিত বলিয়াই হউক সেই পানের খিলি চর্ব্বণ করার অল্পক্ষণ পরেই সেই স্ত্রীলোকটির সু-প্রসব হইল। তখন অনেকে আসিয়া মনোরমার নিকট তাঁহার ক্ষমতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল যেন অত্যন্ত শরমে তিনি অধিকতর সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছেন।

নরোত্তমপুরে আমার দ্বারা একটা অদ্ভুত বুজরুগী সম্পন্ন হইল। নিকটবর্ত্তী বাগপুর গ্রামে ঈশানচন্দ্র সরকার নামক একটি ব্রাহ্মণ যুবক তিন মাসের অধিককাল হইতে অতি উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। পীড়ার প্রকৃতিটী সেই ঢাকার উকীলের পীড়ার মতন কিন্তু দীর্ঘকাল ভুগিয়া ভুগিয়া এই ব্রাহ্মণ যুবকের শেষ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। গত তিন মাসের মধ্যে কোন কোন দিন বিশেষ চেষ্টায় অতি অল্প খাদ্যই তাহার উদরস্থ হইয়াছে। সুতরাং শরীর একেবারে কঙ্কাল-সার। তিন মাস তাহার নিদ্রা নাই, বাক্যব্যয় নাই, আজ তাহার মৃত্যুর সম্ভাবনা জানিয়া গ্রামের স্ত্রী পুরুষ দলে দলে তাহাকে দেখিতে যাইতেছে। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র আমার মধ্যে একটা তীব্রশক্তি প্রবিষ্ট হইল। উক্ত যুবকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজকুমার সরকার আমার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল, আমাদের সখের থিয়াটারের দলে সে উর্ম্মিলা সাজিত, ঈশানকে আমি ভাল করিয়া চিনি না। তথাপি তাহাকে দেখিবার জন্য আমার প্রবল ইচ্ছা হইল। গ্রাম্য রাস্তার কোন কোন স্থানে হাঁটুসমান কাদা হইয়াছে, সেই কাদা ভাঙ্গিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। পণ্ডিত রাজমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, প্যারিমোহন

রায়, প্রসন্নকুমার রায় প্রভৃতি গ্রামের অনেক গণ্যমান্য লোক আমার সঙ্গে গিয়াছিলেন।

ঘরের দাওয়ায় একখানা তক্তপোষের উপর রোগী পড়িয়া আছে, তাহার মুখ দিয়া গেঁজলা উঠিতেছে, বৃদ্ধা মাতাও অন্যান্য আত্মীয়গণ সজল-নয়নে বসিয়া আছেন, তাঁহারা মনে করিতেছেন, রোগীর অবস্থা এখন তখন। হাঁটু অবধি কাদা লইয়া আমি রোগীর কাছে একখানি ছোট টুলে বসিলাম। তাহার দিকে যতই তাকাইতেছি ততই একটা অসাধারণ শক্তির আবির্ভাবে আমার শরীর মন পরিপূর্ণ হইতেছে, ক্রমে ক্রমে সেই শক্তি ধারণ করিতে আমি অসমর্থ হইলাম। তখন রোগীর একখানা হাত শক্ত করিয়া ধরিলাম, মনে হইতে লাগিল, বাঁধ কাটিয়া দিলে নদীর জল যেমন প্রবল বেগে খালে প্রবেশ করে, সেইরূপ আমার শরীর হইতে সেই অনাহূত দৈবশক্তি রোগীর শরীরে ছুটিয়া যাইতেছে এবং আমার ইচ্ছাশক্তি তাহার ইচ্ছাকে পরাভূত ও অবসন্ন করিয়া আমারই অনুগত করিতেছে। এই অবস্থায় আমি তাহার কঙ্কালসার ডান হাতখানা ধরিয়া সজোরে নাড়িয়া দিলাম, রোগী চমকিত হইয়া আমার দিকে চাহিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঈশান, আমাকে চিনিতে পারিতেছ ?" রোগী বলিল, "আজ্ঞে হাঁ।" তিন মাসের পরে তাহাকে হঠাৎ কথা বলিতে শুনিয়া উপস্থিত সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। প্রতি পলে পলে আমার ভিতরে শক্তির স্রোত আসিতেছিল, সে শক্তি খরচ করিতে না পারিলে আমি হয়ত অভিভূত হইয়া পড়িতাম, কিন্তু সে দান গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র নিকটেই ছিল। আমি সজোরে রোগীকে আদেশ করিলাম, "ঈশান, উঠে বসো।" তৎক্ষণাৎ সে উঠিয়া বসিল। পুনরায় আমি বলিলাম, "আমার সঙ্গে এসো।" তখনই সে দাঁড়াইয়া ভাল করিয়া কাপড়টা পরিল এবং আমার সঙ্গে চলিল। আমার মনে হঠাৎ আশঙ্কার উদয় হইল যে, এইরূপ কঙ্কালসার মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে একেবারে ছাড়িয়া দিলে চলিতে গিয়া হয় ত পড়িয়া যাইতে পারে,

সুতরাং আমি তাহার হাত ধরিলাম, সে আমার সঙ্গে হাঁটিয়া বাহির বাড়ীর প্রাঙ্গণে (প্রায় ২০০ শত হাত দূরে) গেল। সেখানে পুকুরের ঘাটে তাহাকে বসাইয়া আমি কয়েক গণ্ডূষ জল তাহার চক্ষে সজোরে ছিটাইয়া দিলাম এবং বলিলাম, "তুমি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইলে, তোমার কিছুমাত্র ব্যাধি নাই।" ঈশান বলিল তাহার কিছুই অসুখ নাই, সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে।

আমার ও রোগীর পিছনে পিছনে লোকেরা ভিড় না করে এজন্য আদেশ করিয়াছিলাম যে কেহই আমাদের সঙ্গে যাইতে পারিবে না, সে আদেশ সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছিল। আমি রোগীকে বাহির বাড়ীর চণ্ডী-মণ্ডপে লইয়া গেলাম, এখন সে স্বাধীন ও স্বাভাবিক ভাবে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছিল। চণ্ডী-মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া আমরা উভয়ে সেখানে বসিলাম এবং আমি রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাহার কি ব্যাধি হইয়াছিল এবং রোগের কারণই বা কি ছিল? ঈশান বলিল তাহার মনে হইতেছে যে, একদিন সন্ধ্যাবেলা সে বাহির বাটীর পুকুরের ঘাটে যাইতেছিল, এমন সময়ে একটা প্রবল ঘূর্ণীবায়ু উপস্থিত হইল এবং তাহার মনে হইল যে, বাড়ী ঘর গাছপালা সমস্ত উল্টাইয়া গেল, সে নিজেও জ্ঞান হারাইল। তাহার পরে আজই তাহার জ্ঞানের উদ্রেক হইয়াছে, ইহার মধ্যে কতদিন গত হইয়াছে এবং সে কি ভাবে দিন কাটাইয়াছে কিছুই তাহার মনে নাই। তাহার কথা শুনিয়া আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম এবং নিজকে প্রশ্ন করিলাম যে, ইহা কি ব্যাধি, না ভূতাবিষ্টতা!

আমার আদেশক্রমে অল্প সময়ের মধ্যে ভাত ও মসূর ডাল রান্না হইল এবং আমার আজ্ঞায় ঈশান সরকার আসনে বসিয়া সুস্থ মানুষের মতন নিজের হাতে তৃপ্তির সহিত আহার করিল। আমি যখন বলিতেছিলাম যে, খাদ্য খুব চমৎকার লাগিতেছে, ঈশান তখন মাথা নাড়িয়া আমার বাক্যের সত্যতার সাক্ষ্য দিতে দিতে গোগ্রাসে ডাল ভাত উদরস্থ করিতেছিল। সকলে দেখিয়া শুনিয়া অবাক্। এতক্ষণে

পাড়ার স্ত্রীলোক পুরুষ দলে দলে উপস্থিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিল যে, ইনি মানুষ না দেবতা? আমি কিন্তু দেখিতেছিলাম যে, এই সকল কার্য্যের উপর আমার কিছুই কর্ত্তৃত্ব নাই, অন্য কোন অজ্ঞাত-শক্তি আমার ভিতর দিয়া এই সকল কার্য্য করিতেছেন, আমি সাক্ষিগোপাল মাত্র।

পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিয়া ঈশান তক্তপোষে বসিল, আমি তাহাকে শুইতে অনুরোধ করিলাম, সে শয়ন করিলে তাহার মাথায় হাত দিয়া আমি বলিলাম, দুই মিনিটের মধ্যে তুমি ঘুমাইবে, তোমার গাঢ় নিদ্রা হইবে, আগামী কল্য সকাল ৭টার সময়ে তোমার ঘুম ভাঙ্গিবে। প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া বেলা ৮টার সময়ে তুমি নরোত্তমপুর রায় মহাশয়দিগের চারি বাড়ী বেড়াইয়া আসিবে। আমার কথা সমাপ্ত হইলে ঈশান গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল, তিন মাস পরে এই তাহার প্রথম নিদ্রা।

পরের দিন ৭টার পরে আমরা ঈশানের জন্য দিদিদের বাড়ী অপেক্ষা করিতেছি, ঠিক ৮টার কিছু পরে ঈশান আমাদের নিকট হাজির হইল, তাহার পশ্চাতে অনেক বালক যুবক ও বয়স্ক লোক। অল্পক্ষণ মধ্যে বহু স্ত্রীলোক পুরুষের সমাগম হইল, সকলের মুখে একই কথা, "কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!"

ঈশান আমাকে গোপনে বলিল যে তাহার অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয় সতেজ হইয়াছে, কিন্তু নাকে ঘ্রাণশক্তি নাই। আমি কয়েকটা লেবুপাতা আনাইয়া তাহার নাকের কাছে ধরিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম যে সে গন্ধ পাইতেছে কিনা? সে উত্তর করিল, গন্ধ পাইতেছে না। আমি তখন তাহার নাসিকা স্পর্শ করিয়া বলিলাম, এখন হইতে গন্ধ পাইবে, তৎক্ষণাৎ লেবুপাতা শুঁকিয়া সে সহাস্যে বলিল "হাঁ গন্ধ পাইতেছি।"

ঈশান সরকার সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া আজ কুড়ি বৎসরের অধিককাল বিষয়কার্য্য করিতেছে, এখন সে সুস্থ দেহে কোন এক জমিদারী কাছারিতে নেয়াবতী কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

ঈশান সরকারের আরোগ্য লাভের সংবাদ বিদ্যুৎ বেগে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং ইহাই আমাদের সত্বর নরোত্তমপুর ত্যাগের কারণ হইয়াছিল। নানা গ্রাম হইতে লোকেরা নৌকা করিয়া রোগী লইয়া আসিতে লাগিল, কেহ কেহ নাছোড়বান্দা হইয়া পড়িয়া রহিল, আমি জানি যে, শক্তি না আসিলে আমার দ্বারা কোনও কার্য্য হইবে না। একজন লোক অগত্যা একটা ঝিঙ্গা ফল আমাকে ছোঁয়াইয়া এক রোগীকে খাওয়াইবার জন্য লইয়া গেল। পরের দিনই আমরা নরোত্তমপুর পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা রওয়ানা হইলাম।

———

কলিকাতা

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ব্রাহ্মপল্লীতে প্রচারাশ্রমে দোতালার উপর দুইটী শয়নগৃহ ও নীচের তালায় একটী রান্নাঘর পাইলাম। আমাদিগকে এই বাড়ীর ভাড়া দিতে হয় নাই কেননা উহা প্রচারাশ্রম।

কলিকাতায় থাকা কালীন শ্রীমান্ রেবতীমোহন ও বেণীমাধব পুনরায় আমাদের পরিবারভুক্ত হইলেন। একটী কায়স্থের মেয়ে আমাদের পাচিকা ও পরিচারিকা ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই সে আমাদের আপনার জন হইয়া পড়িল। বাজার করা ও রান্না করা প্রভৃতি তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল, কিন্তু সেইটুকু মাত্র করিয়া সে আপনার কর্ত্তব্য সমাপ্ত করে নাই। সস্নেহে আমাদের সন্তানগণের লালন পালন করিয়াছে এবং যাহাতে কোন কাজের জন্য মনোরমাকে কিছুমাত্র ব্যস্ত হইতে না হয় তৎপ্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়াছে। লোকেরা যেভাবে গুরু-পরিবারের সেবা করে সেই কায়স্থকন্যা সেইভাবে আমাদের পরিচর্য্যা করিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, মনোরমার প্রতি ভক্তিবশতঃই তাহার এইরূপ প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। শুধু ধ্যানের অবস্থা দেখিয়া নহে, মনোরমার সদ্ব্যবহারও তাহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। এক মুঙ্গেরী ডালবিক্রেতা বলিত, "মাইজী যেন গঙ্গাজল।"

এখানে মনোরমা মাঝে মাঝে ধ্যানে বসিতেন। পাড়ার মেয়েরা অনেকে তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন কিন্তু দুই চারিজন ভিন্ন ব্রাহ্মগণের মধ্যে অনেকে মনোরমার এই গভীর ধ্যানের (সমাধির) উপর তেমন শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের উপর সকলেরই শ্রদ্ধা ছিল। এমন একটী অবস্থার প্রতি যে ব্রাহ্মগণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন তাহা মনে করিয়া আমার ক্লেশ হইত। যাঁহারা চেষ্টা করিয়া একদণ্ড ভগবানের নামে চিত্তনিবেশ করিতে পারেন না তাঁহারাই আবার গভীর ধ্যানকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। আমার মনে হয় ইহার প্রধান কারণ এই যে, চিত্ত নির্ম্মল না হইলে যে ধ্যান হয় না এবং ধ্যান ভিন্ন যে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না এরূপ বিশ্বাস অনেকের নাই, পড়াশুনা দ্বারা উচ্চজ্ঞান লাভ হয় ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস সুতরাং একজন অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের গভীর ধ্যানের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা জন্মিবে কেন ?

একদিন ব্রাহ্মসমাজের একজন ধর্ম্মপিপাসু বন্ধুকে আমি মনোরমার সমাধির অবস্থার কথা বলিলাম। তিনি এই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন কিন্তু একজন প্রবীণ ব্রাহ্ম বাধা দিলেন এবং এই ভাব প্রকাশ করিলেন যে এই সকল ব্যাপারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলে ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে, সমাজের মধ্যে ভাবুকতা আসিয়া পড়িতে পারে। কিন্তু সকল ব্রাহ্মই যে এইরূপ ভাবাপন্ন ছিলেন তাহা নহে। ব্রাহ্মসমাজের একজন দার্শনিক পণ্ডিত একদিন ধ্যানের অবস্থায় মনোরমাকে দেখিতে আসিলেন। কিছুক্ষণ নিকটে বসিয়া দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, তিনি মনোরমার কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া অনেকক্ষণ সেই অবস্থায়ই রহিলেন, পরে উঠিয়া আমাদিগকে বলিলেন যে, পুনর্জ্জন্ম আছে কিনা এই বিষয় লইয়া তাঁহার মনে অনেক দিন হইতে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, আজ তাঁহার সন্দেহ অনেকটা কমিয়া গেল, কেন না ইনি (মনোরমা) যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহার এক জন্মের

ফল নহে। সেই সময়ে এই দার্শনিক ব্রাহ্মের এইরূপ ভাব ও মত প্রকাশ করা খুব সরলতা, সত্যপরায়ণতা এবং সাহসিকতার কার্য্য হইয়াছিল।

এ স্থানে মাঝে মাঝে কোন কোন সাধু সন্ন্যাসী মনোরমাকে ধ্যানের সময়ে দেখিতে আসিতেন। তিনি যেদিন ধ্যানভঙ্গের পরে আমাদের কাছে শুনিতে পাইতেন যে তাঁহাকে লোকেরা দেখিতে আসিয়াছিলেন, তখন বড়ই সঙ্কোচ বোধ করিতেন এবং আমাকে বলিতেন, "তুমি বড় ঢাক ঢোল বাজাও।" আমি যে ঢাক ঢোল বাজাইতাম, তাহার প্রধান কারণ এই যে, যাহাতে ব্রাহ্মসমাজে গভীর ধ্যানের ভাব প্রকাশ করে তাহাই আমার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু আমার সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই। যদি মনোরমা আমার কেহ না হইতেন তবে আমি বিশেষ ভাবে তাঁহার ধ্যানের অবস্থা ব্রাহ্মসমাজে প্রচার করিতে পারিতাম এবং বোধ হয় অনেক ব্রাহ্মের চিত্তও আকৃষ্ট করিতে পারিতাম।

প্রাচীন ব্রাহ্ম টাকিনিবাসী ৺কেদারনাথ রায় মহাশয় মনোরমাকে বড়ই ভালবাসিয়া ফেলিলেন। তিনি জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধে আমার কাকা, এজন্য তিনি মনোরমাকে 'বউমা' বলিতেন। নিজের বাড়ীতে পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া কাপড়ে ঢাকিয়া নিজে হাতে করিয়া আনিয়া তিনি তাঁহার 'বউমা'কে খাওয়াইয়াছেন। এরূপ দু চারিজন ব্রাহ্ম ছিলেন। মেয়েদের মধ্যে শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী এবং আরও কয়েকটী মহিলাও শ্রীমতী সুশীলা মনোরমার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

বরিশালের ব্রাহ্মযুবক শ্রীমান্ মহেন্দ্রলাল সরকার এই সময়ে বিখ্যাত জমিদার ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিত, উক্ত ঠাকুর মহাশয় মহেন্দ্রকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। মহেন্দ্র আমাকে পিতার মতন ভক্তি করিত এবং মনোরমাকে 'মা' বলিয়া ডাকিত। সে মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিত। একদিন মহেন্দ্র

আমাকে জানাইল যে উক্ত ঠাকুর মহাশয় ধ্যানের অবস্থায় মনোরমাকে একবার দেখিতে চাহিয়াছেন। আমি মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি অস্বীকৃতা হইলেন। যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিতাম তবে ধ্যানের মধ্যে দেখিয়া গেলে তিনি টের পাইতেন না, কিন্তু তাঁহাকে জানিতে দেওয়ায় তাহা হইল না।

কিছুদিন পূর্ব্বে কোন বিখ্যাত ব্রাহ্মের স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে, মনোরমা একদিন তাঁহার সন্তানগণকে দেখিতে গেলেন, ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, "যদি শিশুসন্তান রাখিয়া আমার মৃত্যু হয় আর তাহাকে লইয়া যাইতে আমার অধিকার থাকে, তবে আমি আমার কাছে লইয়া যাইব।" তখন উক্ত ব্রাহ্ম মহাশয়ের কোন সহৃদয় বন্ধু যেরূপ যত্নের সহিত মাতৃহীন শিশুসন্তানগণের লালন পালন করিতেছিলেন, অনেক মা আপনার সন্তানগণকে সেরূপ যত্ন করিতে পারেন না, তবু কেন যে মনোরমা এরূপ কথা বলিলেন বুঝিতে পারি নাই। পাঠক দেখিতে পাইবেন দেহত্যাগের পরে মনোরমা সত্য সত্যই তাঁহার এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

একদিন মনোরমার সমাধির অবস্থায় তাঁহার কাছে বসিয়া শ্রীমান্ রেবতীমোহন সেন ও ব্রাহ্মসমাজের গায়ক শ্রীমান্ হরিমোহন ঘোষাল খোল করতাল সহযোগে কীর্ত্তন করিতেছিলেন। হঠাৎ সমাধি ভঙ্গ হইল। অসময়ে সমাধি ভঙ্গের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মনোরমা বললেন যে, নাম গানের ধ্বনি কাণে প্রবেশ করায় তাঁহার মন উপরে ভাসিয়া উঠিল। তাঁহার কথায় আমরা বুঝিলাম যে, যাহা অবলম্বন করিয়া আমরা ভিতরে ডুবিতে চাই, তাহা তাঁহার মনকে বাহিরে টানিয়া আনিল। তিনি ধ্যানসমুদ্রের অত্যন্ত গভীর স্তরে নিমগ্ন ছিলেন।

কলিকাতা হইতে ভাগলপুর যাত্রা

কলিকাতায় আর থাকা হইবে না, হাতে আর কিছুই নাই। কন্যাটীর হাতে দু'গাছা অল্পমূল্যের বালা ছিল, তাহা বিক্রয় করা হইল, তদ্দ্বারা পাচিকার বেতন প্রভৃতি দিয়া যাহা রহিল তাহাই পথের সম্বল হইল। ভাগলপুরে কখনও যাই নাই, সেখানে কাহাকেও চিনি না। অনেক চিন্তা করিয়া একটী পরিচিত লোকের কথা মনে পড়িল। তাঁহার নাম বাবু বামনদাস গঙ্গোপাধ্যায়। তখন তিনি কলিকাতার হরিদাস শ্রীমানীর চশমার এজেণ্ট ছিলেন, সংপ্রতি ভাগলপুর গিয়াছেন এবং কমিশনারের হেড ক্লার্ক শ্রীযুক্ত বামাচরণ ঘোষ মহাশয়ের বাসায় আছেন। বামাচরণবাবু সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার কে, ডি, ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর এবং স্বনাম-প্রসিদ্ধ অরবিন্দ ঘোষের কাকা। আমি বামাচরণ বাবুর ঠিকানায় বামনদাস বাবুকে একখানা পোষ্টকার্ড লিখিলাম, সংবাদ এই যে—"আমি আগামীকল্য সপরিবারে ভাগলপুর রওয়ানা হইব। সেখানে আমার পরিচিত কেহই নাই, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার জন্য একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিবেন, আমাকে যেন কাহারও বাড়ীতে উঠিতে না হয়।"

পরের দিন লুপ মেইলে ভাগলপুর রওয়ানা হইলাম। হাওড়া ষ্টেশনে পৌছাইয়া দেখিলাম, লগেজের ওজন বেশী হওয়ায় আমাদের টাকার অকুলান পড়িয়াছে। তখন আর কি করা যায়? স্থির হইল এই টাকায় যতদূর যাওয়া যায় ততদূরই যাইব, পরে যাহা হয় হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া আমি যখন টিকিট করিতে যাইতেছি, ঠিক সেই সময়ে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের প্রিয়পাত্র পূর্ব্বোক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার ছুটিয়া হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল যে "আপনাদের বাসায় গিয়া জানিলাম, আপনারা ভাগলপুর যাইতেছেন, তাই আমি ছুটিয়া ষ্টেশনে আসিয়াছি। আমি আপনাদিগকে কাপড় কিনিয়া দিব বলিয়া টাকা আনিয়াছি, এখন তো আর সময় নাই, তবে এই টাকা ষোলটী সঙ্গে নিন।" আমি তখন শ্রীমান্ মহেন্দ্রকে সেই

টাকার সাহায্যে সত্বর আমাদের টিকিট করিয়া দিতে বলিলাম, সে অবিলম্বে টিকিট করিয়া আনিল, আমরা ভাগলপুর রওয়ানা হইলাম। আমাদের হাতে ৬।৭টি টাকা সঞ্চিত রহিল।

কার্ত্তিক মাস, কিন্তু তখনও কলিকাতায় মোটেই শীত পড়ে নাই। ভাগলপুরে যে শীত পাইতে হইবে, সে কথা মনে আসে নাই। আমাদের যাহা কিছু যৎসামান্য শীতবস্ত্র ছিল, সে সমস্ত বিছানার সঙ্গে লগেজ করিয়াছি। রাত্রি প্রায় দুপ্রহরের সময়ে ভাগলপুর ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছাইল, তখন সেখানে বেশ শীত। রাস্তায়ও কিছু দূর হইতে শীত পাইয়াছি। রুগ্ণ সন্তানগুলি অনাবৃত, তাহাদের এমন কি আমাদেরও শীতে ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, ভাগলপুর ষ্টেশনে নামিলাম, ভরসা করিয়াছিলাম যে, বামনবাবু নিশ্চয়ই ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিবেন কিন্তু সে আশায় নিরাশ হইলাম। শুনিলাম ষ্টেশন হইতে বাঙ্গালীটোলা প্রায় দুই মাইল পথ, সেখানে যাইয়াই বা এত রাত্রে কোথায় উঠিব? ভাবিলাম হয় ত ষ্টেশনেই রাত্রি কাটাইতে হইবে। তখনও ষ্টেশনে লোকের খুব ভিড়, পূর্ব্ব পশ্চিম দুইদিকের গাড়ীই এক সময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হওয়ায় যাত্রীর খুব ভিড় হয়। লোকেরা ছুটাছুটি করিয়া নামিতেছে, উঠিতেছে, দৌড়াইতেছে, আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া ভিড়ের একপাশে দাঁড়াইয়া আছি। হঠাৎ একটি বাবু কিছুদূর হইতে ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া আমাদের নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমাকে আপনারা চিনিতে পারিতেছেন না, আমি কুলদার বড় ভাই সারদা।" কুলদা ব্রহ্মচারী, আমাদের গুরুভাই, সারদাবাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর, ইনিও গুরুভাই, ইঁহাকে আমি পূর্ব্বে একবার মাত্র দেখিয়াছি। কিন্তু ব্রহ্মচারী মহাশয় তখন আমাদের বেশী পরিচিত, এজন্যই তিনি ব্রহ্মচারীর নাম উল্লেখ করিয়া পরিচয় দিলেন। সারদাবাবু (সারদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) তখন জামালপুর স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইঁহাকে পাইয়া আমরা হাতে আকাশ পাইলাম। তাঁহাকে আমাদের সমস্ত অবস্থা

খুলিয়া বলিলে, তিনি বলিলেন, "ভাগলপুরের বামাচরণ বাবুর একটা দারোয়ান কলিকাতার কোন্ নূতন বাবুকে খুঁজিতেছে, আমি দেখিয়া আসি" এই বলিয়া তিনি গিয়া দারোয়ানকে আমাদের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না, কারণ সেই ট্রেণেই তাঁহাকে কলিকাতা যাইতে হইল। দারোয়ান আমার নাম মনে রাখিতে পারে নাই, সে যখন 'নিরঞ্জন', 'অকিঞ্চন', এমনি এক একটি নাম এক একবার বলিতে লাগিল, তখন আমি বুঝিলাম যে সে আমার জন্যই আসিয়াছে। দারোয়ানের সাহায্যে দুইখানা গাড়ী করিয়া সমস্ত জিনিসপত্র-সহ আমরা একটি বাড়ীতে পৌঁছিলাম। সে বাড়ীতে আর কেহই নাই। যে বামন বাবুকে আমি পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিলাম, তিনি ভাগলপুরে ছিলেন না, বামাচরণ বাবু পোষ্টকার্ডখানা পড়িয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের জন্য একটি বাড়ী বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

ভাগলপুর

ভাগলপুরে যে বাড়ীতে আমরা উঠিয়াছিলাম, সে বাড়ীটি কৃষ্ণধন বাবুর, ইনি বামাচরণবাবুর বিশেষ বন্ধু। বাড়ীটি খালি পড়িয়াছিল, বামাচরণবাবু উহা আমাদের জন্য চাহিয়া লইয়াছিলেন। এ বাড়ীতে থাকিতে ভাড়া লাগিবে না। পথের খরচ বাদে আমার হাতে বোধ হয় ৫।৭টি টাকা ছিল, উহাই বিদেশবাসের জন্য সর্ব্বস্ব ধন। একটা ঠিকা চাকরাণী রাখা হইল এবং মনোরমা রান্না প্রভৃতি গৃহকার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীরও তখন সুস্থ ছিল না। বিশেষতঃ ভাগলপুর আসিতে রাত্রে ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার বড়ই কাসি হইল। দুই তিন দিনের মধ্যে কাসি এত বাড়িয়া গেল যে তাঁহাকে অবিশ্রান্ত কাসিতে হইত। আমি মনোরমাকে ধ্যানে বসিতে বলিলাম। তিনি বসিলেন, আমি সে দিনের জন্য গৃহকার্য্যের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলাম। মনোরমা সকালবেলা ৮টার সময়ে বসিলেন, পরের দিন ভোরে তাঁহার

ধ্যানভঙ্গ হইল। প্রায় ছয় সাত ঘণ্টা কাসির বেগ খুবই চলিয়াছিল, কিন্তু শরীর শরীরের কার্য্য করিতেছিল, মানুষটি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। ছয় সাত ঘণ্টা পরে কাসিটা আপনি থামিয়া গেল। পরের দিন ধ্যানভঙ্গের পরে আর কাসির আবির্ভাব হইল না।

আমার ইচ্ছা ছিল না যে, ভাগলপুরে মনোরমার ধ্যান সমাধির কথা বাহিরের লোক জানিতে পায়। কিন্তু একথা গোপন রাখা অসাধ্য হইল, কারণ বাসার কাছে ভদ্রলোকের মহিলাগণ আমাদের বাসায় বেড়াইতে আসিয়া দেখিয়া গেলেন যে, তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় বসিয়া আছেন। যাহা হউক এ পাড়ায় আমরা বেশী দিন থাকিলাম না। একটি কারণে আমরা বাড়ী ছাড়িলাম এবং আর একটি কারণে পাড়া ছাড়িলাম। একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ীতে বিনা ভাড়ায় বেশীদিন থাকিতে মন সঙ্কুচিত হইল, ইহাই বাড়ী ছাড়ার কারণ। আমাদের টাকা পয়সা কিছুই নাই, শীঘ্রই হয়ত উপবাস করিতে হইবে, অতএব বাঙ্গালীদিগের হইতে দূরে বাস করাই কর্ত্তব্য, ইহাই পাড়া ছাড়িবার কারণ।

ভাগলপুরের পশ্চিম ভাগে নয়াবাজার নামক স্থানে ক্লিভল্যাণ্ড রোডের উপর ভুবন দেওয়ানের বাড়ী নামে একটি বাড়ী আছে, উহা তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজের ঠিক পশ্চিম দিকে। বাড়ীটি একটি উচ্চ স্থানের উপর প্রতিষ্ঠিত। রাস্তা হইতে প্রায় ২৮ ধাপ সিঁড়ী বাহিয়া বাড়ীতে উঠিতে হয়। সেই বাড়ীর একাংশ মাসিক ১৭৲ টাকায় আমি ভাড়া লইলাম। মনোরমা বলিতেন "ভাল বাড়ী এবং ভাল চাউল হইলে মাটিতে শোওয়া ও শুধু খাওয়াও ভাল।" আমাদের বাড়ীটি ভালই হইল। কিন্তু ভাড়ার টাকা আসে কোথা হ'তে?

আমার দিদি ভাগলপুরে আমাকে একশত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে কিছুদিন সংসার চলিল। একজন পরিচিত ব্রহ্মচারী একদিন আমাদিগকে একটি টাকা দিলেন। কেহ তাঁহাকে রেল-ভাড়া দিয়াছিলেন, তাহার একটি টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল,

ব্রহ্মচারীর পক্ষে সঞ্চয় নিষিদ্ধ। এইজন্য তিনি টাকাটি আমাদিগকে দান করিয়াছিলেন। একজন উকিল একদিন পাঁচটি টাকা দিয়াছিলেন। ইনি ব্রাহ্ম, ধর্ম্মপ্রচারককে সাহায্য করার অভিপ্রায়ে তিনি এই টাকা দিয়াছিলেন। আমরা কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করি নাই, কাহাকেও অভাব জানাই নাই; অথবা কেহ কিছু দিলে তাহা প্রত্যাখ্যান করি নাই। কারণ আমরা সকল দানই ভগবানের দান বলিয়া মনে করিতাম। সুতরাং অভিমানভরে ফিরাইয়া দিতে পারিতাম না। বিশেষতঃ ফিরাইয়া দিলে ব্রতভঙ্গ হইত।

নূতন বাড়ীতে আসিয়া সকলেরই শরীর একটু ভাল হইল, মনোরমার শরীর বিশেষ সুস্থ ও সবল হইল। 'সোমর' নামে একটি হিন্দুস্থানী চাকর ঠিকা কাজ করিয়া চলিয়া যাইত। মনোরমা রান্না, সন্তানপালন এবং অন্যান্য গৃহকার্য্য করিতেন, আমি হাট-বাজার করিতাম। ভাগলপুরের অল্প কয়েকটি ভদ্রলোকের সঙ্গেই আমার আলাপ হইয়াছিল।

একদিন কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে আমার রাত্রিতে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। আমি বেলা ৪টার পরে সহরে যাইতেছি, মনে করিলাম একেবারে রাত্রির আহারের পর বাড়ীতে ফিরিব। রাস্তায় একস্থানে ছয়টি নানকপন্থী সাধুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা একস্থানে বসিয়া ভজন করিতেছেন। আলাপ করিয়া জানিলাম যে, সমস্ত দিন তাঁহাদের আহার হয় নাই। আমার প্রাণে কেমন আঘাত লাগিল, নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতে ইচ্ছা হইল না। আমি বাসায় ফিরিয়া গেলাম এবং মনোরমাকে সাধুদিগের কথা বলিলাম। মনোরমা বাক্স খুলিয়া দেখিলেন আটটী মাত্র টাকা আছে। তিনি তাহা হইতে ছয়টি টাকা লইয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "ইহা সাধুদিগকে দিয়া তুমি নিমন্ত্রণ খাইতে যাও।" এখন মনে হয়, সেই বান্ধবহীন বিদেশে তখন আটটি টাকার কত মূল্য ছিল।

এখানে মনোরমা নিয়মিতরূপে প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা কাল ধ্যানে

বসিতে লাগিলেন। বেশীক্ষণ বসিবার অবসর ছিল না। চারি ঘণ্টা পরে আমি তাঁহার কাণে নাম বলিয়া তাঁহাকে জাগাইতাম। ভাগলপুরে তাঁহার কয়েকটি অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। এই সময়ে তিনি আপনাকে শরীর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছেন। একদিন সমাধির মধ্যে হাসিতে তাঁহার মুখ ফাটিয়া পড়িতেছিল। পরে জানিতে পারিলাম যে, সেদিন বিশেষ একটি বাণী শুনিয়াছিলেন, উহা আমি লিপিবদ্ধ করিব না।

একদিন রাত্রে ভাগলপুরে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তখন রাত্রি প্রায় ১টা হইবে। মনোরমা হঠাৎ আমাকে ঠেলিয়া জাগাইলেন। আমি উঠিয়া বসিলে তিনি বলিলেন, "দেখ, নিতু বোধ হয় বেঁচে নেই।" নিতু অর্থাৎ নিত্যরঞ্জন, আমাদের মধ্যমপুত্র, তখন তাহার বয়স ৯ বৎসর। আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, "কি সর্ব্বনাশের কথা বলিতেছ?" আমি দেখিলাম শ্রীমানের শরীর শক্ত, চক্ষু স্থির, হাতে নাড়ী নাই। আমাদের বড় ছেলে শ্রীমান্ সত্যরঞ্জন জাগিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অন্যান্য ছোট ছোট সন্তানগুলিও জাগিয়া উঠিয়া তাহারই অনুকরণ করিল। উঃ সে যে কি দারুণ রাত্রি, মনে করিলে এখনও শরীর শিহরিয়া উঠে! একান্ত বিদেশ, এক মাইলের মধ্যে বাঙালী নাই, পৌষ মাস, ভয়ানক শীতে ঘরের বাহির হওয়া দুষ্কর। আমাদের বাড়ীতে অন্য কোন পুরুষ নাই, চাকর নাই, ঝি নাই। একটী লোক ডাকিবার জন্য যে পাঠাইব এমন কেহ নাই। চারিদিকে বালকবালিকাগুলি কাঁদিতেছে, আমরা স্বামী-স্ত্রী, সেই নাড়ীহীন স্পন্দনহীন নয় বৎসরের পুত্রকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছি। তখন পলকের মধ্যে আমার অসংখ্য বন্ধুবান্ধবের কথা মনে পড়িল। মনোরমা বলিলেন, "কি করিতেছ, আমি মাথায় জল ঢালিতেছি, তুমি উহার দুই হাত ধরিয়া কৃত্রিম শ্বাস করাও।" আমার বুদ্ধি বিলুপ্ত এবং হস্তও প্রায় অবসন্ন। আমি যন্ত্রবৎ তাঁহার কথায় কার্য্য করিতে লাগিলাম। আমাদের বাড়ীর

পাশে একটী বেহারী ছাত্র বি, এল্ পড়িতেন। তাঁহার চাকরকে সঙ্গে লইয়া আমাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সত্যরঞ্জন (তখন ১২ বৎসরের) ডাক্তারের জন্য বাড়ীর বাহির হইল। সেই দিনই আমি তাহাকে নকুড়বাবু ডাক্তারের বাড়ী দেখাইয়াছিলাম। নকুড়বাবু আমাকে স্নেহ করিতেন। এদিকে নিতুর মাথায় জল ঢালিয়া ঢালিয়া ঘরের জল ফুরাইয়া গেল। কারণ শীতকালে রাত্রে ঘরে এক কলসীর অধিক জল প্রায়ই থাকিত না। জল বরফের মতন ঠাণ্ডা। ছেলেটি মে'ঝের উপর সেই জলে ভাসিতে লাগিল। অনেকক্ষণ কৃত্রিম শ্বাস করাইয়া ও জল ঢালিয়া আমরা নিরাশ হইতেছিলাম, এমন সময়ে হঠাৎ বালকের চক্ষুর পলক পড়িল, দেখিয়া আমরা তাহার পিঠের নীচে কম্বল দিয়া রাখিলাম। ভগবানের কৃপায় অল্পক্ষণ মধ্যেই ক্রমে ক্রমে বালকের চৈতন্য লাভ হইল। তখন তাহাকে ধরিয়া পুনরায় খাটে শোয়াইলাম। রাত্রি প্রায় ৩টার সময়ে নকুড়বাবু আসিলেন। ইহার পূর্ব্বেই বালক সম্পূর্ণ চৈতন্যলাভ করিয়াছে। নকুড়বাবু দোতালায় শুইয়াছিলেন, পৌষ মাসের গভীর রাত্রে দারওয়ানকে জাগাইয়া তাঁহাকে জাগাইতেই রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে। এরূপ রাত্রিকালে তিনি যে আসিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমরা চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। রোগী দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, হয়ত কৃমির জন্যই এইরূপ মূর্চ্ছা হইয়াছিল।

ভাগলপুরে নয়াবাজারে অনেক সময়ে সাধুসন্ন্যাসীদের সমাগম হইয়া থাকে। আমরা সেখানে থাকিতেও একবার অনেক সাধু আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মার্থীও অনেক ছিলেন। তাঁহারা শুনিতে পাইলেন যে এই বাড়ীতে একজন মাইজীর সমাধি হয়। আমার নিকট কয়েকজন আসিয়া তাঁহাকে দর্শনের অভিলাষ জানাইলে আমি সমাধির মধ্যে মনোরমাকে দেখাইলাম। তাঁহারা কিছুক্ষণ নিকটে বসিয়া থাকিয়া খুব গম্ভীরভাবে বলিলেন "ইয়া গুরুকী পূরা কৃপা হায়।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের বাড়ীটি খুব উচ্চ স্থানের উপরে প্রতিষ্ঠিত, উহার নীচে কয়েকটি অব্যবহার্য্য ঘর ছিল। ঘরগুলি ফ্লোরের মধ্যে। একদিন প্রভাতে দেখা গেল এক অনাথিনী উহার একটা ঘরের মধ্যে একটী পুত্র প্রসব করিয়াছে। বোধ হয় জগতে তাহার কেহই নাই। প্রভাতে এই সংবাদ পাইয়া মনোরমা নিজে তাহাদিগকে দেখিলেন। উহাদের যে যে জিনিসের প্রয়োজন, তাহার জন্য টাকা দিলেন। বালক ও তাহার জননীর শীত নিবারণের জন্য আমাদের যে যৎসামান্য বস্ত্র ও শীতারি ছিল, তাহা হইতে কিছু কিছু দিলেন। যতদিন আমরা ভাগলপুর ছিলাম, ততদিন মনোরমা উহাদিগকে কোন ক্লেশ পাইতে দেন নাই। স্বধু যে ভাত কাপড় দিয়াছেন তাহা নহে, মমতাপূর্ণ হৃদয়ে তাহাদের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন।

গয়া

পৌষ মাসে আমরা ভাগলপুর হইতে গয়া রওয়ানা হইলাম। ভাগলপুর হইতে গয়া যাইতে সে সময়ে মোকামা ও বাঁকিপুরে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইত। আমাদিগকে রাত্রে বাঁকিপুরে কিছু ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক আমরা পরদিবস প্রায় এগারটার সময়ে গয়ায় পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে পাণ্ডাদিগের হস্ত হইতে কোনরূপে অব্যাহতি লাভ করিয়া গাড়ী করিয়া আমরা ডাক্তার চন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের বাসার দিকে চলিলাম। চন্দ্রবাবু একজন ভক্ত-ব্রাহ্ম ও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। গয়ায় তিনি সম্মানিত ও পরিচিত ব্যক্তি। তাঁহার বাড়ীতে উঠিয়াই আমি বাসা অন্বেষণে বাহির হইলাম। গয়া আমার একান্ত অপরিচিত স্থান কিন্তু ভাড়ার বাড়ী খুঁজিতে আমার অভ্যাস থাকায় আমি সেই নূতন স্থানেও অল্প সময়ের মধ্যে সাহেব-গঞ্জে একটি বেশ বড় বাড়ী ভাড়া করিয়া ফেলিলাম এবং অপরাহ্নের পূর্ব্বেই নূতন বাড়ীতে যাইয়া আমরা নূতন সংসার পাতিলাম। পৌষ

মাসের শেষাশেষী পূর্ব্ব-বাঙ্গলা-ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয় টেলিগ্রাফিক মণিঅর্ডারে ৫০৲ টাকা পাঠাইয়া আমাকে একবার ঢাকা যাইতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। শ্রীগুরু-দেবকে একবার দেখিতে আমার বিশেষ ইচ্ছাও হইল, তখন পরিবার-বর্গকে আমার একজন বিশেষ বন্ধুর তত্ত্বাবধানে গয়ায় রাখিয়া আমি ঢাকায় গেলাম। বর্দ্ধমান ষ্টেশনে উৎসাহী ব্রাহ্ম-যুবক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে জানাইলেন যে আমার রচিত 'কবিতা-রঞ্জন' নামক একখানা স্কুলপাঠ্য পুস্তক বর্দ্ধমান ডিভিশনে উচ্চ প্রাইমারীর পাঠ্য হইয়াছে। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম কারণ আমি উক্ত পুস্তক পাঠ্য করিতে কিছুই চেষ্টা করি নাই। বিশেষতঃ বর্দ্ধমান ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে আমার পরিচিত লোক কেহই ছিলেন না। আমি ঢাকা হইতে গয়া ফিরিয়া যাইবার সময়ে কলিকাতায় আমার পুস্তকের প্রকাশক শ্রীযুক্ত জে, এন্, হালদারের নিকট হইতে অগ্রিম কিছু টাকা লইলাম এবং পরে তিনি আরও কিছু দিয়াছিলেন। তাহাতে দুই তিন মাসের খরচ চলিয়া গেল।

আমি ঢাকা হইতে গয়ায় ফিরিলে গয়ায় আমার জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে, সেই ঘটনাটি আমার সমস্ত জীবনকে আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছিল। আমাদের সমস্ত জীবনের সঙ্গে ঐ ঘটনার সম্বন্ধ আছে বলিয়া উহা একান্ত অন্তরে রক্ষণীয় ব্যাপার হইলেও সত্যের অনুরোধে বিবৃত করিলাম, না করিলে ঘটনাপরম্পরায় একটি শৃঙ্খলা থাকে না, এবং একটি বিশেষ সত্যকে গোপন করা হয়।

গয়ায় চৈতন্যোৎসব

গয়া, ভাগলপুর ও বাঁকিপুরের ব্রাহ্মসমাজের ভক্তদিগের উদ্যোগে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় গয়াধামে চৈতন্যোৎসব হইয়া থাকে। আমরা যে

বৎসর সেখানে ছিলাম, সে বৎসরের উৎসব বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতের পাদদেশে ব্রহ্মকুণ্ড নামক ক্ষুদ্র একটি কুণ্ড আছে। কুণ্ডের চারিধার শানবাঁধান এবং বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষে পরিবেষ্টিত। দক্ষিণ তীরে একটি ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, এই মনোহর স্থানই উৎসবের ক্ষেত্র। ইহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে অদূরে 'গোড়ধোয়া' অর্থাৎ বিষ্ণুপাদোদক তীর্থ। কথিত আছেঁ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে চরণ ধৌত করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই স্থানেই ভাবোন্মত্ত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি এই ব্রহ্মযোনির প্রাচীন নাম শীর্ষ-পর্ব্বত, ভগবান্ বুদ্ধদেব নাকি এই স্থানেই প্রথম তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই কশ্যপের সহস্র শিষ্যকে উপদেশ দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সৌন্দর্য্যে ও মাহাত্ম্যে এ স্থানটি অনুপম। রাত্রি প্রভাত হইলে বিভিন্ন স্থান হইতে নরনারী, বালক-বালিকাগণ গাড়ীতে, পাল্কীতে ও পদব্রজে এই পবিত্র উৎসবক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমিও সপরিবারে সেখানে পৌঁছাইলাম। প্রভাতে উপাসনা ও কীর্ত্তন হইল। ভাগলপুরের ব্রাহ্মভক্ত শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর বসু উপাসনা করিলেন। তাঁহার স্বভাব যেমন সুমিষ্ট ও পবিত্র, তাঁহার উপাসনাও সেইরূপ সরস ও অকৃত্রিম। উপাসনান্তে মহিলাগণ অন্নপূর্ণার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, বালকবালিকাগণ ছুটাছুটি করিতে ও পর্ব্বতে উঠিতে লাগিল। অন্যান্য সকলে স্নানার্থ অদূরে একটি বাগানবাড়ীতে চলিলেন। আমার শরীর খুব ভাল ছিল না এজন্য আমি স্নান করিতে গেলাম না। শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও গেলেন না। বেড়াইতে বেড়াইতে আমি একাকী 'গোড়ধোয়ার' নিকটে গেলাম। 'গোড়ধোয়া' হুগলী কি বর্দ্ধমান জেলার কোন পচা গ্রাম্য পুকুরের ন্যায় অতি অপরিষ্কার জল ও কর্দ্দমযুক্ত সামান্য একটি জলাশয়। আমি জানিতাম না যে উহার নাম 'গোড়ধোয়া'। একজন চাষা লোককে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, উহার নাম-'গোড়ধোয়া'। আমি পূর্ব্বেই 'গোড়-ধোয়া' নাম শুনিয়াছিলাম। কেমন অজ্ঞাতসারে কিছু চিন্তা বা

বিবেচনা করিয়াই আমি 'গোড়ধোয়া' হইতে কীটপূর্ণ কিঞ্চিৎ জল হাতে লইয়া আমার মাথায় দিলাম। ইহার পরে আমাকে কেমন একটু অন্যমনস্ক বোধ করিতে লাগিলাম। সেখান হইতে আসিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের শতাধিক হস্ত ব্যবধানে পূর্ব্বদিকে একটি আম্রবৃক্ষের নীচে আমি আমার তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা লইয়া বসিয়াছিলাম। ছেলেরা গাহিতেছিল, 'হরিবোল ব'লে কেন ভাস্‌লি না গৌরাঙ্গ-রসে।' আমিও তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছিলাম। শ্রীশবাবু অদূরে পাইচারি করিতেছিলেন। হঠাৎ এক বিষম কাণ্ড উপস্থিত হইল। আমি চাহিয়া দেখিলাম 'গোড়ধোয়া' হইতে ব্রহ্মযোনি পর্য্যন্ত এক উৎসব-স্রোত বহিয়া যাইতেছে। কত যে কীর্ত্তনের দল চলিয়াছে, কতলোক গাহিতেছে, নাচিতেছে, তাহার সংখ্যা হয় না। ধূলি উড়িয়া দৃশ্যটিকে কিছু অস্পষ্ট করিয়াছে কিন্তু তাহার মধ্যেও অসংখ্য নিশান উড়িতে দেখিলাম। হরিধ্বনি ও খোলের শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে এবং মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভু তাহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছেন। সে যে কি রোল, কি হরিবোল, এখনও মনে করিলে বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে। আমি দেখিয়া শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অভিভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলাম। আমার সমস্ত শরীর একেবারে বিকল হইয়া গেল, আপনাকে সম্বরণ করিতে কিছুমাত্র শক্তি রহিল না। আমাকে এই অবস্থাপন্ন দেখিয়া আমার ছেলেরা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শ্রীশবাবু আসিয়া আমাকে মাটি হইতে তুলিয়া ধরিলেন কিন্তু আমার শরীর ভাব-ধারণে অক্ষম হওয়ায় বক্র হইয়া যাইতে লাগিল। যতবার চক্ষু মেলিয়া চাহি, সেই ধূলি-পতাকা ও আবছায়া বৈরাগীদিগের মূর্ত্তি দেখিতে পাই এবং কাণে সেই মৃদঙ্গবোল ও হরিনামের রোল শুনিতে পাই। কিছুক্ষণ পরে আমার অবস্থা স্বাভাবিক হইল, আমি উঠিয়া বসিলাম, কিন্তু প্রাণ কেমন একটি অপূর্ব্ব ভাবে পরিপূর্ণ ও জীবন আনন্দময় বোধ হইতে লাগিল। ব্রহ্মকুণ্ডের তীর হইতে মনোরমা একদৃষ্টে আমার পানে চাহিয়া আছেন। আমি ভাবিলাম, এই স্থানেই

আজ বসিয়া থাকিব, উঠিব না। আমি কিছুকাল সেইখানেই বসিয়া রহিলাম। অন্যান্য সকলে স্নান করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া উপাসনায় বসিলেন। আমাকে উপাসনায় যোগ দিবার জন্য একজন ডাকিতে আসিলেন। প্রথম ভাবিলাম, যাইব না, পরে মনে হইল, না গেলে অভদ্রতা হইবে। সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া উঠামাত্র আমার হৃদয় একেবারে শুষ্ক হইয়া গেল, এমনই শুকাইয়া গেল যে পূর্ব্বের ভাবের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সম্পর্ক রহিল না। কিন্তু সেইদিন রাত্রিপ্রভাতে যখন শয্যা হইতে উঠিলাম, দেখিলাম, আমার হৃদয় আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এতকালের যত্নরক্ষিত, বিচার-প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্মমতগুলি সমস্তই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। যে বিচার ও বিবেচনা হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, হৃদয় পলকের মধ্যে সে সকলকে আপনার বক্ষঃ হইতে সরাইয়া দিল। 'যা ভজ্‌বো না মা তাই ভজালি' এই সঙ্গীতাংশ মনে হইতে লাগিল।

চৈতন্যোৎসবের সকালবেলাটা বড়ই সরস হইয়াছিল। শ্রীমান্ বেণীমাধবের 'অখিল ভুবন ভরি হরিরস-বাদর' গানটি সকলকেই গলাইয়া দিয়াছিল।

অদ্যকার দিনে এখানে আমাদের বন্ধুসমাগম হইয়াছিল। শ্রীমান্ রেবতীমোহন ও শ্রীমান্ জগদীশচন্দ্র রায় অদ্যকার ট্রেণে কলিকাতা হইতে গয়া আসিয়াছিলেন এবং আমাদের বাসায় যাইয়া আমাদিগকে না পাইয়া অনুসন্ধান করিয়া একেবারে উৎসব-স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে পাইয়া আমার হৃদয় পুনরায় একটু সরস হইল। শ্রীমান্ রেবতীমোহনের মধুর সঙ্গীতে শ্রোতৃগণ ভক্তিজলে শীতল হইলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা ব্রহ্মযোনি পরিত্যাগ করিলাম। সে উৎসব, সে আনন্দ, বন্ধুসমাগমের সেই বিমল সুখ, গার্হস্থ্য সুখের পরমানন্দ দরিদ্রতার মধ্যে সেই অপূর্ব্ব উল্লাস, একমাত্র মনোরমার অভাবে এখন সমস্তই স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে।

বাসা পরিবর্ত্তন

চৈতন্যোৎসবের পরে আমরা বাসা পরিবর্ত্তন করিলাম। নিজ গয়ায় আকাশ-গঙ্গা পাহাড়ের নিকট বলদেব অগ্নিওয়ার নামক গয়ালীর একটি বাগান-বাড়ী ছিল। বাড়ীটি অতি নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। আমি মাসিক ১০৲ টাকায় সে বাড়ীটি ভাড়া লইলাম। একটি ঠিকা চাকরাণী রাখা হইল, সে প্রয়োজনীয় কার্য্য করিয়া দিয়া চলিয়া যাইত। মনোরমা রান্নাদি কার্য্য ও সন্তানপালন করিতেন। এই বাড়ীতে আসিয়া মনোরমা প্রতি বুধবার ধ্যানে বসিতে লাগিলেন। বুধবারের প্রত্যুষে শ্রীশবাবুর মা আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। মনোরমা প্রাতে ৭।৮টার সময়ে ধ্যানে বসিতেন এবং তাহার পরের দিন ৭।৮টার সময়ে উঠিতেন। শ্রীশবাবুর মা এই ২৪।২৫ ঘণ্টার জন্য আমাদের গৃহের সমস্ত কার্য্যের ভার লইতেন। যেমন পুত্র, তাঁর তেমনি মাতা। তাঁহাকে সকলেরই বোধ হয় 'মা' ডাকিতে ইচ্ছা হইত। আমি মনে মনে তাঁহাকে 'মা' ডাকিলাম। যেমন দয়া, যেমন স্নেহ, তেমনি শ্রদ্ধা, তেমনি ভক্তি। সেই স্নেহময়ী মা, মনোরমার সাধন সহায়তা যেরূপ করিয়াছেন, তাহা আর ভুলিব না। সেই মায়ের কল্যাণময়ী মূর্ত্তি এখনও প্রাণে অঙ্কিত হইয়া আছে। প্রতি বুধবারের প্রত্যুষে আসিয়া তিনি সংসারের সমস্ত ভার নিজস্কন্ধে লইতেন। মনোরমা ধ্যানে বসিলে রান্না করা, সন্তানগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা, কোলের সন্তানটিকে মনোরমার স্তন্যপান করাইয়া আনা, তাহার পরে অবসর-সময়ে মনোরমার কাছে বসা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য মাতৃস্নেহের সহিত করিতেন। বৃহস্পতিবারে মনোরমার ধ্যানভঙ্গ হইলে তাঁহাকে আহার করাইয়া তবে মা নিজের বাড়ী যাইতেন। এইরূপে ক্রমান্বয় তিন মাসকাল তিনি মনোরমার সাধনে সাহায্য করিয়াছেন।

আকাশ-গঙ্গা

ভাগলপুর হইতে গয়ায় কেন আসিলাম, সে কথা বলা আবশ্যক। ভাগলপুরে সকলেরই শরীর বেশ ভাল হইতেছিল, বিশেষতঃ মনোরমার শরীর খুবই ভাল হইয়াছিল, তবে সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম কেন? গয়া যাইবার জন্য প্রাণে বড়ই টান হইল, এইরূপ হওয়ার কারণ ছিল। গয়াক্ষেত্রই শ্রীগুরুদেবের সাধনের স্থান, তাই গয়া দেখিবার জন্য প্রাণ চঞ্চল হইয়াছিল। ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতের উত্তরে কপিলধারা, তাহার উত্তরে আকাশ-গঙ্গা পাহাড়। পাহাড়ের উর্দ্ধ্ব হইতে একটি নির্ম্মল জলের উৎস ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহারই নাম আকাশ-গঙ্গা। সামান্য একটী কূপে পাহাড়ের উপরে কিছু জল সঞ্চিত থাকিত, পরে গয়ার উকিল বাবু বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (আমাদের গুরুভাই) মহাশয় উক্ত কুণ্ডটীকে বাঁধাইয়া দিয়াছেন। উক্ত কূপের উর্দ্ধ্বদেশে একটি মন্দির, সে মন্দিরে একজন বৈষ্ণব সাধু থাকিতেন। মন্দিরে দুইটি মাত্র ক্ষুদ্র কুঠরী ছিল। ইহার উত্তরে অতি নিকটে একটি গোফা, গোফাটির মুখ সঙ্কীর্ণ, খুব মোটা মানুষ তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে কষ্টে। উহার ভিতরে একজন লোকের সোজা হইয়া বসিবার বেশ স্থান আছে, এবং ধুনী করিবার জন্যও একটু বন্দোবস্ত আছে। অগ্রে পা প্রবেশ করাইয়া দিয়া গোফায় ঢুকিতে হয়। উহার মুখ বন্ধ করার জন্য একখানি পাথর আছে, ভিতরে ঢুকিয়া পাথরখানা টানিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিলে কেহ জানিতে বা বুঝিতে পারে না যে উহার মধ্যে কেহ আছে। অন্যদিক্ দিয়া বলের মত একটী গোলাকার ছিদ্র আছে, তাহার দ্বারা বায়ু ও যৎকিঞ্চিৎ আলো গোফায় প্রবেশ করিতে পারে। এই গোফাটি ঠাকুরের তপস্যার স্থান। মন্দিরের অধিকারী ৺রঘুবর দাস বাবাজী তপস্যার সময়ে তাঁহাকে আহার যোগাইয়াছেন। গভীর-ধ্যান-সমাধিতে কত দিন-যামিনী ঠাকুরের এই গোফায় কাটিয়া গিয়াছে। এই স্থানের আরও উত্তর অংশে যে উচ্চ পাহাড় আছে, তাহাতে আরোহণ করিলে একখানি পাথরের গায়ে 'ওঁ এই স্থানে মা' এই

কয়েকটি শব্দ বড় বড় অক্ষরে খোদিত দেখিতে পাওয়া যাইবে। সেই পাথরের পাদদেশে মানস সরোবরের পরমহংসজী শ্রীগুরুদেবকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। বাঁকিপুরের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় এই ঘটনার স্মৃতিরক্ষার জন্য একজন শিলাবট দ্বারা 'ওঁ এই স্থানে মানস সরোবরের পরমহংসজী' ইত্যাদি কথা লেখাইতেছিলেন কিন্তু 'ওঁ এই স্থানে মা' এই মাত্র খোদিত হইলে শিলাবটের অস্ত্র ভাঙ্গিয়া যায়; যে কারণেই হউক, আর অধিক লেখা হইল না, হঠাৎ কেহ বেড়াইতে বেড়াইতে ঐরূপ নির্জ্জন স্থানে 'ওঁ এই স্থানে মা' এই কথাগুলি শিলাপটে অঙ্কিত দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিতেন। বস্তুতঃ সে স্থানে মা আবির্ভূতা হইয়াছিলেন তাহা সেখানে বসিলেই অনুভূত হয়।* পাঠক বোধ হয় এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন গয়া যাওয়ার জন্য আমাদের প্রাণে কেন টান হইয়াছিল। আমি মনোরমাকে ও সন্তানগণকে লইয়া আকাশ-গঙ্গা দেখিলাম। এই সমস্ত স্থান দেখিয়া মনোরমার সমস্ত শরীরে যেন আনন্দ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাঁহার পাহাড়ে উঠা মোটেই অভ্যাস ছিল না কিন্তু উৎসাহে তাঁহার শরীরে যেন কতই বলের সঞ্চার হইল। এই সমস্ত স্থানগুলিকে আমাদের মহাতীর্থ মনে হইয়াছিল।

শ্রীমান্ রেবতীমোহনের সঙ্গে শ্রীমান্ জগদীশচন্দ্র রায় নামক একটী ব্রাহ্ম-যুবক গয়া গিয়াছিলেন। জগদীশ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার 'ব্রাহ্ম সাধনাশ্রমের' একজন উৎসাহী সভ্য হইয়াছিলেন। প্রচলিত ব্রাহ্ম-সাধন প্রণালীতে তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া জগদীশ মনোরমাকে দেখিবার জন্য এবং কিছুদিন তাঁহার নিকট থাকিবার ইচ্ছায় শ্রীমান্ রেবতীর সঙ্গে গয়া গিয়াছিলেম। রেবতী ও বেণীমাধব যখন গয়া হইতে কলিকাতায় রওয়ানা হইলেন তখন জগদীশকে কিছুদিন আমাদের নিকট রাখিবার

---

* এই গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্রে দেওয়ার পরে জানিলাম যে সে পাথরে কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি পরমহংসজীর দীক্ষা দানের কথা সম্পূর্ণ লেখাইয়াছেন।

জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম যে আমরা যেরূপ ব্রত গ্রহণ করিয়াছি তাহাতে অন্য লোকের আমাদিগের সঙ্গে থাকা সুবিধাজনক হইবে না, কেন না আমরা হয় ত কোন দিন উপবাসে কাটাইব, সে অবস্থায় যদি আমাদের অভাবের কথা বাহিরে কেহ প্রকাশ করে তবে আমাদের ব্রতভঙ্গ হইবে। জগদীশ বলিলেন যে তিনি আর কখনও গয়া আসেন নাই, সেখানে তাঁহার পরিচিত কেহই নাই, তিনি কাহারও সঙ্গে পরিচয় করিতে ইচ্ছাও রাখেন না সুতরাং কোন কথাই তাঁহার দ্বারা বাহিরে প্রকাশিত হওয়ার আশঙ্কা নাই, তিনি অল্প কিছু দিনমাত্র সেখানে থাকিবেন। তাঁহার কথা শুনিয়া আমরা কিছু দিনের জন্য তাঁহাকে আমাদের সঙ্গে রাখিতে স্বীকৃত হইলাম কিন্তু বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলাম যে আমাদের সাংসারিক অবস্থার কথা তিনি যেন কখনও কাহাকেও না বলেন।

একদিন আমাদের হাতে কিছুই ছিল না, কবিতা-রঞ্জনের হিসাবে প্রকাশকের নিকট হইতে যাহা কিছু পাইয়াছিলাম সমস্ত নিঃশেষ হইয়াছে। এক একখানা করিয়া থালা, বাটী বিক্রয় করিয়া কোন প্রকারে জীবনরক্ষা করা হইতেছিল। এমন দিন গিয়াছে যখন ছেলেপেলেগুলিকে আধপেটা খাওয়াইয়া মনোরমা ও আমি একখানা করিয়া আটার রুটী খাইয়া জলপান করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছি। কিন্তু দুধের বন্দোবস্ত ছিল, গোয়ালা বাকিতে দুধ যোগাইত, শিশু সন্তানগুলির উহাই প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। একদিন আমাদের বড় মেয়েটি ক্ষুধায় কাতর হইয়া পেট চাপিয়া ধরিয়া বলিল "বাবা, বড় পেট ব্যথা করে।" আমি বুঝিলাম বালিকা ক্ষুধায় কাতর হইয়াছে, অতর্কিতে আমার চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, মনোরমা আমার মুখের দিকে তাকাইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "কি করিতেছ? এরূপ হইলে আর নির্ভর হইল কৈ?" আমি তাহার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। স্নেহময়ী-জননী সন্তানকে ক্ষুধায় কাতর দেখিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইতেছেন না, গুরুবাক্যে সম্পূর্ণ নির্ভর

করিয়া ব্রত পালন করিতেছেন, আমি পিতা হইয়া সন্তানের দুঃখ সহ্য করিতে পারিতেছি না আর তিনি মাতা হইয়া অনায়াসে সমস্ত সহিয়া লইতেছেন। শ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন যে, আমার এখনও নির্ভরের অবস্থা হয় নাই, কিন্তু মনোরমার সম্পূর্ণ নির্ভরের অবস্থা, তাঁহার এই কথার অর্থ আজ ভাল করিয়া বুঝিলাম।

একদিন চারিটী পয়সা মাত্র হাতে আছে, মনোরমা সেই চারিটী পয়সা ঠিকা চাকরাণীর হাতে দিয়া বলিলেন, "ইহা লইয়া তুমি ঘরে যাও, আজ আমাদের এখানে কোন কাজের প্রয়োজন নাই।" চাকরাণীটি যদি সারাদিন থাকে তবে সে আমাদিগকে উপবাসী থাকিতে দেখিবে এবং সে কথা হয়ত সহরে প্রকাশ হইয়া পড়িবে, এই আশঙ্কায়ই তিনি বোধ হয় এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলেন। বলা বাহুল্য যে সেই চারিটী পয়সা চাকরাণীকে দিয়া আমরা সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হইলাম।

জগদীশ প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া পাহাড়ে যাইতেন এবং বেলা আটটা কি নয়টার সময়ে ঘরে ফিরিতেন। মনোরমার সমাধির অবস্থা দেখিয়া সেই অবস্থালাভের জন্য তিনি অত্যন্ত লালায়িত হইয়াছিলেন, তাই নির্জ্জনে বসিয়া ধ্যান করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। আমাদের সংসারের কোন অভাবের কথা তাঁহাকে বলা হইত না, তিনিও তখন একরূপ উদাসীর মতন ছিলেন, খাওয়া পরার দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, ধর্ম্মলাভের জন্য ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল।

চাকরাণীকে বিদায় করিয়া কোলের ছেলে দুটীকে দুধ খাওয়াইয়া আমরা দৈনিক পারিবারিক উপাসনায় বসিলাম। একটী সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলাম, প্রতিদিনই সেইটী গাহিয়া আমরা উপাসনা করিতাম।*

---

*গানটী এই—এই কর নাথ এই কর নাথ, প্রভাতে তোমারে করি প্রণিপাত
দিবসের কাযে, প্রহরীর সাজে, এ হৃদয়মাঝে থে'ক সাথ সাথ।
অশনে বসনে শয়নে স্বপনে, জ্ঞানে কি অজ্ঞানে নিদ্রা জাগরণে
গৃহপরিবারে; নিরখি তোমারে, কর কর এই শুভ আশীর্ব্বাদ।

আজ আমাদের দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যরঞ্জন বলিল "বাবা, আজ যখন আমাদের খাওয়ার কিছুই নাই তখন আজ সারাদিনই আমরা উপাসনা করিব।" বড় ছেলে ইহা জানিত যে, আমরা যে সাংসারিক ক্লেশ পাইতেছি ইহা ব্রতপালনের জন্য, সুতরাং ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই। একাদশীর উপবাস করিয়া কেহ যেমন আপনাকে দুঃখী মনে করেন না, সেইরূপ তাহারাও (যদিও শিশু) ব্রত পালনের জন্য উপবাস করিয়া আপনাদিগকে দুঃখী বলিয়া মনে করিত না। আমরা যেমন ভগবানের নাম করিতে বসিতাম তাহারাও চক্ষু বুজিয়া নাম করিত এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া স্থিরভাবে বসিয়া থাকিত। পাঁচ বৎসরের কন্যা প্রেমলতা এবং তিন বৎসরের চতুর্থ পুত্র যোগরঞ্জনও উপাসনাকালে কোন একটী কথা বলিয়া আমাদিগকে বিরক্ত করিত না।

আজ আমরা বেলা দশটা অবধি উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া উঠিলাম না, সত্যরঞ্জন যে বলিয়াছিল "আজ যখন খাওয়ার কিছুই নাই তখন সমস্ত দিনই আমরা উপাসনা করিব" সেই ভাবেই আমরা বসিয়াছিলাম। হঠাৎ কয়েকজন লোকের পদশব্দ শুনা গেল, আমি চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম শ্রীমান্ জগদীশ উপস্থিত, তাহার সঙ্গে পাঁচটী স্ত্রীলোক মু'টে, তাহাদের মাথায় বহুপ্রকারের দ্রব্য সামগ্রী। আমি ভাবিলাম, আমাদের অভাবের ও উপবাসের কথা জগদীশ হয়ত চন্দ্রবাবুকে কিম্বা শ্রীশবাবুকে বলিয়াছে এবং তাঁহারা কেহ দোকান হইতে এই সকল জিনিস পাঠাইয়া দিয়াছেন।

আমি একটু অসন্তুষ্ট হইয়া জগদীশকে বলিলাম যে, "আমি প্রথমেই আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তোমার দ্বারা আমাদের ব্রত ভঙ্গ হইবে, কার্য্যতঃ বোধ হয় তাহাই হইল।" জগদীশ বলিলেন যে, তাঁহার কিছুই অপরাধ নাই, সেদিন আমাদের সংসারের কি অবস্থা তাহাও তিনি জানিতেন না। এই সহরের কোন লোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপও হয় নাই সুতরাং তিনি কাহারও নিকট কিছু বলিবেন সে

সম্ভাবনাও ছিল না। জগদীশ আরও বলিলেন, "আমি পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলাম, বাজারের কাছে আসিলে একটী ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি এখানে কোথায় বাস করি? আমি আপনার নাম করিলাম, তিনি বলিলেন আমি তাঁহার বাসায় কিছু জিনিস পাঠাইব, আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া একটু বিলম্ব করেন তবে ভাল হয়। তিনি দোকান হইতে এই সকল জিনিসপত্র কিনিয়া মুটিয়াদিগের মজুরী আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "আপনি অগ্রসর হউন, আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।" কিছু দূরে আসিয়া আমি তাঁহার জন্য রাস্তায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম কিন্তু তিনি আসিলেন না, কাজেই আমি এ সকল জিনিস লইয়া বাসায় আসিয়াছি, আমার যদি কিছু অপরাধ হইয়া থাকে তাহা আমার জ্ঞানগত অপরাধ নহে।"

যেখান হইতেই যাহা কিছু আসুক সকলই ভগবানের দান বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতাম, এই আকস্মিক দানও আমরা তাঁহার দান বলিয়াই গ্রহণ করিলাম। এক মন চাউল এবং তদুপযোগী ডাল, আটা মসলা, চিনি, ঘি, তৈল, লবণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি আমাদের পরিবারের প্রায় ১৫ দিনের উপযুক্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুই তাহাতে ছিল। মনোরমা রান্না করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এই অবসরে আমি দ্রুতপদে চন্দ্রবাবু ও শ্রীশবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তাঁহাদের বাড়ী আমার বাসা হইতে এক মাইলের অধিক ব্যবধান। বৈশাখের প্রখর রৌদ্রে গয়া সহর তখন আগুন হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু আমার কিছুমাত্র শ্রম বোধ হইল না, আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, চন্দ্রবাবু কিম্বা শ্রীশবাবু যে কোনরূপে আমাদের অভাবের সংবাদ পাইয়া এই সকল জিনিস পাঠাইয়াছেন, গয়া সহরে এমন অন্য কেহ ছিল না, যে ব্যক্তি আমাদের সাহায্যের জন্য এতটা স্বার্থ ত্যাগ করিবে। সেখানে অন্য কাহারও সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল না। কিন্তু চন্দ্রবাবু ও শ্রীশবাবুর সহিত আলাপ করিয়া জানিলাম, তাঁহারা ইহার কিছুই জানেন না এবং এরূপ কার্য্য যে অন্য কেহ করিবে এমন লোকও

তাঁহারা ভাবিয়া পাইলেন না। জগদীশ নিজে সুদরিদ্র, শ্রীমান্ রেবতীমোহন ভাড়ার টাকা দিয়া তাঁহাকে গয়া লইয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি যে আত্মগোপন করিয়া নিজে এতটাকার জিনিস কিনিয়া আনিবেন তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ জগদীশ সত্যবাদী যুবক, তাঁহার পক্ষে এরূপ মিথ্যাচরণের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া আমি ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিলাম। কেমন একটী অপূর্ব্ব ভাবে আমার হৃদয় অভিভূত হইতেছিল। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

"অনন্যচিন্ত হইয়া যাহারা আমার উপাসনা করে, সেই সকল নিত্যাভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের 'আমি যোগক্ষম বহন করিয়া থাকি।" প্রয়োজনীয় বস্তুর সংগ্রহের নাম যোগ এবং তাহা সংরক্ষণের নাম ক্ষেম, ভগবান্ তাঁহার নিত্যযুক্ত ভক্তের দ্রব্য সংগ্রহকারী এবং ভাণ্ডারী হইয়া থাকেন।

আমার নিজের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম ভগবানের এই বিশেষ-কৃপা লাভের বিন্দুমাত্র অধিকার আমার নাই। মনোরমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম তিনি সম্পূর্ণই এই কৃপার অধিকারিণী, কেন না তিনি 'নিত্য-যুক্তা' হইয়া সকল অবস্থায়ই ভগবানের নামে নিমগ্না এবং সর্ব্বতোভাবেই তাঁহার প্রতি নির্ভরশীলা। কত বৎসর ধরিয়া কোনও অবস্থায়ই তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখি নাই, কোনও অবস্থায়ই তাঁহার মুখ মলিন দেখি নাই। আজ কত দিনের কত কথা মনে পড়িতে লাগিল। আর ভাবিতে লাগিলাম, জন্মান্তরে আমার এমন কি সুকৃতি ছিল যে আমি মনোরমাকে পত্নীরূপে লাভ করিলাম?

এই ঘটনার পরে আমরা কিছুদিন গয়ায় ছিলাম, যিনি আমাদিগকে এই সমস্ত জিনিসপত্র পাঠাইয়াছিলেন, বহু অনুসন্ধানেও তাঁহার খোঁজ পাইলাম না।

ইহার পরে অল্পদিনের মধ্যেই জগদীশ এখান হইতে চলিয়া গেলেন। ঠিক মনে হয় না যে, শ্রীমান্ রেবতীর নিকট হইতে কিম্বা অন্য কাহারও নিকট হইতে তিনি পত্র লিখিয়া তাঁহার কিছু পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি কাহারও সাহায্যে বিলাত গিয়াছিলেন, পরিণামে তিনি থিয়সফীকেল সোসাইটীতে প্রবেশ করেন। এখন ইহার নাম মিঃ জে, রায়, ইনি একজন বিশেষ শক্তিশালী যুবক।

সেদিনকার অজানিত ব্যক্তিদ্বারা সাহায্যপ্রাপ্তির পরে, আমার মনের অবস্থার একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিল। আমি ভাবিলাম, এই পরিজনবর্গকে যদি আমার প্রতিপাল্য বলিয়া মনে করি তবে আমাকে অনেক দুঃখ সহ্য করিতে হইবে এবং আমি গুরুদত্ত ব্রত পালন করিতে সক্ষম হইব না, কেননা আমার নির্ভরের অবস্থা নহে। এই সংসার মনোরমার সংসার, এই জ্ঞান রাখাই আমার কর্ত্তব্য, আমি তাঁহার সংসারের একজন সেবক মাত্র। এই বিশ্বাস স্থির থাকিলে আর কোথাও ক্লেশ পাইতে হইবে না, কেননা সেই নিত্যাভিযুক্তার সংসারের ভার ভগবান্ই গ্রহণ করিবেন। এই চিন্তা করিয়া বড়ই আরাম বোধ হইল। কিন্তু এ ভাব বেশী দিন টিকিল না।

অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী

গয়ার বলদেব অগ্নিওয়ারের যে বাঙ্গালা আমরা ভাড়া লইয়াছিলাম সে বাঙ্গালাটী একটি যাত্রি-নিবাসের মধ্যস্থলে অবস্থিত। উহার তিন দিকে দূরে দূরে অনেকগুলি খালি ঘর পড়িয়াছিল, পিতৃপক্ষে যাত্রিগণ আসিয়া তাহাতে বাস করিয়া থাকে। একটী ঘরে দিব্যকান্তি অজাতশ্মশ্রু একটী সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তাঁহার আকৃতিটী এমনই লাবণ্যময়ী যে মুখের দিকে চাহিলে সহজে চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। তাঁহার গতিবিধির মধ্যে একটু বিশেষত্ব ছিল। প্রায় দুই মাস একই

বাড়ীতে বাস করিয়া আমি তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে কখনও সুযোগ পাই নাই, অন্য কাহারও সঙ্গেও তাঁহাকে আলাপ করিতে দেখি নাই। তাঁহার কণ্ঠস্বরও কখন শুনি নাই। রাত্রি ভাল করিয়া প্রভাত না হইতে কূপ হইতে জল তুলিয়া তিনি স্নান করিতেন, তখন আমাদের বাড়ী হইতে তাঁহার আকৃতি স্পষ্ট দেখা যাইত না। তিনি স্নানান্তে ঘরে প্রবেশ করিতেন, বেলা ১০।১১টা পর্য্যন্ত তাঁহার ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ থাকিত। ইহার পরে জুতা ইজার ও জামা পরিয়া মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া ছাতা মাথায় দিয়া বাহির হইতেন। এক মিনিটের মধ্যে দরজায় তালা লাগাইয়া এত দ্রুত বাহির হইয়া যাইতেন যে, দরজায় দাঁড়াইয়া যে তাঁহার সঙ্গে কেহ একটী কথা বলিবে এতটা অবকাশ দিতেন না। আবার অপরাহ্নে ঘরে প্রবেশ করিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিতেন, সারা রাত্রিই দরজা বন্ধ থাকিত। অনেক দিন তাঁহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু তিনি আমাকে সে সুযোগ দেন নাই।

একদিন শেষ রাত্রিতে আকাশভরা জ্যোৎস্না, আমি একটু রাত্রি থাকিতে উঠিয়া হাটিতে হাটিতে ইন্দারার নিকটে গিয়াছি, তখন সন্ন্যাসী অসঙ্কোচে নিশ্চিন্তমনে স্নান করিতেছিলেন, আমি একেবারে সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া আপনাকে সামলাইতে চেষ্টা করিলেন, আমিও বিস্মিত ও লজ্জিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া ঘরে আসিলাম। স্পষ্টই দেখিলাম, এই নবীন-সন্ন্যাসী অপরূপ রূপ-লাবণ্যবতী এক নবীনা-যুবতী। আমি যে তাঁহার এই ছদ্মবেশ ধরিতে পারিয়াছি তিনি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারেন নাই, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া পুরুষের পোষাক পরিয়া যেই তিনি ভিজা কাপড়খানা মেলিয়া দেওয়ার জন্য ঘরের বাহির হইয়াছেন, আমি অগ্রসর হইয়া "মাইজী গোড় লাগী" বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। তিনি অপ্রস্তুত হইয়া ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া 'নারায়ণ' শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক আমার প্রণাম গ্রহণ করিলেন, তাঁহার

সুমধুর বামাকণ্ঠ আমার সর্ব্বসংশয় দূর করিল। আমি নিবেদন করিলাম, "এখানে আমার স্ত্রী আছেন, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার আমাদের গৃহ পবিত্র করিবেন"। তিনি মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন।

সেদিন বুধবার, মনোরমার ধ্যানে বসার দিন। সকাল ৭টার সময়ে তিনি ধ্যানে বসিয়াছেন, সন্ন্যাসিনী আপনার প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া প্রায় ৮টার সময়ে পুরুষ-বেশেই আমাদের গৃহে আসিলেন এবং মনোরমাকে ধ্যানস্থা দেখিয়া তাঁহার নিকটে একখানা আসনে উপবেশন পূর্ব্বক একদৃষ্টে তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিলেন। একটী কুলবধূ, প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় ধ্যান-মগ্না আছেন, তাঁহার কিছুমাত্র বাহ্যস্ফূর্ত্তি নাই, সন্ন্যাসিনীর নিকট ইহা অত্যন্ত প্রীতিকর ও বিস্ময়জনক বোধ হইয়াছিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া দেখিয়া তিনি বলিলেন যে, জন্মান্তরের কর্ম্মফল না থাকিলে এত সহজে এরূপ সমাধি লাভ করা যায় না। আমি বলিলাম সকলই গুরুর কৃপা, তিনি সে কথাও স্বীকার করিলেন। সন্ন্যাসিনীর কথাবার্ত্তা শুনিয়া ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, তিনি মনোরমার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্টা হইয়াছেন। তিনি অনেকক্ষণ তাঁহার নিকট বসিয়া রহিলেন। যে যাহা চায়, তাহা দেখিতে পাইলে কেনই বা তৎপ্রতি আকৃষ্ট না হইবে?

আমি সন্ন্যাসিনীকে তাঁহার নিবাস কোথায় জিজ্ঞাসা করিলাম, তদুত্তরে তিনি বলিলেন "এই শরীর কা জনম হুয়া চণ্ডী পাহাড়ীমে" অর্থাৎ চণ্ডী পাহাড়ে এই শরীরের জন্ম হইয়াছে। চণ্ডী পাহাড় হরিদ্বারের উত্তরে। সন্ন্যাসিনীর উত্তরটী শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। এই সামান্য কথাটীর মধ্যে কত নিগূঢ়-তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে! 'আমি' বস্তু যিনি, তিনি হইলেন আত্মা, আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই সুতরাং 'আমি' জন্মগ্রহণ করিয়াছি এরূপ কথা বলা সঙ্গত নহে, উহা সত্য কথা নহে। এই রক্ত-মাংসময় শরীরই জন্মগ্রহণ ও মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে সুতরাং চণ্ডী পাহাড়ে এই শরীর জন্মিয়াছে, আমি

জন্মগ্রহণ করি নাই। একটী সংক্ষিপ্ত কথা কত কথা মনে করিয়া দিতেছে, দেহাত্ম-বুদ্ধিকে কেমন সহজভাবে প্রতিহত করিতেছে, অনায়াসে কেমন আত্মজ্ঞান উৎপন্ন করিতেছে, ভাবিয়া আমি বিস্মিত হইলাম।

২৪ ঘণ্টা ধ্যানের পরে পরের দিন মনোরমার সমাধিভঙ্গ হইলে সন্ন্যাসিনী তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, উভয়ে কি কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন তাহা আমি জানি না। ছদ্মবেশী নবীন-সন্ন্যাসীটী যে পুরুষ নহেন, তাহা তাঁহার দ্বিতীয় দিনের আগমনের পূর্ব্বেই আমি মনোরমাকে বলিয়াছিলাম।

সন্ন্যাসিনী কেন এইরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিতেন, কেন কাহারও সহিত আলাপ করিতেন না, অনুসন্ধান করিয়া আমি সে সমস্ত অবগত হইলাম। তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসরের অধিক নহে, শরীরটী পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কুড়ি বৎসরের বাঙ্গালী মেয়েদের শরীর সচরাচর যেরূপ ঢিলা হইয়া যায় ইঁহার শরীর সেরূপ নহে, বেশ বাঁধা শরীর, মনে হয় যেন কোন প্রকারের ব্যায়াম তাঁহার অভ্যস্ত আছে। এইরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্য ও পূর্ণ-যৌবন লইয়া সকলের নিকট আত্মপ্রকাশ করা নিরাপদ্ নহে, এই জন্যই তিনি দিবসে ছদ্মবেশ ধারণ করেন। যে সকল গৃহস্থ-পরিবারে তিনি পরিচিতা তাঁহারা তাঁহার ছদ্মবেশের কথা জানেন। তিনিও পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক রাস্তা অতিক্রম করিয়া সেই সকল পরিচিত পরিবারে প্রবেশ করেন এবং মহিলাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ ও সাধন শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। যেমন রূপ, তেমনই গুণ, তেমনই চরিত্র, ইঁহার দ্বারা কত পরিবার নীতি-ধর্ম্মে সমুন্নত হইতেছে কে জানে? এই শ্রেণীর লোকের প্রচারকার্য্য কখনই সাধারণের মধ্যে প্রকাশিত হয় না।

গয়া পরিত্যাগ

বৈশাখ মাসের মধ্যভাগে গয়া সহর আগুন হইয়া উঠিল, আর তিষ্টন যায় না। বালুকাময় ফল্গুর প্রত্যেক বালুকাকণা আপনি উত্তপ্ত হইয়া সহরময় উত্তাপ ছড়াইয়া দিতেছে, সহর-সংলগ্ন পাহাড়গুলিও আপনি তাতিয়া সহরকে তাতাইয়া তুলিয়াছে, বায়ু যেন অগ্নির হলকা বহন করিতেছে। আমরা সকাল বেলায় ছাতে জল ঢালিয়া নরদামার মুখ বন্ধ করিয়া দিতাম কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল ফলিত না। টিনের ট্রাঙ্কের মধ্যে কাপড়গুলি পর্য্যন্ত গরম হইয়া থাকিত। এরূপ গরম স্থানে আমরা আর কখন বাস করি নাই। মনোরমা এই গরমে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেন কিন্তু যে দিন ধ্যানে বসিতেন সেদিন দিবা যামিনী এক ভাবেই কাটিয়া যাইত, বাহ্যিক উত্তাপ তাঁহাকে কিছুমাত্র তাপিত করিতে পারিত না।

এই সময়ে শ্রীগুরুদেব পশ্চিম হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন, মনোরমা তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার আগ্রহ আমাকেও চঞ্চল করিয়া তুলিল। আমি একদিন চন্দ্রবাবুকে আমাদের অভিপ্রায় জানাইলাম, তিনি জানিতেন যে, আমাদের হাতে টাকা নাই, তাই বলিলেন যে তাঁহার নিকট কোন তহবিলের একশত টাকা আছে, যদি এক মাসের মধ্যে আমি পরিশোধ করিতে পারি তবে সেই টাকা তিনি দিতে পারেন। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, এতদিন আমি যেভাবে চলিয়াছিলাম চন্দ্রবাবুর নিকট অভাবের কথা বলায় আমার সেভাব রক্ষিত হইল না, এমন কি আমি একরূপ ব্রত ভঙ্গ করিলাম ; এইরূপ দুর্ব্বলতা এই আমার প্রথম ঘটিল। আমি ইহার কোন কৈফিয়ৎ দিতে ইচ্ছা করি না, কেন না আমার কখনই পূর্ণ নির্ভরের ভাব ছিল না। গয়াতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার অনেকগুলি পরিত্যাগ করিয়া গেলাম। সেখানে যাঁহাদের সহিত বিশেষ আত্মীয়তা হইয়াছিল তন্মধ্যে চন্দ্রবাবু ও শ্রীশবাবু ভিন্ন শ্রীমতী কাদম্বিনী লাহিড়ী, বাবু ব্রজকুমার নেউগী ও সুরেন্দ্রনাথ

রায়ের নাম উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। কাদম্বিনী আমাদের স্নেহপাত্রী ছিলেন।

গয়া হইতে কলিকাতা

তখন গয়া হইতে কলিকাতা আসিতে হইলে বাঁকিপুর হইয়া আসিতে হইত। বাঁকিপুরে আমরা অবতরণ করিয়া ৺প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ীতে উঠিলাম। প্রকাশবাবু সেখানে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। তাঁহার সুখ্যাতি শ্বেতচন্দনের সুস্নিগ্ধ-গন্ধের ন্যায় বাঁকিপুর এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ৺অঘোরকামিনী পতির অনুরূপা পত্নী ছিলেন। এই ব্রাহ্ম দম্পতির ধর্ম্মানুরাগ, পরার্থপরতা, সদনুষ্ঠান ও কর্ম্মময়-জীবন স্থানীয় লোকের আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল। তাঁহারা কতকালের আত্মীয়ের মতন আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়া ছয়টি সন্তান লইয়া আমরা তাঁহাদের বাড়ীতে উঠিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিলাম না, এবং তাঁহাদের বাড়ী নিজের বাড়ী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যাঁহাদের হৃদয় প্রশস্ত, তাঁহাদের বাড়ীতে পা দিলেই সঙ্কোচ আপনি পলাইয়া যায়, ব্যবহারের অপেক্ষা রাখে না।

সেই দিনকার রাত্রের গাড়ীতেই আমরা কলিকাতা রওয়ানা হইলাম। কলিকাতায় 'দাসাশ্রমে' ইন্দুদাদার বাড়ীতে উঠিলাম, তখন কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে 'দাসাশ্রম' ছিল।

পরের দিন সকাল বেলায় মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র-নারায়ণ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীগুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আমরা কলিকাতায় আসিয়াছি শুনিয়া তিনি বলিলেন "বেশ হয়েছে।"

আমরা কোথায় থাকিব, কত টাকা ভাড়ার বাড়ী করিব ইত্যাদি কথা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ভবানীপুরের পদ্মপুকুর নিবাসী

সু-প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত উমাচরণ দাস মহাশয় এই সময়ে গুরুদেবের নিকটে বসিয়াছিলেন। তিনি অতি বিনীতভাবে আমাকে বলিলেন যে, তাঁহাদের একটি বাড়ী খালি আছে, আমরা যদি সেটি পছন্দ করি তবে তিনি সুখী হইবেন। আমি শ্রীগুরুদেবের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম, তিনি উমাচরণবাবুর প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। উমাচরণবাবু তখনই তাঁহার গাড়ীতে আমাকে লইয়া গিয়া বাড়ীটি দেখাইলেন।

উমাচরণবাবু তখন পোষ্টাফিসের ডিপুটী কণ্ট্রোলারের কার্য্য করেন, তাঁহার মাসিক বেতন প্রায় হাজার টাকা। পনর টাকা বেতনের সামান্য কার্য্য হইতে তিনি নিজের চেষ্টা ও যোগ্যতাগুণে এইরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ-যোগ ছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। পরিশেষে পরিণত বয়সে তিনি সস্ত্রীক শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

উমাচরণবাবু আমাকে যে বাড়ীটি দেখাইলেন উহা দেখিয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। দুই মহল একতালা বাড়ী, ঠিক যেন একটা আশ্রম। বাড়ীটি এমনই সাবধানতার সহিত প্রস্তুত করা হইয়াছে যে উহার কোথাও কিছুমাত্র খুঁত নাই। বাড়ীটি উমাচরণ বাবুর নিজের নহে, তাঁহার সহোদর ভগবতীচরণ দাস মহাশয় এই বাড়ীর মালিক। পূর্ব্বে শাস্ত্রী মহাশয় এই বাড়ীতে ছিলেন, তখন ভাড়া ছিল মাসিক পঁচিশ টাকা কিন্তু আমার জন্য উমাচরণবাবু সতের টাকা ভাড়া স্থির করিয়া দিলেন। আমাদিগকে কাছে রাখিবার ইচ্ছাবশতঃই যে তিনি এইরূপ স্বার্থত্যাগ করিলেন তাহার সন্দেহ নাই। সে বাড়ীটি যে দেখিত সেই বলিত "ঠিক যেন একটি আশ্রম।" বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া মনোরমা খুব সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিতেন, "বাড়ীটি যদি ভাল হয় তবে মাটিতে শোয়াও ভাল, আর চাউলগুলি যদি ভাল হয় তবে শুধু ভাত খাওয়াও ভাল।"

এই বাড়ীতে (৩৯নং পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর) আমরা প্রায় ছয়মাস বাস করিয়াছিলাম, এই সময়ের মধ্যে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে, পাঠক পাঠিকা ক্রমশঃ তাহা জানিতে পারিবেন। যদি অদৃষ্টে থাকে ও জীবনে কুলায় তবে দ্বিতীয় খণ্ডে সে সমস্ত বর্ণনা করিতে প্রবল ইচ্ছা রহিল। মনোরমার জীবন-চিত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্রগুলিই দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য রহিয়া গেল।

[প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]

মনোরমার জীবন-চিত্র

সুবিখ্যাত জননায়ক 'ভক্তিযোগ' প্রণেতা

স্বনামধন্য

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়

(১৯শে আশ্বিন, ১৩২১, নাসিক হইতে) লিখিয়াছেন—

তোমার পুস্তকখানি একটি অমৃতভাণ্ড। বড়ই আনন্দিত হইয়াছি, তোমার নিজের কথা যাহা লিখিয়াছ, তাহাতেও বড় সুখ পাইয়াছি। আমারও তোমাকে তোমার বিশিষ্ট বৈষ্ণবের কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। আমার মতো যাঁহারা তোমার আত্মীয় তাঁহারা উহাতে আনন্দ পাইবেন, তবে বাহিরের লোকের কথা কি হইবে বলিতে পারি না, কিন্তু অত হিসাব ভাল কি? তুমি বরিশালের একখানি অপূর্ব্ব ছবি আঁকিয়াছ, বড় জবর লেখনেওয়ালা। যাহা লিখিয়াছ তাহা যেন প্রাণের মধ্যে ঝকমক্ করিতেছে। 'দেবী' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ তাহার ত কথাই নাই, আর দাঃ কালীকুমারের কন্যা অমন হইবেনই না বা কেন? মজুমদার পরিবারের কি চমৎকার বিবরণই দিয়াছ। একেবারে নিখুঁত, ঠিক যেমনটি তেমন। বাহবা চিত্রকর! আর সেই 'সদানন্দ ঢোল', সেই আমাদের কালীচরণ, ইহাদের ফোটোই বা কি সুন্দর উঠিয়াছে, একেবারে হুবহু। এদিকে তোমাদের জীবনের ঘটনার বৈচিত্র্য ত বইখানিকে একখানি মনোরঞ্জন উপন্যাস করিয়া রাখিয়াছে, সর্ব্বোপরি ঠাকুরের দিব্যজ্যোতিঃ ইহাকে কিরূপ ভাস্বর করিয়াছে। কি আর লিখিব, নিকটে পাইলে একটা নিবিড় আলিঙ্গনে কিঞ্চিৎ মনের ইচ্ছা পূরাইতাম। দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য উদ্গ্রীব রহিলাম।

ভূতপূর্ব স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টর ও কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ

পণ্ডিতাগ্রগণ্য

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত মহাশয়

কলিকাতা, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে ইং ১৪।১০।১৪ তারিখে লিখিয়াছেন—

আমার বলিবার আবশ্যক নাই যে পুস্তকে মধুময় কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের নিমিত্ত সকল পাঠকই অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করিয়া আছেন, আমিও থাকিলাম।

৺ কাশীধামের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হইতে ইং ১।২।১৫ তারিখে পণ্ডিতবর

স্বামী তুরীয়ানন্দ

লিখিয়াছেন—

'মনোরমার জীবন-চিত্র' পাঠ করিয়া আমি যে কি আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম তাহা আর লিখিয়া কি জানাইব? এতাদৃশী জীবনকাহিনী লিখিয়া সঙ্কুচিত হইবার কিছুই নাই। বরং আমার মনে হয় যত্মপি (যদি) আপনি ইহা না লিখিতেন তাহা হইলে সাধারণের উপর আপনার অত্যাচার করা হইত, কারণ লোকতঃ তিনি আপনার সহধর্ম্মিণী হইলেও ধর্ম্মতঃ আমাদের সকলেরই মহাহিতসাধিনী ও মনোরঞ্জনকারিণী। তাঁহার পূত চরিত্র লিখিতে যাইয়া আপনি আরও কতগুলি আদর্শ চরিত্রের বর্ণনা করিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন। কতদিনে আপনার প্রতিশ্রুত ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের দর্শন পাইব, সেই আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। অচিরে আমাদের সেই আশা পূর্ণ করেন, আমার ইহাই আপনার নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। প্রভু আপনার শরীর স্বচ্ছন্দ রাখুন ও এই মহতী চেষ্টার প্রেরণা ও শক্তি আপনাকে দান করিয়া, অভিলষিত ব্রত সম্পাদনে সক্ষম করুন, সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি।

বিখ্যাত জমিদার কবি

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী

বরিশাল হইতে ১৩২১।২৬ শ্রাবণ তারিখে লিখিয়াছেন—

আদ্যন্ত একেবারেই পড়িয়া ফেলিয়াছি, পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না, লেখার এমনই একটি মোহন আকর্ষণ। দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় কতদিন আশান্বিত হইয়া থাকিতে হইবে জানাইবেন। এই বই প্রতি ঘরে একখানি করিয়া থাকা দরকার। অনেক স্থলে চোখের জলে অক্ষর দেখিতে পাই নাই, এতই আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

লিখিয়াছেন—

"তথাপি এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমি উপকার ও শান্তিলাভ করিয়াছি।"

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয় লিখিয়াছেন—

'মনোরমার জীবন-চিত্র' সেই রমণীরত্নের নিজের গুণে এবং চিত্রকরের চিত্রাঙ্কনের গুণে এতই সদ্‌গুণপূর্ণ যে, তাহাতে দোষ থাকিলেও

এক দোষ গুণরাশি মাঝে ডুবে যায়,
শশাঙ্কে কলঙ্ক যথা কৌমুদীমাঝারে। ইত্যাদি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বেদান্তরত্ন
মহাশয় লিখিয়াছেন—

এই গ্রন্থ পাঠে পাঠকের যথেষ্ট উপকার হইবে, অতএব ইহার প্রকাশ করিতে আপনার সঙ্কোচ বোধ হওয়ার কোন কারণ ছিল না। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ হওয়া উচিত।